কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে হজ্জ ও ওমরাহ'র ফাজায়েল, মাসায়েল
ও অপরিহার্য বিষয়াবলীর উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব

প্রশ্নোত্তরে

কিতাবুল হজ্জ

শায়খুল হাদীস মুফতী মুহাম্মদ জসীমুদ্দীন রাহমানী

পরিচালক : মারকাজুল উলূম আল ইসলামিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ।
খতীব : হাতেমবাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি, ঢাকা।
সাবেক মুহাদ্দিস : জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, সাত মসজিদ মাদ্রাসা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।
সাবেক শাইখুল হাদীস : জামিয়া ইসলামিয়া মাহমুদিয়া, বরিশাল।
মোবাইলঃ ০১৭১২১৪২৮৪৩

মারকাজুল উলূম প্রকাশনা বিভাগ

মেট্রো হাউজিং, বছিলা রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।
মোবাইলঃ ০১৭১২১৪২৮৪৩
www.markajululom.com
http://jumuarkhutba.wordpress.com

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে হজ্জ ও ওমরাহ'র ফাজায়েল, মাসায়েল
ও অপরিহার্য বিষয়াবলীর উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব

প্রশ্নোত্তরে

কিতাবুল হজ্জ

শায়খুল হাদীস মুফতী মুহাম্মদ জসীমুদ্দীন রাহমানী

সহযোগিতায়ঃ
মুফতী মুহাঃ রহমতুল্লাহ
শিক্ষকঃ মারকাজুল উলূম আল ইসলামিয়া, ঢাকা

প্রকাশনায়ঃ
মারকাজুল উলূম প্রকাশনা বিভাগ
মোবাইলঃ ০১৭১২১৪২৮৪৩, ০১৯২৫৯৩২৫৬৫
www.markajululom.com
http://jumuarkhutba.wordpress.com

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১১ ইং

মূল্য ঃ ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

Kitabul hajj
Shaikh Mufti Jashimuddin Rahmani
Markajul Ulom Al-Islamia, Dhaka
Price : 150.00 Tk. US.$ 6.00

প্রথম অধ্যায়: ওমরাহ

দ্বিতীয় অধ্যায়: হজ্জ

হজ্জের ফজিলত

মহিলাদের হজ্জ

বদলি হজ্জ

হজ্জের প্রকারভেদ

মীকাত

হজ্জের কাজসমূহ

ইহরাম

ষষ্ঠ অধ্যায়: যিয়ারতে মদীনা

হজ্জের সফরে আচরণ বিধি

হজ্জ যাত্রীগণ আল-াহর মেহমান। সকলেরই গন্তব্য বায়তুল-াহ শরীফ। উদ্দেশ্য আল-াহর আহ্বানে সাড়া দেওয়া। কিন্তু হজ্জের সফর একটি কষ্টের সফর। একদিকে অর্থ ব্যয় হয়, অপর দিকে শ্রম। আবার প্রত্যেক হাজী সাহেব নিজ নিজ অবস্থানে গুর ত্বপূর্ণ ব্যক্তি। স্বচ্ছল, ধনী। কেননা গরীবের উপর হজ্জ ফরজ নয়। বেশীর ভাগ হাজী নিজে কোন ভারী কাজ-কর্ম করায় অভ্যস্ত নন। অথচ এখানে নিজেকেই সবকিছু করতে হবে। তারপর সফরের কষ্ট তো আছেই। মেজাজ থাকে গরম। সাথী-সঙ্গীদের সাথে বাগ-বিত া ও ঝগড়া-ফাসাদ হওয়ার ব কারণ সামনে এসে যায়। সে কারণে আল-াহ (সুবঃ) অন্য কোন ইবাদতের ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে কুরআনের আয়াত দ্বারা ঝগড়া-ফাসাদ করতে নিষেধ করেন নাই। কিন্তু হজ্জের বেলায় আল-াহ (সুবঃ) সরাসরি ঝগড়া করতে নিষেধ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছেঃ

{فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة : ১৯৭]

অর্থ:- “অতএব এই মাসসমূহে যে নিজের উপর হজ আরোপ করে নিল, তার জন্য হজে অশ-ীল ও পাপ কাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয়।” (সুরা বাক্বারাঃ ১৯৭)

এ আয়াতে ঝগড়া না করার কথা বিশেষ ভাবে উলে-খ করা হয়েছে। কেননা হজ্জের সফরে বিভিন্ন চরিত্রের, বিভিন্ন মেজাজের, বিভিন্ন অভ্যাসের মানুষের সাথে একত্রে চলতে গিয়ে ঝগড়া-ফাসাদের ব কারণ সামনে এসে যায়। সে কারণেই এভাবে নিষেধ করা হয়েছে। তাই হজ্জের সফরে সকল হাজী সাহেবদের নিম্নে বর্ণিত নিয়মগুলো মেনে চলা উচিৎ ঃ

১. ঘর থেকে বের হওয়ার সময় আল-াহর মেহমান হিসেবে যাচ্ছেন সেই আনন্দে শান্ত মেজাজে বের হউন।

২. প্রয়োজনীয় টাকা-পয়সা সঙ্গে নিন। যেন নিজের প্রয়োজন মত ব্যয় করে অন্যদেরকেও কিছু সাহায্য করতে পারেন। চা-নাস্তা খাওয়াতে পারেন। গরীব-দুঃখী, অসহায়কে সাহায্য করতে পারেন।

৩. হজ্জ শ্রম সাধ্য আমল। যতদুর সম্ভব নিজেকে তৈরী রাখুন। আপনি আল-াহর মেহমান। দুনিয়ার কোন মেজবান তার মেহমানকে কষ্ট দেয় না। আপনিও যদি সত্যিকার অর্থে আল-াহর মেহমান হতে পারেন তাহলে আপনার কোন কষ্ট হবে না। সৎ সাহস রাখুন। আল-াহর উপর ভরসা রাখুন। কোন মানুষের উপর নির্ভরশীল হবেন না।

৪. মাল-সামান হাল্কা রাখুন। মনে রাখবেন আপনার মাল-পত্র আপনাকেই বহন করতে হবে। আপনার সাথী-সঙ্গী প্রত্যেকের'ই নিজ নিজ সামান রয়েছে। কেউ আপনাকে সহযোগিতা করতে পারবে না। আমাদের অভিজ্ঞতা হলো "যে যত দুর্বল, তার মাল-সামান তত বেশী।"

৫. সাথী-সঙ্গীদেরকে সম্মানের চোখে দেখুন। তাদের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভূল-ত্রুটিগুলো গুলো সুন্দর দৃষ্টিতে দেখুন। তাদের সঙ্গে রাগান্বিত ও আক্রমনাত্মক কথাবার্তা বলা থেকে বিরত থাকুন। অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা, গল্প-গুজব, নিজ জীবনের কিচ্ছা-কাহিনী বলা থেকে বিরত থাকুন।

৬. কারো নিন্দা করা, পিছনে দোষ চর্চা করা, হিংসা করা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, কারো দোষ খুজে বের করা, সমালোচনা করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকুন। কারণ এতে আপনার আমল নষ্ট হয়ে যাবে।

৭. কোন বদ অভ্যাস থাকলে বর্জন করুন। যেমনঃ ধুমপান করা, সাথী-সঙ্গীদের সামনে বসে দাঁত খিলাল করা, নাক পরিস্কার করা, যেখানে সেখানে থুথু নিক্ষেপ করা, থাকার জায়গা অপরিস্কার রাখা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকুন।

৮. টাকা-পয়সা, মূল্যবান মাল-সামান সাবধানে রাখুন। মনে রাখবেন! মক্কাতেও চোর, পকেটমার ও প্রতারক থাকে।

৯. হজ্জের পূর্বে বেশী কেনা-কাটা, বারবার ওমরাহ করা থেকে বিরত থাকুন। অবশ্য হজ্জের পরে প্রয়োজনীয় কেনা-কাটা করতে পারেন।

১০. সাথী-সঙ্গীদের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে সেবা করার মানসিকতা প্রস্তুত রাখুন। জেনে রাখবেন! আল্লাহর মেহমানদের সেবা করলে আল্লাহর সেবা করা হয়।

১১. ফল-ফলাদী বেশী খান। তবে আঙ্গুর ফল এবং জুস পান করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করুন। বেশী জুস খেলে পেট লুজ হতে পারে।

১২. জরুরী ঔষধ-পত্র সঙ্গে রাখুন। কঠিন কোন রোগ থাকলে দু'একজন সাথী-সঙ্গীকে বলে রাখুন।

১৩. আপনার পরিচিত আত্মীয়-স্বজন যারা সৌদি আরবে চাকুরী করে তাদের দেয়া হাদিয়া-তোহফা, ফল-মুল বেশী খাবেন না। তাহলে কিন্তু হাত ব্যথা হয়ে যাবে। ব্যাপারটা বুঝতে পারেন নাই? ওরা আপনাকে আসার সময় বিভিন্ন মাল-সামানা দিয়ে দিবে, তাদের বাড়ি পৌছানোর জন্য। যা আপনার জন্য কষ্টের কারণ হবে।

প্রথম অধ্যায়ঃ ওমরাহ্

প্রশ্নঃ 'ওমরাহ্' শব্দের শাব্দিক এবং পারিভাষিক অর্থ কি?

উত্তরঃ 'ওমরাহ্' আরবী শব্দ যার অর্থঃ 'যিয়ারত করা, ভ্রমণ করা'। ইসলামের পরিভাষায় ওমরাহ্ বলা হয় 'কাবা যিয়ারত করা ও তার চতুর্পার্শ্বে তাওয়াফ করা, সাফা-মারওয়া সায়ী করা, মাথা মুন্ডানো বা চুল ছাঁটা।

প্রশ্নঃ ইসলামী শরিয়তে ওমরাহ্ করার বিধান কি?

উত্তরঃ এ ব্যাপারে ওলামাদেও মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, যাদের উপরে হজ্জ ফরজ তাদের উপরে জীবনে একবার ওমরাহ্ করাও ফরজ। আবার কেউ বলেছেন, ওমরাহ্ করা মুস্তাহাব অথবা সুন্নত। ফরজ বা ওয়াজিব নয়। ইমাম আবূ হানিফা (রঃ) ও ইমাম মালেক (রঃ) এর মত এটাই।

প্রশ্নঃ ওমরাহ করার ফজিলত কি?

উত্তরঃ ওমরাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এর মাধ্যমে মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, গুনাহ মাফ হয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ....وَالْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا

অর্থঃ "আবূ হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আল্লাহর রাসূল সাঃ বলেছেন, ... এক ওমরাহ থেকে আরেক ওমরাহ মধ্যবর্তী গুনাহ সমূহের কাফফারা।[১]

অপর হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে:

عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ

অর্থঃ "ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমরা হজ্জ এবং ওমরাহ পালন কর। কেননা উহা দারিদ্রতা এবং গুনাহ সমূহকে এমনভাবে দূর করে দেয় যেমনভাবে হাপড় লোহার জং দুর করে দেয়।"[২]

---

[১] নাসায়ী শরীফ ২৬২১।

[২] সুনানে নাসায়ী ২৬২৯।

এছাড়াও রাসূলুল-াহ (সা:) নিজেও ওমরাহ করেছেন। সাহাবা কেরামগণও ওমরাহ করেছেন।

প্রশ্ন: ওমরাহ করার সময় কখন?

উত্তর: অধিকাংশ আলেমদের মতে বছরের যে কোন সময় ওমরাহ করা জায়েজ। কিন্তু হানাফী আলেমদের মতে ৮ই জিলহজ্জ থেকে **১৩**ই জিলহজ্জ ব্যতীত। তবে রমজানে ওমরাহ করার ফজিলত আনেক বেশি। কেননা রাসূল (সা:) বলেছেন:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي ॥

অর্থ: "ইবনে আব্বাস রা: থেকে বর্ণিত, রাসূলুল-াহ (সা:) বলেছেন, রমজান মাসে একটি ওমরাহ করা আমার সঙ্গে হজ্জ করার সমান।"[৩]

প্রশ্ন: এক সফরে বারবার ওমরাহ করার বিধান কি?

উত্তর: অনেকে এক সফরে বারবার ওমরাহ করে থাকে। সকালে একটা, বিকালে একটা, কেউ চলি-শটা, কেউ পঞ্চাশটা আবার কেউ ওমরাহ করার সেঞ্চুরী করে থাকে। এতে যাদের জরুরী তাওয়াফ রয়ে গেছে তাদের যেমন কষ্টের কারণ হয় তেমনিভাবে এটি রাসূল (সা:) এর সুন্নাহর পরিপন্থীও বটে। কেননা রাসূলুল-াহ (সা:) এক সফরে একাধিক ওমরাহ করেছেন বলে কোন প্রমাণ নেই বরং তিনি যখন বাহিরের থেকে মক্কায় প্রবেশ করতেন তখনই কেবল ওমরাহ্ করতেন। মক্কায় থাকা অবস্থায় হারামের বাইরে গিয়ে আবার ইহরাম বেঁধে এসে ওমরাহ করেছেন এর কোন প্রমাণ নেই। রাসূলুল-াহ (সা:) এর যুগে কোন সাহাবী এমন আমল করেছেন তারও কোন প্রমান নেই। শুধু মাত্র আয়েশা (রা:) রাসূলুল-াহ (সা:) এর সাথে বিদায় হজ্জের সময় ওমরাহ'র উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধেছিলেন কিন্তু হায়েজ এসে যাওয়ার কারণে তিনি ওমরাহ করতে পারেন নাই। বরং তাকে ঐ একই ইহরামে 'হজ্জে কিরান' করার জন্য আদেশ দিলেন। আয়েশা (রা:) আমলের প্রতিযোগীতায় অন্যান্য সাথি-সঙ্গিদের চেয়ে একটু পিছনে পরে যাওয়ায় মনে মনে কষ্ট অনুভব করলেন। কারণ সকলেই স্বতন্ত্র ভাবে ওমরাহও করলো হজ্জও করলো। আর তিনি হজ্জের সঙ্গে মিলিয়ে ওমরাহ করলেন। একারণে রাসূলুল-াহ (সা:) আয়েশা (রা:) এর ভাই আবদুর রাহমানকে নির্দেশ দিলেন যে, হারামের সীমানার বাহিরে 'তানঈম' নামক জায়গা থেকে ইহরাম বেঁধে এসে ওমরাহ আদায় করার জন্য। এখান থেকেই সুচনা হলো 'তানঈম' থেকে ওমরাহ

করার প্রচলন। সুতরাং কেউ যদি আয়েশা (রা:) এর মত কোন কারণে হজ্জের আগে ওমরাহ করতে না পারে, তাহলে তার জন্য হজ্জের পরে ওমরাহ করতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু যারা মক্কায় এসে হজ্জের পূর্বে একবার ওমরাহ করে ফেলেছে তাদের জন্য বারবার 'তানঈম' বা 'মসজিদে আয়েশা'য় গিয়ে ওমরাহ করার কোন প্রমাণ নেই। বরং ঐ পর্যন্ত যেতে আসতে যে পরিমান সময় ব্যয় হবে সে সময়টাকে নফল তাওয়াফ করার পেছনে ব্যয় করা অনেক ভাল। বারবার ওমরাহ করা যদি কোন বেশী সওয়াবের কাজ হতো তাহলে রাসূলুল-াহ (সা:) নিজেও অনেক ওমরাহ করতেন। কিন্তু না, তিনি তা করেননি। বরং তিনি সারা জীবনে সর্বমোট ৪টি ওমরাহ করেছেন। ১. ওমরাতুল হুদাইবিয়া (মক্কার কাফেরদের বাধার কারণে হুদাইবিয়া থেকেই ফিরে যেতে হয়েছিল)। ২. ওমরাতুল কাযা।(পরবর্তী বছর হুদাইবিয়ার কাযা ওমরাহ) ৩. ওমরাতুল জিই'ররানাহ । (যেখানে হুনাইন যুদ্ধের গনিমতের মাল বণ্টন করা হয়েছিল সেখান থেকে ইহরাম বেঁধে ওমরাহ করেছিলেন) ৪. বিদায়ী হজ্জের সাথে।

এতদসত্ত্বেও কেউ যদি মক্কায় থাকা অবস্থায় ওমরাহ করতে চায় তাহলে তাকে হারামের সীমানার বাহিরে গিয়ে ইহরাম বেঁধে আসতে হবে। সবচেয়ে নিকটে যেই জায়গাটি তার নাম হলো 'তানঈম'। যেখান থেকে আয়েশা (রা:) ওমরাহ করেছিলেন। একারণে বর্তমানে ওখানে যে মসজিদটি রয়েছে সেটি ' মসজিদে আয়েশা ' নামে পরিচিত। হারাম শরীফ থেকে ওখানে যাওয়ার জন্য সব রকমের গাড়ি পাওয়া যায়। আপনি ইচ্ছে করলে যে কোন সময়ে ওখানে গিয়ে পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী ইহরাম বেঁধে ওমরাহ করতে পারেন।

প্রশ্ন: ওমরাহ্'র ফরজ কয়টি এবং কি কি?

উত্তর: অধিকাংশ ওলামাদের মতে ওমরাহ্'র ফরজ তিনটি।

১. ইহরাম।

২. তাওয়াফ করা।

৩. সাফা-মারওয়ায় সায়ী করা।

হানাফী মাযহাব মতে ওমরাহ'র ফরজ দুইটি। ইহরাম বাঁধা এবং তাওয়াফ করা। সাফা-মারওয়া সায়ী করা হানাফীদের মতে ওয়াজিব, ফরজ নয়।

প্রশ্ন: ওমরাহ্'র ওয়াজিব কয়টি ও কি কি?

উত্তর: অধিকাংশ ওলামাদের মতে ওমরাহ্'র ওয়াজিব তিনটি:

১. যারা মীকাতের বাহিরে অবস্থান করে তারা মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা। আর যারা মীকাতের ভিতরে কিন্তু হারামের সীমানার বাহিরে অবস্থান করে তারা নিজ গৃহ থেকে, আর যারা হারামের সীমানার ভিতরে মক্কায় থাকে তারা ওমরা করতে চাইলে হারামের বাহিরে 'তানঈম' বা অন্যকোন জায়গা থেকে ইহরাম বেঁধে আসবে। যেমনটি আয়েশা (রাঃ) করেছিলেন।
২. সাফা-মারওয়া সায়ী করা। এটি হানাফী মাযহাব মতে ওয়াজিব অন্যদের মতে ফরজ।
৩. মাথা মু্ন্ডানো বা চুল ছাঁটা।

প্রশ্নঃ ওমরাহর মধ্যে আমরা কি কি কাজ করবো?
উত্তরঃ এক নজরে ওমরাহর মধ্যে করণীয় কাজ সমূহ:
ইহরাম বাঁধার পূর্বে গোঁফ, চুল, নখ, বগল ও নাভীর নীচে ক্ষৌরকর্ম সমাপনের পর গোসল করে পরিষ্কার হয়ে ইহরামের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। গোসল করা সম্ভব না হলে ভালভাবে অজু করে নিবে। আতর জাতীয় সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারলে ভাল। মীকাত অর্থাৎ ইহরাম বাঁধার নির্ধারিত স্থান হতে ওমরাহ'র নিয়তে ইহরাম বাঁধতে হবে। ফরজ সালাতের সময় হলে ফরজ সালাতের পরে আর ফরজ সালাতের সময় না হলে দু'রাকাত নফল সালাত আদায় করে মুখে 'লাব্বাইকা বি-উমরাতিন' বলে ওমরাহ'র নিয়ত করে নিবে। নিয়ত করার পর সাথে সাথে তালবিয়া পাঠ করতে হবে। তালবিয়া হলোঃ

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ

উচ্চারণ: "লাব্বাইক আল-াহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইক লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নিঅ'মাতা লাকা ওয়াল মূলক, লা শারীকা লাকা।"

অর্থ: "আমি হাজির, হে আল-াহ! আমি হাজির, আমি হাজির, তোমার কোন শরীক নেই। আমি হাজির, নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নিয়ামত তোমারই, আর সকল ক্ষমতা তোমার, তোমার কোন শরীক নাই।"[৪]
তালবিয়া পুরুষগণ জোরে জোরে ও মহিলাগণ আস্তে আস্তে পাঠ করবে। কাবা শরীফ পৌঁছার পর সম্ভব হলে হাজরে আসওয়াদ পাথর চুমু দিয়ে তা সম্ভব না হলে হাতে স্পর্শ করে তাও সম্ভব না হলে হাতে ইশারা করে 'বিসমিল-াহি আল-াহু আকরাব' বলে তাওয়াফ শুরু করবে এবং কাবার চতুর্দিকে সাতবার চক্কর

[৪] সহীহ মুসলিম ২৮৬৮।

দিবে। প্রতি তাওয়াফে 'রুকনে ইয়ামানী' ও 'হাজরে আসওয়াদে'র মাঝখানে নিম্নের দোয়াটি পাঠ করবেঃ

[رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [البقرة: ২০১}

উচ্চারণ: "রাব্বানা আতিনা ফিদ দুনইয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাহ, ওয়া কিনা আযাবান্ নার।"
অর্থ: "হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে এবং আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন।"[৫]
তাওয়াফের পর নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করতে করতে মাকামে ইবরাহীমের সামনে দাড়াবে। আয়াতটি হলোঃ

[وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلى} [البقرة: ১২৫}

উচ্চারণ: "অত্তাখিজূ মিম মাকামি ইবরাহীমা মুসাল-া।"
অর্থ: "তোমরা 'মাকামে ইবরাহীমকে' সালাতের স্থান হিসাবে গ্রহণ করা।"[৬]
সম্ভব হলে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দুই রাকাআত সালাত করবে। নতুবা 'মসুজিদুল হারামে'র যে কোন জায়গায় আদায় করতে পারে। তাওয়াফের পরের দু'রাকাআত সালাত নিষিদ্ধ সময়ে[৭] আদায় করা জায়েজ। সালাত আদায় করে যমযমের পানি পান করবে এবং মাথায় ঢালবে।
অতপর সাতবার সাফা-মারওয়ায় সায়ী করবে। প্রথমে সাফা-পাহাড় থেকে শুরু করবে। সাফা পাহাড়ে গিয়ে পাঠ করুনঃ

[إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: ১৫৮ }

উচ্চারণ: "ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওতা মিন শাআইরিল-াহ।"
অর্থ: "নিশ্চয় সাফা-মারওয়া পাহাড় আল-াহর নিদর্শণাবলীর মধ্য থেকে অন্যতম নিদর্শণ।"[৮]
এরপর বলবেঃ

أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ

উচ্চারণ: "আবদাউ বিমা বাদাআল-াহু বিহী"।
অর্থ: " আল-াহ (সুবঃ) যেভাবে শুরু করেছেন আমিও সেভাবে শুরু করছি।"

[৫] সুনানে আবু দাউদ ১৮৯৪।
[৬] সুরা বাকারা ১২৫।
[৭] নিষিদ্ধ সময় বলতে সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত এবং সূর্য ঠিক মধ্যাকাশে থাকার সময়কে বুঝানো হয়েছে।
[৮] সুরা বাকারা ১৫৮।

সাফা পাহাড়ে উঠে কিবলার দিকে মুখ করে এই দু'আ পাঠ করবে:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ

উচ্চারণ: " লা ইলাহা ইল-াহু, অহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু, ওয়াহুয়া আলা কুলি- শাই ইন কাদীর, । লা ইলাহা ইল-াহু, অহদাহু আনজাযা ওয়া'দাহু, ওয়া নাসারা আবদাহু ,ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহু" ।

অর্থ: " আল-াহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি একক। তার কোন শরীক নেই। সকল ক্ষমতা তার, এবং সকল প্রশংসার উপযুক্ত তিনিই, তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল-াহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তিনি তার ওয়াদা পূর্ণ করেন, তাঁর বান্দাদের সাহায্য করেন এবং একাই সম্মিলিত দুশমন বাহিনীকে পরাজিত করেন।"

এই দু'আ তিনবার পাঠ করবে। তারপর ইবাদতের নিয়ত করে সাফা থেকে মারওয়া এবং মারওয়া থেকে সাফায় এভাবে সাতবার সায়ী করবে। সাফা থেকে শুর" হবে, মারওয়ায় গিয়ে শেষ হবে। অনেকে ভুল করে সাফা থেকে মারওয়া এবং মারওয়া থেকে পুনরায় সাফা এসে একবার সায়ী' হয় বলে মনে করে। এটা ভুল। বরং সাফা থেকে মারওয়া গেলেই একবার সায়ী পূর্ণ হয়ে যাবে।। মারওয়া পাহাড়ে ঐ আমলগুলোই করবে যা সাফা পাহড়ে করেছিলো। আবার মারওয়া থেকে সাফা পর্যন্ত এলে আরেকবার পূর্ণ হয়ে যাবে। এভাবে মারওয়া গিয়ে শেষ হবে। সাফা-মারওয়ার মাঝ পথে দুই সবুজ চিহ্নের মধ্যবর্তী স্থানে পুর"ষগণ জোরে দৌড়াবে, মহিলাগণ স্বাভাবিকভাবে হাঁটবে। এবং এই দু'আটি পাঠ করবে:

رَب اغفر وارحم وانك انت الأعز الأكرم

উচ্চারণ: "রাব্বিগ ফির ওয়ারহাম ওয়া ইন্নাকা আন্তাল আআ'জ্জুল আকরাম।"

অর্থ: "হে আমার রব! আপনি আমাকে ক্ষমা কর"ন এবং আমার উপর দয়া কর"ন। নিশ্চয়ই আপনি মহা ক্ষমতাবান এবং সম্মানিত।"

সায়ীর জন্য নির্ধারিত কোন দু'আ নেই। সায়ী সমাপ্ত হলে মাথা মু"ানো বা মাথার চুল ছোট করে ছেঁটে নিতে হবে। এরপরই ওমরাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে এবং ইহরামের পরে যা হারাম ছিল তা হালাল হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: হজ্জ

প্রশ্ন: হজ্জের শাব্দিক এবং পারিভাষিক অর্থ কি?

উত্তর: الحج। 'হজ্জ' এর শাব্দিক অর্থ হলো **القصد।** বা 'ইচ্ছা করা'। পরিভাষায় হজ্জ বলা হয় 'নির্দিষ্ট ইবাদত পালন করার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আল-াহর ঘর, হারাম শরিফ এবং হজ্জের বিধি-বিধান পালনের স্থান সমুহের উদ্দেশ্যে সফর করার ইচ্ছা করা'।

প্রশ্ন:হজ্জের হুকুম কি?

উত্তর: যদি কোন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি জীবনে একবার হজ্জ আদায় করতে সক্ষম হয় তাহলে তার উপর হজ্জ আদায় করা ফরজে আইন হয়ে যায়। (সক্ষম হওয়ার জন্য বিভিন্ন শর্তবলী রয়েছে যা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। ইনশাআল-াহ!) কুরআন, হাদীস এবং ইজমা দ্বারা বিষয়টি প্রমানিত। নিম্নে দলীল-প্রমাণ সহ বিষয়টি পেশ করা হলো:

কুরআনের দলীল

পবিত্র কুরআনে আল-াহ (সুব:) ইরশাদ করেন:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (آل عمران: ৯৭)

অর্থ: " সামর্থ্যবান মানুষের উপর আল-াহর জন্য বায়তুল-ার হজ্জ করা ফরয। আর যে কুফরী করে, (তার জেনে রাখা উচিৎ) নিশ্চয় আল-াহ (সুব:) সৃষ্টিকূল থেকে অমুখাপেক্ষী।"[৯]

হাদীসের দলীল

হজ্জ ফরজ হওয়ার ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এমনকি এই হাদীসের সংখ্যা 'তাওয়াতুর'[১০] এর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। তার মধ্যে কয়েকটি হলো:

---

[৯] সুরা আল ইমরান ৯৭।

[১০] 'তাওয়াতুর' বলা হয় এমন হাদীসকে যা এত বেশী সংখ্যক রাবী (বর্ণনাকারী) বর্ণনা করেছেন যে, হাদীসটি মিথ্যা হওয়ার কোন সম্ভবনাই বাকি থাকে না। এই পর্যায়ের হাদীস অস্বীকারকারী কাফের বলে বিবেচিত হবে।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ (بخاري ومسلم)

অর্থ: "আবদুল-াহ ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল-াহ (সা:) বলেছেন: ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আল-াহর একাত্বতা ঘোষণা করা, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমজানে সিয়াম পালন করা এবং হজ্জ আদায় করা।"[১১]

এই হাদীসে হজ্জকে ইসলামের পঞ্চবেনার একটি বেনা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। অপর একটি হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلاَثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ

অর্থ: "আবূ হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল-াহ (সা:) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন: "হে মানবজাতী! আল-াহ (সুব:) তোমাদের উপর হজ্জ ফরজ করেছেন। কাজেই তোমরা হজ্জ করো।" তখন এক ব্যক্তি বললো, হে আল-াহর রাসূল! প্রতি বছর কি হজ্জ করতে হবে? তিনি চুপ রইলেন এবং লোকটি এভাবে তিনবার জিজ্ঞেস করল। অতঃপর রাসূলুল-াহ (সা:) বললেন: "আমি যদি হ্যাঁ বলতাম, তাহলে তা (প্রতি বছরের জন্যই) ফরজ হয়ে যেত। আর তখন তোমাদের পক্ষে তা আদায় করা সম্ভব হত না।[১২]

ইজমা

উম্মতের ওলামায়ে কেরাম এই ব্যাপারে 'ইজমা' বা ঐক্যমত যে, সক্ষম ব্যক্তির উপর জীবনে একবার হজ্জ করা ফরজ। এবং যে ব্যক্তি হজ্জ ফরজ হওয়াকে অস্বীকার করবে সে কাফের হয়ে যাবে।

---

[১১] সহীহ মুসলিম ১৯ নং হাদীস; সহীহ বুখারী ৮ নং হাদীস; সুনানে তিরমিজি ২৬০৯ নং হাদীস।

[১২] সহীহ মুসলিম ৩৩২১।

হজ্জের ফজিলত

প্রশ্ন: হজ্জ করার ফজিলত কি?

উত্তর: কুরআন ও হাদীসে হজ্জের অসংখ্য ফজিলতের কথা উলে-খ রয়েছে। তার মধ্য থেকে কয়েকটি নিম্নে উলে-খ করা হলো।

১. হজ্জের মাধ্যমে মানুষ নবজাতকের মত নিষ্পাপ হয়ে যায়।

হাদীস:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

অর্থ: "আবূ হুরাইরা রা: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল-াহ সা: বলেছেন: যে ব্যক্তি বাইতুল-াহ শরীফে হজ্জ করলো এবং অন্যায় কথা ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকলো, সে যেন সদ্যভূমিষ্ট শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসলো।"[১৩]

আমর ইবনুল আস (রা:) থেকে বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসের একটি অংশে বলা হয়েছে:

أَنَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ

অর্থ: "নিশ্চয় ইসলাম তার পূর্বের সবকিছুকে (গুনাহকে) নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এবং নিশ্চয় হিজরত তার পূর্বের সবকিছুকে (গুনাহকে) নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এবং নিশ্চয় হজ্জ তার পূর্বের সবকিছুকে (গুনাহকে) নিশ্চিহ্ন করে দেয়।[১৪]

অপর হাদীসে উলে-খ করা হয়েছে:

عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ

অর্থ: "ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল-াহ (সা:) বলেছেন, তোমরা হজ্জ এবং ওমরাহ পালন কর। কেননা উহা দারিদ্রতা এবং গুনাহ সমূহকে এমনভাবে দূর করে দেয় যেমনভাবে হাপড় লোহার জং দুর করে দেয়।"[১৫]

---

[১৩] সহীহ বুখারী ১৫২১।

[১৪] সহীহ মুসলিম৩৩৬।

[১৫] সুনানে নাসায়ী ২৬২৯।

২. কবুল হজ্জের বিনিময় হলো জান্নাত ।

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّةُ الْمَبْرُورَةُ لَيْسَ لَهَا جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ وَالْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا

অর্থ: "আবূ হুরাইরা রা: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল-াহর রাসূল সা: বলেছেন, কবুল হজ্জের বিনিময় কেবলমাত্র জান্নাত। এক ওমরাহ থেকে আরেক ওমরাহ মধ্যবর্তী গুনাহ সমূহের কাফফারা।[16]

৩. হজ্জ জাহান্নাম থেকে মুক্তি অর্জণের উপায়।

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عن عَائِشَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِى بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ

অর্থ: "আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল-াহ (সা:) বলেছেন: আরাফাতের দিনে মহান আল-াহ (সুব:) যত সংখ্যক বান্দাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন, তার চেয়ে বেশী মুক্তি দেন এমন দিন আর দ্বিতীয়টি নেই। এদিন আল-াহ (সুব:) অত্যন্ত নিকটবর্তী হয়ে বান্দাদের অবস্থা দেখে ফেরেশতাদের সামনে তাদেরকে নিয়ে গর্ব করেন।"[১৭]

অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى السماء فيباهي بهم الملائكة فيقول : انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم إني قد غفرت لهم فتقول له الملائكة : إي رب فيهم فلان يزهو و فلان و فلان قال يقول الله : قد غفرت لهم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة

অর্থ: "জাবের (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল-াহ (সা:) বলেছেন, আরাফাতের দিন আল-াহ (সুব:) প্রথম আসমানে অবতরণ করেন এবং হাজীদের ব্যাপারে ফেরেশতাদের নিকট গর্ব করে বলেন, 'তোমরা আমার বান্দাদের দিকে তাকাও, তারা সকল রাজপথ দিয়ে আমার কাছে এসেছে এলোকেশে, ধূলামলিন

[১৬] নাসায়ী শরীফ ২৬২১।

[১৭] সহীহ মুসলীম ৩৩৫৪।

অবস্থায়, তালবিয়া পাঠ করতে করতে।' তোমরা সাক্ষী থাক আমি তাদের সকলকে ক্ষমা করে দিলাম। তখন ফেরেশতারা বলবে, হে আল-াহ! তাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি অমনোযোগী, অমুক... অমুক...। উত্তরে আল-াহ (সুব:) বলেন, আমি তাদের সকলকেই ক্ষমা করে দিলাম। আল-াহর রাসূল (সা:) বললেন: আরাফাতের দিন আল-াহ (সুব:) জাহান্নাম থেকে যে পরিমান মানুষকে মুক্তি দান করেন এত পরিমান মানুষকে আর কোন দিন মুক্তি দান করেন না।"[১৮]

৪. হজ্জ: ঈমান ও জিহাদের পরে সর্বোত্তম আমল।

হাদীস:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ

অর্থ: "আবূ হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল-াহ (সা:) কে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'কোন আমলটি সর্বোত্তম?' তিনি বললেন: আল-াহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনা। প্রশ্ন করা হল, "এরপর কোন আমলটি?' তিনি বললেন: আল-াহর রাস্তায় জিহাদ করা। প্রশ্ন করা হলো, 'তারপর কোন আমলটি?' তিনি বললেন: 'মকবুল হজ্জ।"[১৯]

৫. হজ্জের মাধ্যমে আল-াহর আহবানে সাড়া দেয়া হয়

{وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (২৭) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ [الحج: ২৭، ২৮]

অর্থ: "আর মানুষের মাঝে হজ্জের ঘোষণা দাও; তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং কৃশকায় উটে চড়ে দূর পথ পাড়ি দিয়ে। যেন তারা নিজেদের কল্যাণের স্থান সমূহে হাযির হতে পারে।"[২০]

এই আয়াতে আল-াহ (সুব:) ইবরাহীম (আ:) এর মাধ্যমে গোটা মানবজাতিকে হজ্জ করার প্রতি আহবান জানিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি হজ্জ করতে গেল সে মূলত: আল-াহর এই আহবানেই সাড়া দিল।

[১৮] সহীহ ইবনে খুযাইমাহ ২৮৪০ আল-ামা আলবানী র: বলেন হাদীসটি দূর্বল معنعن হওয়ার কারণে।

[১৯] সহীহ বুখারী ২৬।

[২০] সুরা হজ্জ ২৭-২৮।

প্রশ্ন: হজ্জ ফরজ হওয়ার পর তা আদায় না করলে শাস্তি কি?

উত্তর: হজ্জ ফরজ হওয়ার পর বিনা ওজরে আদায় না করে মারা গেলে তার ব্যাপারে কঠোর শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। যেমন হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عن عمر بن الخطاب قال : من أطاق الحج ولم يحج فاقسموا عليه أنه مات يهوديا أو نصرانيا

অর্থ: "ওমর ইবনে খাত্তাব (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যে ব্যক্তি হজ্জ করতে সক্ষম হলো কিন্তু হজ্জ আদায় করলো না। তোমরা তার ব্যাপারে কসম করে বলতে পার যে, সে ইয়াহুদী বা খৃষ্টান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।[২১]

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে:

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : من أطاق الحج فلم يحج ، فسواء عليه مات يهوديًا أو نصرانيًا

অর্থ: "যে ব্যক্তি হজ্জ ফরজ হওয়া সত্ত্বেও আদায় না করে মারা গেল সে ইয়াহুদী হয়ে মারা গেল না খৃষ্টান হয়ে মারা গেল তাতে কিছু আসে যায় না।[২২]

ইমাম সুদ্দী (র:) বলেন:

هو من وجد ما يحج به ، ثم لم يحج حتى مات فهو كفر به .

অর্থ: "যে ব্যক্তি হজ্জ করার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও তা আদায় না করে মারা গেল সে কুফুরী করা অবস্থায় মারা গেল।"[২৩]

প্রশ্ন: হজ্জ ফরজ হওয়ার জন্য শর্ত কি কি?

উত্তর: হজ্জ ফরজ হওয়ার শর্তাবলী নিম্নে উলে- খ করা হলো:

১. (المسلم) মুসলিম হওয়া।

২. (العاقل) সুস্থ জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া, অর্থাৎ পাগল না হওয়া।

৩. (البالغ) বালেগ হওয়া, অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া।

৪. (الحر) স্বাধীন হওয়া, অর্থাৎ গোলাম না হওয়া।

৫. (الاستطاعة) হজ্জ করার মত দৈহিক ও আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকা। অর্থাৎ সফরকালীন সময়ের জন্য আপন পরিবার-পরিজনের আবশ্যকীয় ভরণ-পোষণের

---

[২১] কানযুল উম্মাল ১২৩৯৯।

[২২] রিয়াদুস সালেহিন ১২৭০।

[২৩] রিয়াদুস সালেহিন ১২৭০।

ব্যবস্থা রেখে মক্কা মুকার্‌রমা পর্যন্ত যাতায়াতের ব্যয় নির্বাহ করতে সক্ষম হওয়া। এবং শারীরিকভাবে সুস্থ থাকা।

৬. (المحرم للنساء) মহিলাদের জন্য সঙ্গে মাহ্‌রাম থাকা।

প্রশ্ন: মুসলিম হওয়া, সুস্থ জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া, বালেগ হওয়া ও স্বাধীন হওয়া এগুলো কি একই পর্যায়ের শর্ত? নাকি কোন ভিন্নতা আছে?

উত্তর: মুসলিম হওয়া এবং সুস্থ জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া হজ্জ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি কাফের অবস্থায় বা পাগল অবস্থায় হজ্জ করে তাহলে তার হজ্জ শুদ্ধ হবে না। বরং বাতিল বলে গন্য হবে। পক্ষান্তরে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া এবং স্বাধীন হওয়া হজ্জ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয় বরং নিজের পক্ষ থেকে ফরজ হজ্জ আদায় হওয়ার জন্য শর্ত। সুতরাং যদি নাবালেগ বাচ্চা বা গোলাম হজ্জ করে তাহলে তাদের হজ্জ শুদ্ধ হবে বটে তবে ফরজ হজ্জ হিসেবে আদায় হবে না বরং নাবালেগ বাচ্চা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর এবং গোলাম আযাদ হওয়ার পর আবার ফরজ হজ্জ আদায় করতে হবে। নাবালেগ অবস্থায় এবং গোলাম অবস্থায় আদায় করা হজ্জের সওয়াব বাচ্চার অভিভাবক ও গোলামের মালিক পাবে। দলিল:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم لَقِىَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ مَنِ الْقَوْمُ قَالُوا الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا مَنْ أَنْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيا فَقَالَتْ أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ

অর্থ: "আবদুল-াহ ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল-াহ (সা:) এর সাথে 'রাওহা' নামক স্থানে একদল আরোহীর সাক্ষাৎ হলো। তিনি বললেন, 'তোমরা কারা?' তারা বললো, আমরা মুসলিম। তারা প্রশ্ন করলো আপনি কে? রাসূলুল-াহ (সা:) বললেন, আমি আল-াহর রাসূল। অত:পর একজন মহিলা রাসূল (সা:) এর সামনে একটি বাচ্চাকে তুলে ধরে প্রশ্ন করলেন, এই বাচ্চার হজ্জ কি শুদ্ধ হবে? রাসূলুল-াহ সা: বললেন, হ্যা! তবে সওয়াবটা তুমি পাবে।"[২৪]

বাচ্চা এবং গোলাম থাকা অবস্থায় হজ্জ করলেও পরবর্তীতে বালেগ হওয়ার পর আবার হজ্জ করতে হবে এর দলীল:

---

[২৪] সহীহ মুসলিম ৩৩১৭;

عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل فإذا عقل فعليه حجة أخرى وإذا حج الغلام فهي له حجة فإذا هاجر فعليه حجة أخرى

অর্থ: "ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল-াহ সা: বলেছেন: যদি কোন নাবালেগ বাচ্চা হজ্জ করে তাহলে নাবলেগ থাকা পর্যন্ত ঐ হজ্জ তার জন্য গ্রহণযোগ্য হবে, অতপর যখন সে বালেগ হবে তাকে দ্বিতীয়বার হজ্জ করতে হবে। এমনিভাবে যদি কোন গোলাম হজ্জ করে তাহলে গোলাম থাকা পর্যন্ত তার ঐ হজ্জ তার জন্য গ্রহণযোগ্য হবে, যখন সে আযাদ হবে তখন তাকে দ্বিতীয়বার হজ্জ করতে হবে।"[২৫]

প্রশ্ন: হজ্জ ফরজ হওয়ার সাথে সাথে ঐ বছরই আদায় করা ওয়াজিব না বিলম্ব করা যাবে?

উত্তর: হজ্জ ফরজ হওয়ার সাথে সাথে ঐ বছরই আদায় করা ওয়াজিব নাকি বিলম্ব করা যাবে, এ ব্যাপারে ওলামাদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। তবে সকলের মতেই উত্তম হলো, ঐ বছরই আদায় করে নেয়া, বিলম্ব না করা। কেননা কুরআন ও হাদীসে যথাসম্ভব দ্রুত হজ্জ আদায় করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি হাদীস পেশ করা হলো:

হাদীস: **أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا** অর্থ: "হে মানবজাতী! আল-াহ (সুব:) তোমাদের উপর হজ্জ ফরজ করেছেন। কাজেই তোমরা হজ্জ করো।"[২৬]

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: **مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ**

অর্থ: "যে ব্যক্তি হজ্জ পালন করার ইচ্ছা করলো সে যেন তাড়াতাড়ি তা আদায় করে।"[২৭]

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে হজ্জ ফরজ হওয়ার পর যত দ্রুত সম্ভব তা আদায় করতে হবে। তাছাড়া মানুষের জীবনের কোন নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং যদি হজ্জ করতে সক্ষম হওয়ার পর বিলম্ব করে এবং এ অবস্থায় মারা যায় তাহলে একটি ফরজ বিধান পালন না করার গুনাহ নিয়ে মারা গেল। এই গুনাহের থেকে বাঁচার জন্য উচিত হবে হজ্জ ফরজ হওয়ার পর তাৎক্ষনিক অর্থাৎ ঐ বছরই

[২৫] সহীহ ইবনে খুযাইমাহ ৩৪৯।
[২৬] সহিহ মুসলিম ৩৩২১।
[২৭] সুনানে আবু দাউদ ১৭৩৪; মুসতাদরাকে হাকেম ১৬৪৫ হাদীসটি সহীহ।

আদায় করে নেয়া। এছাড়াও হজ্জ একটি কঠিন ইবাদত। শক্তি থাকতেই তা আদায় করে নেয়া উচিৎ। বৃদ্ধ হয়ে গেলে হজ্জের অনেক কাজই নিজে করা সম্ভব হয় না, অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। সুতরাং নিজের শক্তি থাকতেই হজ্জ আদায় করে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ।

তবে ঐ বছর আদায় না করে বিলম্বে আদায় করাও জায়েজ হবে। কেননা রাসূলুল-াহ (সা:) মক্কা বিজয় করেছেন ৮ম হিজরীতে আর হজ্জ করেছেন ১০ম হিজরীতে। মাঝের দুই বছর কোন ওজর ব্যতিতই রাসূলুল-াহ (সা:) বিলম্ব করেছেন। তাই বুঝা গেল হজ্জ ফরজ হওয়ার পর বিলম্ব করা জায়েজ আছে।

প্রশ্ন: الاستطاعة। (সামর্থবান) বলতে কি বুঝায়? এটা কি হজ্জ ফরজ হওয়ার জন্য শর্ত?

উত্তর: সামর্থবান বলতে তিনটি জিনিষকে বুঝায়। ১. দৈহিকসুস্থতা ২.আর্থিক স্বচ্ছলতা ৩. রাস্তার নিরাপত্তা।

১. দৈহিকসুস্থতা: দৈহিকভাবে সামর্থবান বলতে হজ্জ করার জন্য যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রয়োজন হয় সেগুলো সুস্থ ও সুষ্ঠ থাকা, হজ্জ করতে বাঁধা সৃষ্টি করতে পারে এমন রোগ থেকে মুক্ত থাকা বুঝায়। সুতরাং যার মধ্যে হজ্জ ফরজ হওয়ার সকল শর্ত পাওয়া যাওয়া সত্তেও স্থায়ীভাবে অসুস্থ হওয়ার কারণে আথবা 'প্যারালাইসিস' হওয়ার কারণে নিজে হজ্জ করতে অক্ষম তার উপর সকল ইমামের সর্বসম্মতিক্রমে নিজে হজ্জ করা ফরজ নয়। অবশ্য অন্যকে দিয়ে বদলি হজ্জ করাতে হবে কিনা সে ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মদের নিকট অন্যকে দিয়ে 'বদলী হজ্জ' করানো জরুরী। কেননা দৈহিক সুস্থতা নিজে হজ্জ আদায় করার জন্য শর্ত, মৌলিকভাবে হজ্জ ফরজ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানিফা (র:) ও ইমাম মালেক (র:) বলেন, নিজে হজ্জ করতে না পারলে অন্যকে দিয়ে বদলী হজ্জ করানো জরুরী নয়।[২৮] তবে শুদ্ধতার দিক থেকে প্রথম মতটিই গ্রহণযোগ্য। কেননা ইবনে আব্বাস রা: থেকে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ

[২৮] নিহায়াতুল মুহতাজ ৩/৩৮৫; আল কাফী ১/২১৪; ফাতহুল কাদীর ২/১২৫।

অর্থ: “ইবনে আব্বাস রা: থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় ‘খাসআম’ গোত্রের একজন মহিলা রাসূল সা: এর কাছে এসে প্রশ্ন করলো, ইয়া রাসূলুল-াহ (সা:) ‘আমার পিতা একজন বৃদ্ধ মানুষ যার উপর হজ্জ ফরজ হয়েছে। কিন্তু তিনি কোন বাহনে আরোহন করতে পারেন না। আমি যদি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করি তাহলে কি তার পক্ষ থেকে আদায় হবে? উত্তরে রাসূলুল-াহ সা: বললেন, হ্যা! আদায় হবে।”[২৯]

এই হাদীস অনুযায়ী পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে দৈহিকভাবে অক্ষম হলেও আর্থিক সামর্থ থাকলে হজ্জ ফরজ হয়ে যায়। কিন্তু নিজে আদায় করা ফরজ নয়। অন্যকে দিয়ে বদলি হজ্জ করালেও চলবে। সুতরাং কেউ যদি শারিরীকভাবে অক্ষম থাকা সত্ত্বেও কষ্ট করে হজ্জ করে তাহলে তার হজ্জ শুদ্ধ হবে এবং তার পক্ষ থেকে ফরজ হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। যেমনিভাবে অসুস্থ ব্যক্তি যদি কষ্ট করে সাওম পালন করে অথবা অসুস্থ ব্যক্তি যদি কষ্ট করে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে তাহলে তা আদায় হয়ে যায় তেমনিভাবে পঙ্গু বা অসুস্থ ব্যক্তি যদি কষ্ট করে হজ্জ আদায় করে তাহলে তা আদায় হয়ে যাবে। আর যদি নিজে আদায় করতে না পারে তাহলে অন্যকে দিয়ে বদলি হজ্জ করাবে। কেননা দৈহিক সক্ষমতা বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী নিজের হজ্জ আদায়ের জন্য শর্ত। ফরজ হওয়ার জন্য শর্ত নয়।

২.আর্থিক স্বচ্ছলতা: অর্থিক স্বচ্ছলতা বলতে মৌলিক প্রয়োজন যথা: ঋণ পরিশোধ, হজ্জ থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত পরিবারের খোরপোষের খরচ বাদ দিয়ে মক্কা পর্যন্ত যাওয়া, সেখানে অবস্থান করা ও হজ্জ শেষে নিজ দেশে ফিরে আসা পর্যন্ত যাতায়াত ভাড়া, খানা-পিনা, বাড়ি ভাড়াসহ যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম হওয়াকে বুঝায়। সুতরাং এই পরিমান সম্পদের মালিক হলেই তার উপরে হজ্জ ফরজ হয়ে যায়। হজ্জ ফরজ হওয়ার জন্য অনেক ধনী হওয়া শর্ত নয়।

৩. রাস্তার নিরাপত্তা: রাস্তার নিরাপত্তা বলতে হজ্জের সফরে বের হওয়া থেকে শুর“ করে পুনরায় ফিরে আসা পর্যন্ত রাস্তা-ঘাটে জান এবং মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়াকে বুঝায়। সুতরাং বাহ্যিকভাবে যদি রাস্তায় নিরাপত্তা না থাকে তাহলে হজ্জ ফরজ হবে না। কেননা আল-াহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে বলেছেন:

{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران: ٩٧]

২৯

অর্থ: “ সামর্থ্যবান মানুষের উপর আল-াহর জন্য বায়তুল-াহর হজ্জ করা ফরয।”[৩০] আর রাস্তার নিরাপত্তা ছাড়া সামর্থবান হওয়া যায় না।

মহিলাদের হজ্জ

প্রশ্ন: মহিলাদের উপর হজ্জ ফরজ হওয়ার জন্য মাহরাম সঙ্গে থাকা কি শর্ত?

উত্তর: হ্যাঁ! মহিলাদের উপর হজ্জ ফরজ হওয়ার জন্য অন্যান্য শর্তের সঙ্গে অতিরিক্ত আরেকটি শর্ত হচ্ছে মাহরাম সঙ্গে থাকা। চাই সে স্বামী হোক বা অন্য কোন মাহরাম হোক। কেননা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتْ امْرَأَتِي حَاجَّةً قَالَ اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

অর্থ: “ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল-াহ সা: কে বলতে শুনেছেন: কোন পুর“ষ যেন কোন মহিলার সাথে নির্জনে একত্র না হয় এবং কোন মেয়েলোক যেন মাহরাম ব্যতিত সফর না করে। একথা শুনে একজন সাহাবী দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেসা করলেন: ইয়া রাসূলুল-াহ! আমার নাম অমুক অমুক যুদ্ধে লেখানো হয়েছে, অপরদিকে আমার স্ত্রী হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হয়েছে। রাসূলুল-াহ (সা:) বললেন: তুমি যাও, তোমার স্ত্রীর সঙ্গে হজ্জ কর।[৩১]

এ হাদীসে দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মাহরাম ব্যতিত মেয়েলোক হজ্জ করতে পারবে না। কেননা উপরোক্ত হাদীসে রাসূলুল-াহ (সা:) জিহাদের মত গুর“ত্বপূন ইবাদত থেকে তাকে তার স্ত্রীর সাথে হজ্জে পাঠিয়ে দিলেন। যদি মহিলাদেও জন্য মাহরাম সঙ্গে থাকা শর্ত না হতো তাহলে রাসূলুল-াহ (সা:) তাকে জিহাদেও থেকে পাঠিয়ে দিতেন না। তাই হানাফী এবং হাম্বলী মাযহাবের মত এটাই। (মালেকী এবং শাফেয়ী মাযহাবের মত হচ্ছে: ফরজ হজ্জের জন্য মাহরাম শর্ত না। বরং রাস্তা নিরাপদ ও সাথী-সঙ্গী থাকলেই চলবে। অবশ্য নফল হজ্জের ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে মাহরাম শর্ত।)

প্রশ্ন: কোন মহিলা যদি মাহরাম ব্যতিত হজ্জ করে তাহলে তার হজ্জ আদায় হবে কি?

---

[৩০] সুরা আল ইমরান ৯৭।

[৩১] সহীহ বুখারী ৩০০৬; সহীহ মুসলিম ৩৩৩৬।

উত্তর: হ্যা! কোন মহিলা যদি মাহরাম ব্যতিত হজ্জ করে তাহলে তার হজ্জ আদায় হয়ে যাবে তবে সে মাহরাম ব্যতিত বের হওয়ার কারণে গুনাহগার হবে।

প্রশ্ন: মহিলাদের হজ্জ করার জন্য স্বামীর অনুমতির প্রয়োজন আছে কি?
উত্তর: যদি মহিলাদের উপর হজ্জ ফরজ হওয়ার পূর্বোলি- খিত শর্তাবলী পাওয়া যায় তাহলে সেক্ষেত্রে স্বামীর অনুমতি চাওয়া মুস্তাহাব। স্বামী যদি অনুমতি প্রদান করে তো ভাল। নতুবা অনুমতি ছাড়াই বের হয়ে যাবে। কেননা বেশিরভাগ ওলামাদের মতানুযায়ী ফরজ হজ্জে বাঁধা প্রদান করার কোন অধিকার স্বামীর নেই। যেমনিভাবে সালাত, সাওমসহ অন্য কোন 'ফরজে আইনে'র ক্ষেত্রে বাঁধা দেওয়ার অধিকার স্বামীর নেই। অবশ্য নফল হজ্জ বা বদলি হজ্জ করার ক্ষেত্রে স্বামীর অনুমতি নেওয়া সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজীব। এক্ষেত্রে স্বামীর বাঁধা দেওয়ার অধিকারও আছে।

প্রশ্ন: কোন মহিলা ইদ্দত চলাকালীন সময়ে হজ্জে যেতে পারবে কি?
উত্তর: না! ইদ্দত চলাকলীন অবস্থায় কোন মহিলা হজ্জের সফরে বা অন্য কোন সফরে বের হতে পারবে না। চাই সেটা তালাক পরবর্তী ইদ্দত হোক অথবা স্বামী মৃত্যুবরণ করার কারণেই হোক। কেননা আল-াহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন:

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} [الطلاق: ١]

অর্থ: "তোমরা তাদেরকে (ইদ্দত চলাকালীন অবস্থায়) তাদের ঘর থেকে বের করে দিও না এবং তারা নিজেরাও যেন বের না হয়।"[৩২]

বদলি হজ্জ

[৩২] সুরা তালাত **১**।

প্রশ্ন: কোন ব্যক্তির মধ্যে হজ্জ ফরজ হওয়ার আর্থিক শর্তাবলী পাওয়া যায়, কিন্তু দৈহিকভাবে সে পঙ্গু বা স্থায়ীভাবে অসুস্থ, সে কিভাবে হজ্জ করবে?
উত্তর: সে ব্যক্তি নিজে হজ্জ করা সর্বসম্মতিক্রমে ফরজ নয়। তবে অন্যকে দিয়ে বদলি হজ্জ করাতে হবে কিনা সে ব্যাপারে ওলামাদের মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম শা'ফী, আহমদ ও হানফী মাযহাবের ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র:) প্রমুখগন বলেন, হ্যা! এরকম ব্যক্তির অন্যকে দিয়ে বদলি হজ্জ করাতে হবে। কেননা দৈহিক সুস্থতা নিজে হজ্জ করার জন্য শর্ত, হজ্জ ফরজ হওয়ার জন্য শর্ত নয়।
ইমাম আবূ হানিফা ও মালেক (র:) এর মতে, তার উপর অন্যকে দিয়ে বদলী হজ্জ করানো অবশ্যক নয়।
তবে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী, সে অন্যকে দিয়ে বদলি হজ্জ করিয়ে নিবে। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ

অর্থ: "ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় 'খাসআম' গোত্রের একজন মহিলা রাসূল (সা:) এর কাছে এসে প্রশ্ন করলো, ইয়া রাসূলুল-াহ (সা:) 'আমার পিতা একজন বৃদ্ধ মানুষ যার উপর হ্জ্জ ফরজ হয়েছে। কিন্তু তিনি কোন বাহলে আরোহন করতে পারেন না। আমি যদি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করি তাহলে কি তার পক্ষ থেকে আদায় হবে? উত্তরে রাসূলুল-াহ সা: বললেন, হ্যা! আদায় হবে।"[৩৩]
অন্য আরেকটি রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ

অর্থ: "ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 'জুহাইনা' গোত্রের একজন মহিলা আল-াহর রাসূল (সা:) এর কাছে এসে বললো, আমার মা হজ্জ করবে বলে মান্নত করেছিল। কিন্তু তিনি হজ্জ না করেই মৃত্যুবরণ করেছেন।

৩৩

আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করতে পারবো? রাসূলুল-াহ (সা:) বললেন, হ্যা, তুমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করতে পারবে। যদি তোমার মার উপর কোন ঋণ থাকতো তাহলে কি তুমি তা পরিশোধ করতে না? আল-াহর ঋণতো পরিশোধ করার আরও বেশি অগ্রাধিকার রাখে।"[৩৪]
এই হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, কোন ব্যক্তি নিজে হজ্জ আদায় করতে না পারলে অন্যকে দিয়ে 'বদলী হজ্জ' করাবে।

প্রশ্ন: মৃত ব্যক্তি (যে সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ করেনি) তার পক্ষ থেকে বদলি হজ্জ করানো কি ফরজ?

উত্তর: হ্যা! যদি কোন ব্যক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করে মারা যায় তাহলে তার পক্ষ থেকে বদলি হজ্জ করানো ফরজ। চাই সে অসিয়ত করে যাক বা না যাক। বরং মানুষের ঋণ পরিশোধ করার আগে আল-াহর ঋণ পরিশোধ করাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কেননা মিরাসের আয়াতে আল-াহ (সুব:) বলেছেন:

[مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ] [النساء: ১১]

অর্থ: "(মিরাস বন্টন হবে) অসিয়ত পালনের পর, যা সে অসিয়ত করেছে অথবা ঋণ পরিশোধের পর।"[৩৫]
এই আয়াতে সকল প্রকার ঋণ আদায়ের কথা বলা হয়েছে। আর পূর্বে উলে-খ করা হয়েছে যে, আল-াহর ঋণ অধিক পরিশোধ যোগ্য। সুতরাং যদি মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে বিনা পারিশ্রমিকে হজ্জ করার লোক না পাওয়া যায় তাহলে মৃত ব্যক্তির সম্পদ থেকে প্রথমে আল-াহর ঋণ ফরজ হজ্জ আদায় করতে হবে। তারপর অন্যান্য অসিয়ত ও ঋণ পরিশোধ করবে। ইমাম শাফি, আহমদ ও অনেক সালাফগণ এই মতামত ব্যক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম মালেকের মত হলো: যদি মৃত ব্যক্তি অসিয়ত না করে থাকে তাহলে ওয়ারিসদের জন্য মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে মৃত ব্যক্তির মাল দ্বারা বদলি হজ্জ করানো ফরজ নয়। যদি অসিয়ত করে থাকে তাহলে এক তৃতীয়াংশ মাল থেকে বদলি হজ্জ করাবে। আর যদি তার রেখে যাওয়া সম্পদের একতৃতিয়াংশ মাল দ্বারা বদলি হজ্জ করানো না যায় তাহলে বদলি হজ্জ করানো ওয়ারিসদের জন্য ফরজ নয়। তবে আমার বক্তব্য হচ্ছে যদি কারো উপরে হজ্জ ফরজ হওয়ার পর

[৩৪] সহীহ বুখারী ১৮৫২।

আদায় না করে মারা যায় এবং ওয়ারিসদের পক্ষে হজ্জ করানো সম্ভব হয় তাহলে অসিয়ত কর ক বা না কর ক সর্বাবস্থায় বদলি হজ্জ করানো উত্তম।

প্রশ্ন: বদলি হজ্জ করার জন্য প্রথমে নিজে হজ্জ করা শর্ত কি?

উত্তর: হ্যা! যে ব্যক্তি বদলি হজ্জ করতে চায় তাকে প্রথমে নিজের হজ্জ করতে হবে। কেননা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ. قَالَ مَنْ شُبْرُمَةَ قالَ أَخٌ لِى أَوْ قَرِيبٌ لِى. قَالَ حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ لاَ قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ

অর্থ: ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল-াহ (সা:) এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন 'লাব্বাইকা আ'ন শুবর মাতা' অর্থাৎ শুবর মার পক্ষ থেকে লাব্বাইক। রাসূল সা: জিজ্ঞেস করলেন শুবর মা কে? সে বললো আমার এক ভাই অথবা বললেন আমার এক নিকটাত্মীয়। রাসূল সা: বললেন, তুমি নিজে হজ্জ করেছ কি? সে বললো, না! রাসূল সা: বললেন, প্রথমে নিজের হজ্জ করো তারপর শুবর মার পক্ষ থেকে।"[৩৬]
ইমাম শাফেয়ী, আহমদ এবং অধিকাংশ আলেমদের মত এটাই। তবে ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম মালেক (র:) এর মতে বদলি হজ্জ আদায়কারী ব্যক্তি যদি নিজে হজ্জ আদায় নাও করে তবুও সে অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করতে পারবে। তাদের দলিল হলো ইবনে আব্বাস (রা:) এর হাদীস:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ

অর্থ: "ইবনে আব্বাস রা: থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় 'খাসআম' গোত্রের একজন মহিলা রাসূল সা: এর কাছে এসে প্রশ্ন করলো, ইয়া রাসূলুল-াহ সা: 'আমার পিতা একজন বৃদ্ধ মানুষ যার উপর হজ্জ ফরজ হয়েছে। কিন্তু তিনি কোন বাহনে স্থির হয়ে বসতে পারেন না। আমি যদি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করি তাহলে কি তার পক্ষ থেকে আদায় হবে? উত্তরে রাসূলুল-াহ সা: বললেন, হ্যা! আদায় হবে।"[৩৭]

[৩৬] সুনানে আবূ দাউদ ১৮১৩; সুনানে ইবনে মাজাহ ২৯০৩।
[৩৭] সহীহ বুখারী ১৮৫৪।

এই হাদীসের মধ্যে আল-াহর রাসূল (সা:) 'খাসআম' গোত্রের মহিলাকে তার বাবার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করতে বলেছেন এবং সে নিজে হজ্জ আদায় করেছে কিনা সে ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করেননি। যদি প্রথমে নিজের হজ্জ আদায় করা জর–রী হতো তাহলে অবশ্যই তাকে জিজ্ঞেস করতেন। সুতরাং বুঝা গেল নিজে হজ্জ আদায় না করেও বদলি হজ্জ আদায় করতে পারবে। কিন্তু এ হাদীসের উত্তরে বলা যায় যে, সে তো নিজের হজ্জ তখনই আদায় করছিলো। কেননা কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী ঐ মহিলা রাসূলুল-াহ সা: কে বিদায় হজ্জের সময়ই প্রশ্ন করেছিল। অথবা রাসূলুল-াহ সা: পূর্ব থেকেই জানতেন যে সে নিজের হজ্জ আদায় করেছে।

তাই সঠিক মত হলো, বদলি হজ্জ আদায়কারী ব্যক্তি প্রথমে নিজের হজ্জ আদায় করে নিবে। কেননা শরিয়ত সর্বদাই অন্যের তুলনায় নিজের আমলকে প্রাধান্য দেয়ার প্রতি উৎসাহিত করেছে। একারনেই রাসূল সা: সাদাকার ক্ষেত্রে ঘোষনা দিয়েছেন: اِبْدَأْ بِنَفْسِكَ অর্থ: "তুমি তোমাকে দিয়ে শুর– করো।"[৩৮] তাছাড়া এর মাধ্যমে বিতর্কের উর্ধে উঠে সর্বসম্মতিক্রমে যে মতটি বিশুদ্ধ তার উপর আমল করা হয়।

প্রশ্ন: মহিলারা অন্য কোন পুর–ষ বা মহিলার বদলি হজ্জ আদায় করতে পারবে কি?

উত্তর: হ্যা! মহিলাগণ অন্য মহিলাদের বদলি হজ্জ আদায় করতে পারবে। এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। কেননা পূর্বে উলে-খ করা হয়েছে যে, একজন মহিলা রাসূলুল-াহ সা: কে প্রশ্ন করেছিল তার মায়ের পক্ষ থেকে হজ্জ করার ব্যাপারে। রাসূল সা: তাকে অনুমতি দিয়েছিলেন।[৩৯] তাছাড়া মহিলাগণ পুর–ষের পক্ষ থেকেও বদলি হজ্জ করতে পারবে। চার ইমামসহ অধিকাংশ আলেমদের মত এটাই। কেননা পূর্বে উলে-খিত 'খাসআম' গোত্রের মহিলা তার বাবার পক্ষ থেকে হজ্জ করার ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিল। রাসূলুল-াহ সা: তাকেও অনুমতি দিয়েছিলেন।[৪০]

হজ্জের প্রকারভেদ

[৩৮] সহীহ মুসলিম ২৩৬০।
[৩৯] সহীহ বুখারী ১৮৫২।
[৪০] সহীহ বুখারী ১৮৫৪।

প্রশ্ন: হজ্জ কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর: হজ্জ তিন প্রকার। (১) الافراد হজ্জে ইফরাদ (২) القران হজ্জে কিরান (৩) التمتع হজ্জে তামাত্তো।

এই তিন প্রকার হজ্জ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

(১) হজ্জে ইফরাদ: হজ্জের মাস সমূহে (শাওয়াল, যিলক্বদ ও যিলহজ্জের প্রথম অর্ধমাস) মীকাত থেকে শুধুমাত্র হজ্জের নিয়তে ইহরাম বেঁধে হজ্জ সম্পাদন করাকে "হজ্জে ইফরাদ" বলা হয়। এতে কোন ওমরাহ্ পালন করা হয় না। এবং এই প্রকার হজ্জের পর দমে শোকর বা হজ্জের শোকরিয়া স্বরূপ কুরবানী করা ওয়াজীব নয় বরং মুস্তাহাব। হজ্জে ইফরাদ পালনকারী ব্যক্তি ইহরাম বাঁধার সময় মুখে لبيك اللهم بحج (লাব্বাইকা আল-াহুম্মা বিহাজ্জিন) পাঠ করবে।

(২) হজ্জে কিরান: হজ্জের মাসসমূহে মিকাত থেকে ওমরাহ ও হজ্জ উভয়টির জন্য একসাথে ইহরাম বেঁধে উভয়টি আদায় করাকে "হজ্জে কিরান" বলা হয়।

হানাফী ওলামাদের মতে এ ক্ষেত্রে নিয়ম হলো মিকাত থেকে হজ্জ এবং ওমরাহ উভয়টির জন্য ইহরাম বেঁধে প্রথমে ওমরাহ পালন করে ইহরাম না খুলে ঐ ইহরামেই হজ্জ সম্পাদন করা। এ নিয়মে, ওমরার তাওয়াফ এবং সায়ী করার পর হজ্জের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। অর্থাৎ ইহরাম পরিহিত অবস্থায় থাকতে হবে। মাথার চুল মু–ানো বা কাটানো যাবে না; বরং হজ্জের শেষ পর্যায়ে হজ্জের কুরবানীর পর মাথা মু–াতে হবে। অর্থাৎ ওমরাহ আদায়ের পর যদি হজ্জ শুর– হতে আরও ২/১ দিন বা ২/১ সপ্তাহ বাকী থাকে, তবে ঐ ইহরাম অবস্থাতেই থাকতে হবে এবং হজ্জের কুরবানী আদায়ের পর ইহরাম খুলতে হবে।

তবে জুমহুর ওলামায়ে কিরামের মতে "হজ্জে কিরান" পালনকারী ব্যক্তি তাওয়াফ এবং সায়ী একবার করবে। এবং এটাই হজ্জ এবং ওমরাহ উভয়টার জন্য যথেষ্ট হবে। এই প্রকার হজ্জ আদায়কারী ব্যক্তি ইহরাম বাঁধার সময় মুখে لبيك اللهم بحجة و عمرة (লাব্বাইকা আল-াহুম্মা বিহাজ্জাতিন ওয়া ওমরাতিন) উচ্চারণ করবে।

"হজ্জে কিরান" আদায়কারী ব্যক্তির জন্য সকলের ঐক্যমতে দমে শোকর বা হজ্জের শোকরিয়া স্বরূপ কুরবানী করা ওয়াজীব।

(৩) হজ্জে তামাত্তো: হজ্জের মাসসমূহে মীকাত থেকে ওমরাহর জন্য ইহরাম বেঁধে প্রথমে ওমরাহ পালন করে ইহরাম খুলে ফেলা, অতঃপর হজ্জের জন্য পুনরায় ইহরাম বেঁধে হজ্জ সমাপন করাকে "হজ্জে তামাত্তো" বলে। সুতরাং

“হজ্জে তামাত্তো” পালনকারী ব্যক্তি ওমরাহ পালন শেষে ইহরাম খুলে সাধারণ সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করবেন। ৮ই যিলহজ্জ মিনা যাওয়ার প্রাক্কালে হজ্জের নিয়্যতে পুনরায় ইহরাম বাঁধবেন। এই জন্য এই নিয়মে ‘ইহরাম’ দীর্ঘায়িত হয় না। হাজী সাহেবদের জন্য এই নিয়ম সহজ ও অপেক্ষাকৃত আরামদায়ক। তাই অধিকাংশ হাজী সাহেবগণ ‘তামাত্তো হজ্জ’ করে থাকেন। তাছাড়া মহিলাদের জন্য ‘হজ্জে তামাত্তো’ আদায় করাটাই অধিক সমীচীন। তামাত্তো হজ্জে ‘দমে শোকর’ বা হজ্জের শোকরিয়া স্বরূপ কুরবানী করা ওয়াজীব।

মীকাত

প্রশ্ন: মিকাত অর্থ কি? উহা কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর: মিকাত অর্থ “কোন কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময় বা স্থান।” হজ্জের ক্ষেত্রে উভয় অর্থই প্রযোজ্য।

(ক) المواقيت الزمانية (হজ্জের সময়ের মিকাত): শাওয়াল, জিলক্বদ ও জিলহজ্জের প্রথম অর্ধেক মাস। সুতরাং হজ্জের কোন কাজ নির্দিষ্ট সময়ের আগে বা পরে করলে হজ্জ শুদ্ধ হবে না। কেননা আল-াহ তায়াল ইরশাদ করেছেন:

}الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ{ [البقرة: ১৯৭]

অর্থ: “হজ্জের সময় নির্দিষ্ট মাসসমূহ। অতএব এই মাসসমূহে যে নিজের উপর হজ্জ আরোপ করে নিল, তার জন্য হজ্জে অশ-ীল ও পাপ কাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয়।”[৪১]

এআয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, হজ্জের নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। সুতরাং সে সময়ের পূর্বে ইহরাম বাঁধা বৈধ হবে না। বরং তাতে আল-াহর দেয়া সিমানা লংঘন করা হবে। আল-াহর দেয়া সিমান লংঘন করা যাবে না। কেননা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: **{ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [الطلاق: ১]**

অর্থ: “আর যে ব্যক্তি আল-াহর সিমানা লংঘন করলো সে নিজের নফসের প্রতি জুলুম করলো।”[৪২]

[৪১] সুরা বাকারা ১৯৭।
[৪২] সুরা তালাক ১।

(খ) المواقيت المكانية (হজ্জের স্থানের মিকাত): হজ্জের স্থানের মিকাত বলতে ঐ সকল স্থানকে বুঝানো হয়েছে যা শরিয়তের পক্ষ থেকে হজ্জ অথবা ওমরাহ আদায়কারীদের ইহরামের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। যে কেহ হজ্জ অথবা ওমরাহ করার জন্য মক্কা যাওয়ার ইচ্ছা করবে। তাকে অবশ্যই এই মিকাতগুলো ইহরাম অবস্থায় অতিক্রম করতে হবে। ইহরাম ব্যতিত অতিক্রম করলে তাকে ‘দম’ দিতে হবে। এ রকম মিকাত পাঁচটি:

১. ذو الحليفة (যুল হুলাইফা): এটি মদীনাবাসী এবং যারা মদীনা দিয়ে অতিক্রম করতে চায় তাদের মীকাত বা ইহরাম বাঁধার স্থান। যুল হুলাইফা মদীনা থেকে প্রায় ১০ কি:মি: দূরে অবস্থিত। মক্কা থেকে মদীনার দুরত্ব ৪২০ কি:মি:। মক্কা শহর থেকে অন্যান্য মীকাতের তুলনায় এটিই সর্বাধিক দূরে অবস্থিত। এর মাঝে ও মক্কার মাঝে ৪১০ কি:মি: ব্যবধান। বর্তমানে এই জায়গাটির নাম ‘আবারে আলী’ বা ‘বি-রে আলী’।

২. الجحفة (আল জুহফাহ): এটি সিরিয়াবাসী এবং এই পথে মক্কায় আগমনকারীদের মীকাত। ‘আলজুহফাহ’ মক্কা থেকে পশ্চিম উত্তর কোনে অবস্থিত। মক্কা হতে এর দুরত্ব ১৮৭ কি:মি:। এটি বর্তমানে ‘রাবেগ’ নামক স্থানে অবস্থিত। মক্কা থেকে ‘রাবিগে’র দুরত্ব হচ্ছে ২০৪ কি:মি। বর্তমানে ‘আল জুহফাহ’ অঞ্চল অব্যবহৃত হওয়ায় ‘রাবিগ’ নামক স্থানটিই সিরিয়া ও মিসরবাসীদের জন্যে মীকাতে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে আফ্রিকা মহাদেশ, লেবানন, সিরিয়া, মিসর, ফিলিস্তিনের অধিবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান এই ‘রাবেগ’ নামক স্থান।

৩. قرن المنازل (কারনুল মানাযিল): এটি সৌদী আরবের নজদ তথা পূর্বাঞ্চলবাসী ও পূর্ব দিক থেকে আগমনকারী আরব উপসাগরীয় এলাকাবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান। মক্কা থেকে এর দুরত্ব ৯৪ কি:মি:। বর্তমানে এটি ‘ওয়াদি আস সাইল’ নামে প্রসিদ্ধ।

৪. **يلملم** (ইয়ালামলাম): এটি একটি পাহাড় যা মক্কার দক্ষিণে অবস্থিত। এর মাঝে ও মক্কার মাঝে দুরত্ব হল ৫৪ কি:মি:। এটি ভারত উপমহাদেশসহ ইয়ামানবাসীদের মীকাত।

৫. ذات عرق (যাতুইরক্ব): মক্কার পূর্ব-উত্তর কোনে অবস্থিত। এর মাঝে ও মক্কার মাঝে দুরত্ব হলো ৯৪ কি:মি:। এটি ইরাক ইরানবাসী এবং এই পথে মক্কায় প্রবেশকারীদের মীকাত।

মিকাত সম্পর্কে রাসূলুল-াহ সাঃ এর হাদীসঃ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا

অর্থঃ "ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল-াহ (সাঃ) মদীনাবাসিদের জন্য 'যুল হুলাইফা', শামবাসীদের জন্য 'আল জুহফাহ', নজদ্‌বাসীদের জন্য 'করনুল মানাযিল', ইয়ামানবাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম' কে মীকাত হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং এগুলো তাদের এবং যারা তাদের পথে হজ্জ অথবা ওমরাহ আদায় করতে মক্কায় প্রবেশ করবে তাদের জন্য মিকাত হিসাবে গন্য হবে। আর যারা মীকাতের ভিতরে অবস্থান করবে তারা নিজ অবস্থান থেকে ইহরাম বাঁধবে। এমনিভাবে মক্কাবাসীগণ তাদের নিজ গৃহ থেকে ইহরাম বাধবে।"[৪৩]

যাতু-ই'রক্ব নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে কেউ কেউ বলেছেন যে, যখন বছরা ও কুফা বিজয় হয় তখন ওমর ইবনুল খাত্তাব রাঃ এটাকে মীকাত হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। তবে বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী আল-াহর রাসূল সাঃ নিজেই যাতু-ই'রক্বকে ইরাকবাসীদের জন্য মীকাত হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। হাদীসঃ

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَقَّتَ لأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ.

অর্থঃ "আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিতঃ আল-াহর রাসূল সাঃ ইরাকবাসীদের জন্য 'যাতুইরক্ব'কে মীকাত হিসাবে নির্ধারণ করেছেন।"[৪৪]

প্রশ্নঃ যারা উড়োজাহাজে হজ্জ করতে যায় তারা কিভাবে ইহরাম বাধঁবে?

উত্তরঃ যারা উড়োজাহাজে হজ্জ করতে যায় তাদের উচিৎ এয়ারপোর্ট থেকেই ইহরামের কাপড়-চোপড় পরিধানসহ সকল প্রস্তুতি নিয়ে রাখা। যখন উড়োজাহাজ মীকাত বরাবর উপর দিয়ে অতিক্রম করবে। তখন ইহরামের নিয়ত করে নিবে। এবং তালবিয়া পাঠ করবে। আর যদি পূর্বের থেকে কাপড়-চোপড় পরিধানসহ যাবতীয় প্রস্তুতি না নিয়ে থাকে তাহলে উড়োজাহাজে বসেই প্রস্তুত হয়ে মিকাত

[৪৩] সহীহ বুখারী ১৫২৬।

[৪৪] আবু দাউদ ১৭৪১, আলবানী রঃ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

বরাবর উপর দিয়ে যখন উড়োজাহাজ অতিক্রম করবে তখন ইহরামের নিয়ত করবে। কোনক্রমেই উড়োজাহাজ নিচে আবতরণ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না।

হজ্জের কাজসমূহ

প্রশ্নঃ হজ্জের মধ্যে পালনীয় কাজগুলোর কোনটির হুকুম কি?

উত্তরঃ হজ্জের মধ্যে তিন প্রকারের কাজ রয়েছেঃ ফরজ, ওয়াজিব এবং সুন্নত।

প্রশ্নঃ হজ্জের ফরজ সমূহ কি কি?

উত্তরঃ হজ্জের ফরজ হানাফী মাযহাব মতে তিনটিঃ

(১) ইহরাম বাঁধা। অর্থাৎ মনে মনে হজ্জের নিয়ত করে তালবিয়া পাঠ করা।

(২) আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা অর্থাৎ ৯ই জিলহজ্জ দ্বিপ্রহরে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর থেকে ১০ই জিলহজ্জ সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত যে কোন সময় এক মুহূর্তের জন্য হলেও আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা।

(৩) 'তাওয়াফে যিয়ারত' করা অর্থাৎ ১০ই জিলহজ্জ ভোর থেকে ১২ই জিলহজ্জের সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বাইতুল-াহ্ শরীফের তাওয়াফ করা।

হানাফীগণ ব্যতিত অন্যান্য ইমামদের মতে সাফা-মারওয়া সায়ী করা হজ্জের চতুর্থ ফরজ।

প্রশ্নঃ হজ্জের ওয়াজিব সমূহ কি কি?

উত্তরঃ হজ্জের ওয়াজিব সমূহ নিম্নে বর্নণা করা হলোঃ

(১) নির্দিষ্ট স্থান (মিকাত) থেকে ইহরাম বাঁধা।

(২) হানাফী মাযহাব মতে সায়ী অর্থাৎ সাফা ও মারওয়ার মধ্যে দৌড়ানো।

(৩) সাফা পাহাড় থেকে সায়ী শুরু করা।

(৪) তাওয়াফের পর সাফা-মারওয়া সায়ী করা (যদি পূর্বে সায়ী না করে থাকে)।

(৫) আরাফাতের ময়দানে প্রবেশের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করা।

(৬) মুযদালিফায় উকূফ বা অবস্থান করা।

(৭) মাগরিব এবং ইশার সালাত মুযদালিফায় এসে একত্রে ইশার সময় পড়া।

(৮) ১০ তারিখ শুধু জামরাতুল আকাবায় এবং ১১ ও ১২ তারিখে তিন জামরায় রামি বা কংকর নিক্ষেপ করা।

(৯) জামরাতুল আকাবার 'রামি' বা কংকর নিক্ষেপ ১০ তারিখে হলক অর্থাৎ মস্তক মু ানোর আগে করা।
(১০) কুরবানীর পর মাথা মু ানো কিংবা চুল ছাটা।
(১১) কিরান এবং তামাত্তু হজ্জ পালনকারীর জন্য কুরবানী করা।
(১২) তাওয়াফ 'হাতীমে কাবা'র বাহির দিয়ে করা।
(১৩) তাওয়াফের সময় কাবাকে বাম দিকে রেখে ডান দিক থেকে করা।
(১৪) কঠিন অসুবিধা না থাকলে পায়ে হেঁটে তাওয়াফ করা।
(১৫) পবিত্রতার সঙ্গে তাওয়াফ করা।
(১৬) তাওয়াফের পর দু'রাকআত সালাত পড়া।
(১৭) তাওয়াফের সময় সতর ঢাকা থাকা।
(১৮) কংকর নিক্ষেপ করা ও কুরবানী করা, মাথা ম ানো এবং তাওয়াফ করার মধ্যে তারতীব বা ধারাবহিকতা বজায় রাখা। (এটা হানাফী মাযহাব মতে, অন্যান্য ইমামদের মতে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজীব না। বরং সুন্নত।)
(১৯) মীকাতের বাইরে অবস্থানকারীদের বিদায়ী তাওয়াফ করা।
(২০) ইহরামের নিষিদ্ধ কাজগুলো না করা।

প্রশ্ন: হজ্জের সুন্নত সমূহ কি কি?
উত্তর: হজ্জের সুন্নত সমূহ নিম্নে উলে- খ করা হলো:
(১) মীকাতের বাইরে থেকে আগমনকারীদের জন্য 'তাওয়াফে কুদূম' করা।
(২) তাওয়াফ হাজরে আসওয়াদ থেকে শুর করা।
(৩) যে তাওয়াফের পর সায়ী আছে সেই তাওয়াফে রমল[৪৫] এবং ইযতিবা করা[৪৬]।
(৪) সাফা এবং মারওয়ার মধ্যে যে দু'টো সবুজ স্তম্ভ আছে তার মধ্যবর্তী স্থান দৌড়ে অতিক্রম করা; তবে তা মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য নয়।
(৫) মক্কায় ৭ তারিখে, আরাফাতে ৯ তারিখে এবং মিনায় ১১ তারিখে ইমামের খুতবা শোনা।
(৬) ৮ তারিখ ফজরের পর মক্কা শরীফ থেকে রওয়ানা হওয়া, যেন মিনায় পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়া যায়।
(৭) ৮ তারিখ দিবাগত রাত মিনায় কাটানো।

[৪৫] প্রথম তিন চক্করে হাত দুলিয়ে দুলিয়ে বীরদর্পে চলা।
[৪৬] চাঁদরের মাঝখান ডান বগলের নিচে রেখে দুই পার্শ্ব বাম কাধের উপর রেখে দেওয়া। এবং ডান কাঁধ খালি করে দেওয়া হবে।

(৮) সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফায় রওয়ানা হওয়া।
(৯) উকুফে আরাফার জন্য গোসল করা।
(১০) আরাফাত থেকে ফেরার সময় মুযদালিফায় রাতে অবস্থান করা।
(১১) সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পূর্বে মুযদালিফা থেকে মিনায় রওয়ানা হওয়া।
(১২) ১০ এবং ১১ তারিখের রাত মিনায় কাটানো এবং ১৩ তারিখেও মিনায় থাকলে ১২ তারিখ দিবাগত রাতও সেখানে কাটানো। (হানাফী মাযহাব মতে সুন্নত অন্যান্য ইমামদের মতে ওয়াজিব)।

প্রশ্ন: কি কি কারণে হজ্জ ভেঙ্গে যায় এবং কি কি কারনে কাফফারা ওয়াজিব হয়?
উত্তর: হজ্জ ভঙ্গ হওয়ার কারণসমূহ এবং যেসব কারণে কাফফারা ওয়াজিব হয় তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

* কেউ যদি হজ্জের কোন রোকন ত্যাগ করে তবে তাকে পুনরায় হজ্জ করতে হবে।

* কংকর ছোঁড়া পরিত্যাগ করলে 'দম' (কাফফার) দিতে হবে।

* হজ্জের যে কাজগুলো তারতীব বা ক্রমানুসারে করতে হয় সেগুলো তারতীব অনুসারে না করলে হানাফী মাযহাব মতে 'দম' দিতে হবে। অন্যান্য ইমামদের মতে আগে-পরে করলে কোন অসুবিধা নেই।

* সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফাতের ময়দান থেকে বের হলে 'দম' দিতে হবে। কোন ওযর ব্যতীত মুযদালিফায় উকুফ বা অবস্থান না করলে 'দম' দিতে হবে।

* নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে মাথা মু ালে বা চুল ছাঁটলে 'দম' দিতে হবে।

* ওযর ব্যতীত সুগন্ধি ব্যবহার করলে 'দম' দিতে হবে। ওযরবশতঃ ব্যবহার করলে 'দম' অর্থাৎ পশু কুরবানী বা তিনটি সাওম বা ৬ জন মিসকীনকে সাদাকায়ে ফিতরের পরিমাণ গম বা তার মূল্য প্রদান- এই তিনটির যে কোন একটি করতে হবে।

* সেলাই করা কাপড় যদি একদিন একরাত অর্থাৎ পুরো একদিন পরিধানে থাকে তবে 'দম' আর এর কম পরিমান সময় হলে সাআ'দাকায়ে ফিতরের পরিমান গম বা তার মূল্য আদায় করতে হবে।

* স্বীয় স্ত্রীকে যৌন কামনাসহ চুমু খেলে কিংবা আলিঙ্গন করলে 'দম' দিতে হবে।

* পায়ের মধ্যবর্তী উঁচু হাড় ঢেকে যায় এমন জুতো এক রাতসহ একদিন পরিধান করে থাকলে 'দম' আর এর কম পরিধানে থাকলে সাদাকাহ দিতে হবে।

প্রশ্ন: হজ্জের সময় আমরা কোনদিন কি কাজ করবো?
উত্তর: নিচে ছকের মাধ্যমে দিন ওয়ারী হজ্জের কার্যাবলী পেশ করা হলো:

দিন,তারিখ	**করনীয়**
১ম দিন ৮ই জিলহজ্জ:	ইহরাম বাঁধা অবস্থায় মিনায় আসুন। আজকের জোহর, আছর, মাগরিব, এশা এবং ৯ই জিলহজ্জের ফজরের সালাত মিনায় আদায় করা এবং রাত্রি মিনায় অবস্থান করা সুন্নত।
২য় দিন ৯ই জিলহজ্জ:	আরাফার ময়দানে যেতে হবে এবং সেখানে পোঁছে জোহর এবং আছরের সালাত 'কসর' অর্থাৎ সফরের সালাত ও 'জমা' অর্থাৎ একত্রে পড়তে হবে। আরাফাতে উকুফ (অবস্থানই) হলো হজ্জের মূল রোকন এবং ফরজ। আরাফাতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত থাকতে হবে। এটা ওয়াজিব। সূর্যাস্তের আগে চলে গেলে দম দিতে হবে। আরাফাতের ময়দানে ইবাদত, যিকির, আযকার, দোয়া, সালাত, তেলাওয়াত এবং তালবিয়া পাঠ ইত্যাদিতে নিমগ্ন থাকবে। সূর্যাস্তের পর মুযদালিফার উদ্দেশ্যে আরাফার ময়দান ত্যাগ করবে এবং রাতে মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশার সালাত ইশার ওয়াক্তে একত্রে পড়বে এবং সমস্ত রাত্রি অবস্থান করবে। মিনায় জামারাতে নিক্ষেপ করার জন্য ৭০টি কংকর এখান থেকে সংগ্রহ

	করবে। মুযদালিফায় ফজরের সালাত পড়ে মিনার উদ্দেশ্যে রওনা হবে।
৩য় দিন ১০ই জিলহজ্জ:	মিনায় পোঁছার পর এই দিনে প্রধানত চারটি কাজ করতে হবে। এই দিনের প্রথম কাজ হলো দুপুরের পূর্বে জামারাতুল আকাবায়ে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করা (ওয়াজিব)। এই দিনের দ্বিতীয় কাজ হলো কিরান ও তামাত্তো হজ্জ পালনকারীদের জন্য কুরবানী করা (ওয়াজিব)। এই দিনের তৃতীয় কাজ হলো মাথা মুন্ডানো বা সমস্ত চুলের এক-চতুর্থাংশ ছেঁটে ফেলা (ওয়াজিব)। এই দিনের চতুর্থ কাজ হলো, মক্কা শরীফে গিয়ে তাওয়াফে যিয়ারত করা (ফরজ)। ১০ তারিখে তাওয়াফে যিয়ারত সম্ভব না হলে ১১ বা ১২ তারিখের সূর্যাস্ত পর্যন্ত করা যাবে।
৪র্থ দিন ১১ ই জিলহজ্জ:	দুপুরের পর প্রথমে জামারাতুস সুগরা (ছোট শয়তান), তারপর জামারাতুল উস্তা (মধ্যম শয়তান) এবং তারপর জামারাতুল আকাবায় (বড় শয়তান)-কে ৭টি করে মোট ২১ টি কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। (ওয়াজিব)।
৫ম দিন ১২ই জিলহজ্জ:	ঠিক গতকালের মত আজ দুপুরের পর তিনটি জামারাতে ২১টি কংকর নিক্ষেপ করতে হবে (ওয়াজিব) এবং যদি এখন পর্যন্তও কুরবানী ও তাওয়াফে যিয়ারত না করে থাকে তবে আজ করে নিবে। যদি ইচ্ছা করে তবে আজ সূর্যাস্তের

	পূর্বে মিনা ত্যাগ করে মক্কা শরীফে ফিরে আসতে পারবে।
৬ষ্ঠ দিন ১৩ই জিলহজ্জ:	যদি মিনার সীমানাতেই সুবহে সাদেক হয়ে যায়, তবে ১৩ তারিখে মিনায় অবস্থান করে দুপুরের পর তিন জামারাতে কংকর নিক্ষেপ করে (ওয়াজিব) মক্কায় ফিরে আসবে।
তাওয়াফে বিদা: মক্কা থেকে বিদায়ের পূর্বে বিদায়ী তাওয়াফ (ওয়াজিব) করতে হবে। এতে ইজতেবা, রমল, সায়ী নেই। মাকামে ইব্রাহিমে দু'রাকাত সালাত পড়ে মুলতাজাম, কাবার দরজায় অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে নিজের জন্য, পিতামাতা, নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য, সমস্ত মুসলিম নরনারীর জন্য দু'আ করবে।	

উপরোক্ত কাজগুলোর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

ইহরাম

ইহরাম বলা হয় শরিয়ত নির্ধারিত মীকাত (নির্দিষ্ট স্থান) থেকে হজ্জ অথবা ওমরার নিয়ত করে ইহরামের কাপড় পরিধান করাকে। তবে তামাত্তু হজ্জ পালনকারী এবং মক্কায় অবস্থানকারী ব্যক্তি নিজ গৃহ থেকে ইহরাম বাঁধবে।

প্রশ্ন: ইহরাম বাঁধার সময় কি কি কাজ করা সুন্নত ?

উত্তর: ইহরাম বাঁধার সুন্নত সমূহ নিম্নে উলে-খ করা হলো:

১. ইহরাম বাঁধার সময় গোসল করা। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عن زيد بن ثابت انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل

অর্থ: "যায়েদ ইবনে সাবেত (রা:) থেকে বর্ণিত 'তিনি নাবী (সা:) কে দেখলেন যে তিনি ইহরামের উদ্দেশ্যে (সিলাইকৃত) কাপর-চোপর খুলে ফেললেন এবং গোসল করলেন।"[৪৭]

মহিলারা হায়েজ-নেফাস অবস্থায় থাকলেও গোসল করে তারপর ইহরাম বাঁধবে। যেমন জাবের রা: এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِى بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ « اغْتَسِلِى وَاسْتَثْفِرِى بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِى

অর্থ: "আমরা 'যুল—লাইফা' পৌঁছলাম। তখন আসমা বিনতে উমাইস (রা:) তার ছেলে মুহাম্মদ বিন আবূ বকর (রা:) কে প্রসব করলেন। এরপর তিনি আল-াহর রাসূল (সা:) কে জিজ্ঞেস করে পাঠালেন যে, এখন আমি কি করবো? আল-াহর রাসূল (সা:) উত্তর দিলেন যে, 'তুমি গোসল কর এবং একটি কাপড় দিয়ে তা (নেফাসের রক্ত) মুছে ফেল এবং ইহরাম বাঁধ।"[৪৮]

২. ইহরাম বাঁধার পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করা। মহিলারাও ইচ্ছা করলে সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে। তবে ইহরাম বাঁধার পর কোন হাজীসাহেব সকল ইমামের ঐক্যমতে সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে না। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ

অর্থ: "আল-াহর রাসূল (সা:) এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, ইহরাম বাঁধার সময় আমি রাসূলুল-াহ (সা:) এর গায়ে সুগন্ধি মেখে দিতাম এবং (মাথা মু—ানোর পর) বায়তুল-াহ তাওয়াফের পূর্বে ইহরাম খোলার সময়ও সুগন্ধি মেখে দিতাম।"[৪৯]

মহিলারা সুগন্ধি ব্যবহার করার দলীল:

عن عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رضى الله عنها حَدَّثَتْهَا قَالَتْ كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى مَكَّةَ فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ الْمُطَيَّبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا فَيَرَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلاَ يَنْهَاهَا.

---

[৪৭] সুনানে তিরমিজি ৭৩১।

[৪৮] সহীহ মুসলিম ৩০০৯।

[৪৯] সহীহ বুখারী ১৫৩৯।

অর্থ: "উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা:) বলেন, আমরা রাসূলুল-াহ (সা:) এর সাথে (মদীনা হতে) মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হতাম। ইহরামের সময় আমরা এক ধরনের (অল্প) সুগন্ধিযুক্ত দ্রব্য ব্যবহার করতাম। আমাদের কেউ ঋতুবতী হয়ে পড়লে সে এই সুগন্ধি বস্তু তার চেহারায় ব্যবহার করতো। নবী (সা:) তা দেখা সত্বেও তাকে এরূপ করতে নিষেধ করতেন না।"[৫০]

৩. পুর" ষ ব্যক্তি একটি সাদা চাঁদর ও সাদা লুঙ্গি পরিধান করবে। দলীল:

الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ (ابو داود-ترمذي-نسائي)

অর্থ: " তোমরা সাদা কাপড় পরিধান করা কেননা সাদা কাপড়ই উত্তম কাপড়। আর তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের সাদা কাপড় পরিধান করাও।"[৫১]

৪. মহিলারা তাদের ইচ্ছামত যে কোন কাপড় পরিধান করতে পারবে। নির্দিষ্ট কোন রং এর কাপড় পরিধান করা জর" রি না। দলীল:

وَلَبِسَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَةَ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ

অর্থ: "আয়শা (রা:) ইহরাম অবস্থায় কুসুমী রঙ্গে রঞ্জিত কাপড় পড়েছেন।" [৫২]

৫. ফরজ অথবা নফল সালাতের পর ইহরামের নিয়ত করা। অর্থাৎ ইহরামের সময় ফরজ সালাতের ওয়াক্ত হয়ে থাকলে ফরজ সালাত আদায় করে ইহরামের নিয়ত করা অন্যথায় দু' রাকাআত নফল সালাত আদায় করে ইহরামের নিয়তকরা।

ফরজ সালাতের পর ইহরাম বাঁধার দলীল:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى الظُّهْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِبَدَنَةٍ فَأَشْعَرَهَا مِنْ صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَيْمَنِ ثُمَّ سَلَتَ عَنْهَا الدَّمَ وَقَلَّدَهَا بِنَعْلَيْنِ ثُمَّ أُتِىَ بِرَاحِلَتِهِ فَلَمَّا قَعَدَ عَلَيْهَا وَاسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ.

---

[৫০] সুনানে আবূ দাউদ ১৮৩২।

[৫১] সুনানে আবূ দাউদ ৩৮৮০।

[৫২] সহীহ বুখারী ২য় খন্ড ১৩৭ নং পৃষ্ঠা।

অর্থ: "ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল-াহ (সা:) জোহরের সালাত 'যুল " লাইফায়' আদায় করলেন এরপর একটি উট নিয়ে আসতে বললেন এবং উটের উঁচু কুঁজের ডান পাশে 'ইশআর' অর্থাৎ একটু চামড়া কেঁটে দিলেন এবং তার পিঠে রক্ত মেখে দিলেন ও গলায় চামড়ার দুটো সে" ল ঝুলিয়ে দিলেন (কুরবানীর জন্য নির্ধারিত পশু বুঝানোর জন্য)। এরপর তার বাহন নিয়ে আসা হলো। যখন তিনি তাতে বসলেন এবং বাহনটি তাকে নিয়ে 'বাইদা' নামক স্থানে চলতে লাগল তখন তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে 'তালবিয়া' পাঠ করলেন। "[৫৩]

নফল সালাতের পর ইহরাম বাঁধার দলীল:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّيْلَةَ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي وَهُوَ بِالْعَقِيقِ أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ

অর্থ: "ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রাসূলুল-াহ (সা:) 'আল-আকীক' নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন এমন সময় বললেন যে, আমার কাছে আজ রাতে আমার রবের পক্ষ হতে একজন আগন্তুক এলো এবং বললো যে, আপনি এই বরকতময় মাঠে সালাত আদায় কর" ন এবং বলুন 'ওমরাতুন ফি হাজ্জাতিন' অর্থাৎ হজ্জের মধ্যে ওমরাহ (অর্থাৎ হজ্জের নিয়ত কর" ন)।"[৫৪]

৬. ইহরামের পর তালবিয়ার পূর্বে হামদ (আল-াহর প্রশংসা যেমন الحمد لله আলহামদুলিল-াহি), তাসবীহ (আল-াহর পবিত্রতা যেমন سبحان الله সুবহানাল-াহ), তাকবীর (আল-াহর মহত্ব যেমন الله اكبر আল-াহু আকবার) পাঠ করা।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمِدَ اللَّهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ

অর্থ: "আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল-াহ (সা:) এর সাথে মদীনায় চার রাকাআত যোহরের সালাত আদায় করলাম এবং 'যূল" লাইফা' নামক স্থানে দুই রাকাআত আসরের সালাত আদায় করলাম।

---

[৫৩] সুনানে আবু দাউদ ১৮৫৪; মুসনাদে আহমদ ২২৯৬।

[৫৪] সহীহ বুখারী ২৩৩৭।

এরপর সেখানেই রাত্রিযাপন করলেন। রাসূলুল-াহ (সা:) সকালে উঠলেন এবং তাঁর বাহনে আরোহন করলেন। এরপর যখন বাহন 'বাইদা' নামক স্থানে চলতে লাগল তখন তিনি 'আল-াহ (সুব:) প্রশংসা করলেন', 'তার পবিত্রতা বর্ণনা করলেন' এবং 'আল-াহু আকবার' পাঠ করলেন এরপর হজ্জ এবং ওমরার জন্য ইহরাম বাঁধলেন।" [৫৫]

৭. কেবলার দিকে ফিরে তালবিয়া পাঠ করা। তালবিয়ার শব্দ হচ্ছে

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ

উচ্চারণ: "লাব্বাইক আল-াহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা, ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মূলক, লা শারীকা লাকা।"

অর্থ: "আমি হাজির, হে আল-াহ! আমি হাজির। আমি হাজির, তোমার কোন শরীক নাই। আমি হাজির, নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নিয়ামত তোমারই, আর সকল ক্ষমতাও তোমার, তোমার কোন শরীক নাই।"[৫৬]

কেবলার দিকে ফিরে 'তালবিয়া' পাঠ করার দলীল:

عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا صَلَّى بِالْغَدَاةِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ ثُمَّ رَكِبَ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَائِمًا ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَبْلُغَ الْمَحْرَمَ ثُمَّ يُمْسِكُ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذَا طُوًى بَاتَ بِهِ حَتَّى يُصْبِحَ فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ اغْتَسَلَ وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ

অর্থ: "নাফি (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনে ওমর (রা:) 'যুল-হুলাইফায়' ফজরের সালাত শেষ করে সাওয়ারী প্রস্তুত করার নির্দেশ দিতেন, সাওয়ারী প্রস্তুত হলে তাতে আরোহন করতেন। সাওয়ারী তাঁকে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলে তিনি সোজা কিবলামূখী হয়ে হারাম শরীফের সীমারেখায় পৌছা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতে থাকতেন। এরপর বিরতি দিয়ে 'যূ-তুয়া' নামক স্থানে পৌছে ভোর পর্যন্ত রাত যাপন করতেন এবং তারপর ফজরের সালাত আদায় করে গোসল করতেন এবং বলতেন, রাসূলুল-াহ (সা:) এরূপই করে ছিলেন।"[৫৭]

উলে-খ্য যে, ইহরামের পর থেকে আকাবায় শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করার পূর্ব পর্যন্ত সর্বদা যথা সম্ভব বেশী বেশী তালবিয়া পাঠ করা মুস্তাহাব। গাড়িতে

[৫৫] সহীহ বুখারী ১৫৫১।
[৫৬] সহীহ মুসলিম ২৮৬৮।
[৫৭] সহীহ বুখারী ১৫৫৩।

আরোহণ করা অবস্থায়, হাঁটা-চলা করা অবস্থায়, উপড়ে চড়তে এবং নিচে নামার সময় অর্থাৎ সর্বাস্থায় বেশী বেশী তালবিয়া পাঠ করবে।

৮. উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা। দলীল:

عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ مُرْ أَصْحَابَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ

অর্থ: "খাল-াদ ইবনে সায়েব (রা:) সুত্রে বর্নিত রাসূলুল-াহ (সা:) ইরশাদ করেছেন, আমার নিকট জিবরাইর (আ:) আসলেন। এবং আমাকে বললেন, হে মুহাম্মদ! আপনি আপনার সাহাবীদেরকে আদেশ করুন যাতে তারা উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করে।"[৫৮] অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

وَعَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ – رضى الله عنهما – قَال قَدِمْنَا مَعَ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– وَنَحْنُ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا.

অর্থ: "আবূ সাঈদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল-াহ (সা:) এর সাথে ছিলাম এমতাবস্থায় যে আমরা উচ্চস্বরে হজ্জের তালবিয়া পাঠ করছিলাম।"[৫৯]

উলে-খ্য যে, মহিলারা উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করবে কিনা এ ব্যাপারে 'ওলামাদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। তবে এ ব্যাপারে আল-ামা ইবনে তাইমিয়্যা (র:) যেই মতামত পেশ করেছেন তা মোটামুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ তা হলো "মহিলারা সর্বোচ্চ এতটুকু উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করতে পারবে যাতে তার একেবারে নিকটবর্তী সঙ্গীনি শুনতে পারে, এর বেশী উচ্চ আওয়াজে তালবিয়া পাঠ করা জায়েজ হবে না।

হায়েজ এবং নেফাসে আক্রান্ত মহিলারা কাবা শরীফের তাওয়াফ ব্যতিত অন্য সকল আমল করবে এবং 'তালবিয়া'ও পাঠ করবে।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ

প্রশ্ন: ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ কি কি?

উত্তর: ইহরাম অবস্থায় শরিয়ত যে সমস্ত কাজ নিষেধ করেছে তা দুই প্রকার।

[৫৮] সুনানে নাসায়ী ২৭৫২।
[৫৯] সহীহ মুসলিম ৩০৮৩।

(১) এমন কাজ যা হজ্জ ভেঙ্গে দেয়। (২) এমন কাজ যা হজ্জ ভেঙ্গে দেয় না তবে নিষিদ্ধ।

প্রথম প্রকারের কাজ:
স্ত্রী সহবাস করা। কোন ব্যক্তি যদি ইহরাম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করে তাহলে তার হজ্জ ভেঙ্গে যাবে। তবে সে হজ্জের বাকি কাজগুলো যথারীতি আদায় করে যাবে এবং পরবর্তী বছর কাজা করবে।

দ্বিতীয় প্রকারের কাজ:
১. পুরুষ ব্যক্তি সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা। যেমন: জামা, পায়জামা, পাগড়ী, টুপি, জুব্বা, মোজা ইত্যাদি। তবে যদি কোন ব্যক্তি সেলাই বিহীন কাপড় সংগ্রহ করতে না পারে তাহলে সে সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করতে পারবে। 'ফিদইয়া'[৬০] ওয়াজিব হবে না। অনুরূপ যদি কোন ব্যক্তি জুতা না পায় তাহলে সে মোজা পায়ের টাখনু পর্যন্ত কেটে ব্যবহার করতে পারবে।
২. ইহরাম অবস্থায় পুরুষ ব্যক্তি মাথা ঢাকা। যেমন: টুপি বা পাগড়ী পরিধান করা।
৩. ইহরাম অবস্থায় মহিলারা মুখে নেকাব পরিধান করা। তবে পর্দার জন্য মাথার উপর থেকে কাপড় ঝুলিয়ে দিতে পারবে। মুখে জড়াবে না।
৪. ইহরাম অবস্থায় পুরুষ বা মহিলা সুগন্ধি ব্যবহার করা।
৫. ইহরামের নিয়ত করার পর মাথার বা শরীরের কোন স্থানের চুল বা পশম মুন্ডানো বা কেঁটে ফেলা। যদি ইচ্ছাকৃত বা ভূলে মুন্ডিয়ে ফেলে বা কেঁটে ফেলে তাহলে 'ফিদইয়া" দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, যদি অসুস্থতা বা অন্য কোন ওজরের কারণে মাথার চুল মুন্ডিয়ে ফেলতে হয় তাহলে মুন্ডিয়ে ফেলা জায়েজ হবে তবে 'ফিদইয়া' দিতে হবে। যদি মাথা চুলকানোর কারণে চুল পরে যায় তাহলে কোন সমস্যা নেই।
৬. ইহরাম অবস্থায় নখ কাঁটা।
৭. স্ত্রীকে যৌন কামনাসহ চুমু খেলে কিংবা আলিঙ্গন করলে ফিদইয়া দিতে হবে।
৮. হানাফীগণ ব্যতিত অন্যান্য ইমামদের মতে ইহরাম অবস্থায় বিবাহের পয়গাম দেয়া বা বিবাহ করা নিষিদ্ধ।
৯. কোন গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়া বা ঝগড়া-বিবাদ করা।

[৬০] সাদাকায়ে ফিতির পরিমান গম বা তার মূল্য। অর্থাৎ আড়াই কেজি গম বা গমের মূল্য।

১০. ইচ্ছাকৃত বন্য পশুপাখি শিকার করা বা কাউকে শিকার করতে যে কোনভাবে সাহায্য করা।
যদি কোন ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে কোন বন্য পশুপাখি হত্যা করে ফেলে তাহলে কাফফারা দিতে হবে। কাফফারা তিনভাবে দেওয়া যায়:
প্রথমত: যেই বন্যপশু হত্যা করেছে যদি তার সাদৃশ কোন গৃহপালিত পশু পাওয়া যায় তাহলে তা কুরবানী করবে এবং মিসকীনদের মাঝে তা বণ্টন করে দিবে। এখানে দামের দিক থেকে সমান হওয়া শর্ত নয় বরং আকার আকৃতির দিক থেকে সমান হওয়া শর্ত।
দ্বিতীয়ত: যেই বন্যপশু হত্যা করেছে তার সাদৃশ গৃহপালিত কোন পশুর দাম নির্ধারণ করে তার মাধ্যমে খাদ্য ক্রয় করে মিসকীনদের মাঝে বণ্টন করে দিবে। প্রত্যেক মিসকীনদেরকে এক মুদ (৫১০ গ্রাম) পরিমান দিবে।
তৃতীয়ত: পশু যবাই বা মিসকীনদের খাবার খাওয়ানোর পরিবর্তে সিয়ামের (রোজা) মাধ্যমেও কাফফারা আদায় করা যাবে। এই ক্ষেত্রে প্রতি মুদ (৫১০ গ্রাম) খাদ্যের বিনিময়ে একটি করে সাওম রাখবে। অর্থাৎ যেই বন্য পশু হত্যা করেছে তার সাদৃশ কোন হালাল পশুর দাম নির্ধারণ করবে। এরপর এই দামের মাধ্যমে কতটুকু পরিমান খাদ্য ক্রয় করা যায় তা নির্ধারণ করবে। যেই পরিমান খাদ্য ক্রয় করা যায় পুরা পরিমানকে গ্রামের হিসাব ধরে ৫১০ দিয়ে ভাগ দিবে এবং ভাগফল যা হবে সেই কয়েকটি সাওম (রোজা) রাখবে।

কিছু মাসআলা

*যদি কয়েক ব্যক্তি মিলে কোন বন্য পশু হত্যা করে তাহলে কাফফারার নিয়ম হচ্ছে, পশু যবাই বা মিসকীনদের খাবার খাওয়ানোর ক্ষেত্রে সকলে মিলেই একটি কাফফারা আদায় করবে। তবে যদি সাওমের মাধ্যমে কাফফারা আদায় করে তাহলে প্রত্যেককে আলাদা আলাদাভাবে কাফফারা পূর্ণ করতে হবে।
*একাধিক পশু হত্যা করলে প্রত্যেকটির জন্য আলাদা আলাদাভাবে কাফফারা আদায় করতে হবে।
*পালিত উট, গরু, ছাগল, মুরগি ইত্যাদি হত্যা করলে কাফফারা দিতে হবে না। যদি এই প্রাণিগুলো পালিত না হয় বরং বনে ঘুরে-ফিরে খায় তাহলে তা হত্যা করলে কাফফারা দিতে হবে।
*সমুদ্রের প্রাণি হত্যা করলে কাফফারা দিতে হবে না।
*যেই সমস্ত পশুপাখির গোশত খাওয়া হারাম সেগুলো হত্যা করলে কাফফারা দিতে হবে না।

*শরিয়ত যেই সমস্ত পশুপাখি হত্যা করতে আদেশ করেছে বা যেগুলো মানুষকে কষ্ট দেয় সেগুলো হত্যা করলে কাফফারা দিতে হবে না। যেমনঃ কাক, চিল, বিচ্ছু, ইদুর, এমন কুকুর যে মানুষ দেখলেই কামড়ায়। মোটকথা, যে সমস্ত জিনিষ মানুষের শরীরের জন্য বা মানুষের সম্পদের জন্য ক্ষতিকর সেগুলোকে হত্যা করা বৈধ হবে।

*ইহরাম অবস্থায় থাকাকালীন কোন মানুষ যদি তার উপর আক্রমন করে এবং হত্যা করা ব্যতিত তার থেকে বাঁচার কোন সুযোগ না থাকে তাহলে হত্যা করা জায়েজ হবে।

* ইহরাম পালনকরী ব্যক্তির নিজের বা নিজের সহযোগীতায় শিকার করা পশুর গোশত খাওয়া জায়েজ হবে না। তবে ইহরাম অবস্থায় নেই এমন ব্যক্তির শিকার করা পশুর গোশত খাওয়া জায়েজ হবে।

ইহরাম অবস্থায় যেই সমস্ত কাজ করা জায়েজ

প্রশ্নঃ ইহরাম অবস্থায় কি কি কাজ করা জায়েজ?

উত্তরঃ ইহরাম অবস্থায় যেই সমস্ত কাজ করা জায়েজ সেগুলো নিম্নে উলে- খ করা হলোঃ

১. গোসল করা (কোন কারণ ছাড়াই)। চাদর এবং লুঙ্গি পরিবর্তণ করা।

২. মাথা আঁচড়ানো। যদিও চুল পড়ে যাওয়ার আশংকা হয়।

৩. মাথা বা শরীর চুলকানো।

৪. শিঙ্গা লাগনো। যদিও শিঙ্গা লাগানোর স্থানের চুল কামিয়ে ফেলার দরকার পরে।

৫. কোন প্রয়োজনের কারণে সুগন্ধি গ্রহণ করা বা ধোঁয়া নাকে নেয়া।

৬. নখ ভেঙ্গে গেলে তা ফেলে দেয়া।

৭. পুর ষরা কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে রাখা।

৮. মহিলারা মাথার উপর থেকে কাপড় ছেড়ে দিয়ে মুখ ঢেকে রাখা।

৯. মহিলারা যেই রঙ্গের ইচ্ছা সেই রঙ্গের কাপড় পরিধান করতে পারবে।

১০. মহিলারা পায়জামা এবং মোজা পরিধান করা।

১১. মহিলারা ইচ্ছা করলে অলংকার পরিধান করতে পারবে।

১২. মহিলারা ইচ্ছা করলে মেহেদী বা অন্য কোন জিনিষ দ্বারা খেজাব করতে পারবে।

১৩. প্রয়োজনের কারণে চোখে সুরমা লাগাতে পারবে। বিনা প্রয়োজনে নয়।

১৪. তাবু, গাড়ি বা অন্য কোন কিছুর আড়ালে অবস্থান নিয়ে রোদ থেকে বাঁচা।

১৫. ইহরামের লুঙ্গি বাধাঁর জন্য বেল্ট ব্যবহার করা। আংটি, ঘড়ি বা চশমা ব্যবহার করা।

মক্কায় প্রবেশ করা

প্রশ্নঃ মক্কায় প্রবেশ করার সুন্নত সমূহ কি কি?

উত্তরঃ মক্কায় প্রবেশ করার সুন্নত সমূহ নিম্ন উলে- খ করা হলোঃ

১. রাত্রি বেলায় 'যি-তুয়া' নামক স্থানে অবস্থান করা, মক্কায় প্রবেশের জন্য গোসল করা এবং পরদিন দিনের আলোতে মক্কায় প্রবেশ করা।

২. 'ছানিয়্যায়ে উলইয়া' নামক স্থান দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করা।

৩. মসজিদে হারামে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা। এবং এই দু'আ করাঃ

২. মসজিদে হারামে প্রবেশের দু'আঃ

أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

উচ্চারণঃ "আউযুবিল-াহিল আজিম ওয়া বিওজহিহিল কারীম ওয়া সুলতানিহিল কাদীম মিনাশ শাইতানির রাজিম"।

অর্থঃ "আমি মহান আল-াহ (সুবঃ), তার সম্মানিত সত্ত্বা এবং আদি কাল থেকে স্থায়ী তার রাজত্বের নিকট বিতারিত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থণা করছি।"[৬১]

৪. যখন কাবা শরীফ দেখবে তখন হাত তুলবে এবং দোয়া করবে।

৫. বাইতুল-াহ শরীফ তাওয়াফ করবে। এই তাওয়াফকে 'তাওয়াফে কুদুম' বলা হয়।

তাওয়াফ

প্রশ্নঃ তাওয়াফ অর্থ কি? এবং তা কত প্রকার ও কি কি?

উত্তরঃ তাওয়াফের শাব্দিক অর্থ হলো, কোন জিনিষের চারপাশে ঘুরা। ইসলামী পরিভাষায় তাওয়াফ বলা হয়, বাইতুল-ার চারপাশে নিদিষ্ট নিয়মে ঘুরা।

তাওয়াফ তিন প্রকারঃ

১. তাওয়াফে কুদূমঃ তাকে 'তাওয়াফে উর দ' বা 'তাওয়াফে তাহিয়্যা' ও বলা হয়। জুমহুর ওলামাদের মতে মক্কার বাহির থেকে যারা আগমন করবে তাদের জন্য তাওয়াফে কুদূম করা মুস্তাহাব। এটাই হানাফী আলেমদের বক্তব্য।

---

[৬১] আবু দাউদ ৪৬৬।

২. তাওয়াফে ইফাদাহ: একে ‘তাওয়াফে যিয়ারত’ও বলে। সমস্ত ওলামাদের মতে এটি হজ্জের রোকন। এবং তাওয়াফে ইফাদাহ করা ব্যতিত হজ্জ সহীহ হবে না।

হানাফী আলেমদের মতে **১০**ই জিলহজ্জ থেকে **১৩**ই জিলহজ্জ পর্যন্ত ‘তাওয়াফে যিয়ারত’ করা যাবে। তবে উত্তম হচ্ছে কুরবানীর দিন অর্থাৎ **১০**ই জিলহজ্জে আদায় করা।

‘তাওয়াফে ইফাদাহ’ এর জন্য শর্ত হচ্ছে তা ‘আরাফার ময়দানে’ অবস্থান করার পরে পালন করতে হবে। যদি কোন ব্যক্তি আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করার পূর্বে তাওফায়ে ইফাদাহ করে ফেলে তাহলে তাকে পুনুরায় তাওয়াফে ইফাদাহ করতে হবে।

যদি ‘তাওয়াফে ইফাদাহ’ আদায় করার পূর্বেই মহিলা ঋতুবতী হয়ে যায় তাহলে এই ক্ষেত্রে দুই সুরত:

ক) যদি মহিলা মক্কায় অবস্থান করতে সক্ষম হয় তাহলে হায়েজ থেকে পবিত্র হয়ে তাওয়াফ করে বাড়িতে ফিরবে।

খ) আর যদি মক্কায় অবস্থান করতে সক্ষম না হয়। যেমনঃ মক্কা থেকে ফিরবার সময় নির্দিষ্ট থাকে। তাহলে এই ক্ষেত্রে হায়েজ অবস্থায়ই তাওয়াফ করে ফেলবে। উলে- খ্য যে, যদি মহিলা ঔষধের মাধ্যমে হজ্জের দিনগুলোতে হায়েজের রক্ত বন্ধ করতে পারে তাহলে বন্ধ করে হজ্জ করবে। যদি তার স্বাস্থের কোন ক্ষতি না হয়।

৩. তাওয়াফে বিদা’: তাকে ‘বিদায়ী তাওয়াফ’ও বলা হয়। এটা ওয়াজিব। তবে ইমাম মালেক (র) এর নিকটে সুন্নত। মহিলারা যদি ‘তাওয়াফে ইফাদাহ’ করার পর তাওয়াফে বিদা’ করার পূর্বে হায়েজে আক্রান্ত হয়ে যায় তাহলে তার জন্য অপেক্ষা করা জর“রী নয় বরং সে তার বাড়িতে ফিরে যাবে। এবং কাফফারাও দেয়া লাগবে না।

হানাফী এবং হাম্বলী মাযহাব মতে মক্কায় অবস্থানকারী ব্যক্তিদের জন্য ‘তাওয়াফে বিদা’ আদায় করা জর“রী না।

তাওয়াফের শর্তসমূহ

প্রশ্নঃ তাওয়াফের শর্ত সমূহ কি কি?

উত্তরঃ তাওয়াফের শর্ত সমূহ হচ্ছে নিম্নরূপঃ

১. পবিত্র অবস্থায় তাওয়াফ করা।

২. সতর ঢেকে রাখা। হানফী আলেমগণের মতে সতর খোলা থাকলে তার তাওয়াফ হয়ে যাবে কাফফারা দিতে হবে। তবে অধিকাংশ ওলামদের মতে তাওয়াফই বাতিল হয়ে যাবে।

৩. কাবা এবং হাতিমে কাবা উভয়টার বাহির দিয়ে তাওয়াফ করা। যদি হাতিমে কাবা বাদ দিয়ে শুধু মাত্র ঘরটুকু তাওয়াফ করা হয় তাহলে হানাফী ব্যতিত অন্যান্য ওলামাদের মতে তার হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে। তবে হানাফীদের মতে হজ্জ বাতিল হবে না তবে তাকে পুনরায় তাওয়াফ করতে হবে যদি মক্কায় থাকে। আর যদি মক্কা থেকে বাড়িতে ফিরে আসে তাহলে সে মক্কার উদ্দেশ্যে একটি পশু ‘দম’ হিসাবে পাঠিয়ে দিবে।

৪. হাজরে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ শুর“ করবে এবং হাজরে আসওয়াদে এসে তাওয়াফ শেষ করবে।

৫. কাবা শরীফকে হাতের বাম পার্শ্বে রেখে তাওয়াফ শুর“ করা।

৬. সাত তাওয়াফ পূর্ণ করা। যদি কোন ব্যক্তি কতবার তাওয়াফ করেছে এই নিয়ে সন্দেহে পরে যায় তাহলে তার ধারণায় যেটা কম সেটাই ধর্তব্য হবে। যেমনঃ সে সন্দেহে পরলো যে পাঁচবার তাওয়াফ করেছে না ছয়বার, তাহলে পাঁচবারই ধর্তব্য হবে।

৭. সাত তাওয়াফ ধারাবাহিকভাবে আদায় করা এবং মাঝখানে বিলম্ব না করা। হানাফী এবং শাফেয়ীদের মতে এটা সুন্নত। মালেকী এবং হাম্বলী মাযহাব মতে শর্ত।

তাওয়াফের সুন্নতসমূহ

প্রশ্নঃ তাওয়াফের সুন্নত সমূহ কি কি?

উত্তরঃ তাওয়াফের সুন্নত সমূহ নিম্নে উলে- খ করা হলোঃ

১. তাওয়াফের পূর্বে অজু করা।

২. পুর“ষের জন্য ‘ইজতিবা’ করা। অর্থাৎ ইহরামের চাদরের মধ্যখান ডান বগলের নিচে রেখে দুইপ্রান্ত বাম কাঁধের উপর জড়িয়ে দেয়া এবং ডান কাঁধ খালি রাখা। উলে- খ্য যে, ‘ইজতিব’া শুধুমাত্র তাওয়াফের সুন্নত অন্য সময় সে কাঁধ ঢেকে রাখবে।

৩. প্রথম তিন চক্করে রমল করা অর্থাৎ বীরদর্পে হাত দুলিয়ে দ্র“ত পায়ে চলা। যদি প্রথম তিন চক্করে ভিড় বা অন্য কোন কারণে রমল করতে না পারে তাহলে পরবর্তীতে তা কাজা করতে হবে না। মহিলারা রমল করবে না।

৪. সম্ভব হলে প্রতি চক্করের মধ্যে হাজরে আসওয়াদকে হাত দ্বারা স্পর্শ করবে এবং চুমু খাবে। যদি হাত দ্বারা স্পর্শ করতে সক্ষম হয় কিন্তু চুমু খেতে সক্ষম না হয় তাহলে হাত দ্বারা স্পর্শ করবে। যদি হাত দ্বারা স্পর্শ করতেও অক্ষম হয় তাহলে হাত দ্বারা ইশারা করবে এবং তাকবীর (আল-াহু আকবার) বলবে।

৫. সম্ভব হলে 'রুকনে ইয়ামানী' হাতে স্পর্শ করা। উলে-খ্য যে, হাজরে আসওয়াদ এবং 'রুকনে ইয়ামানী' হাতে স্পর্শ করতে এবং চুমু খেতে গিয়ে মহিলারা পুরুষদের সাথে ভিড় করবে না। শামী দুই রুকুন (হাজরে আসওয়াদ এর দিকের দুই রুকুন) স্পর্শ করবে না।

৬. ইয়ামানী দুই রুকুনের মাঝে দু'আ করা। এই ক্ষেত্রে তার নিজের ইচ্ছামত যে কোন বৈধ দু'আ সে করতে পারবে। ইচ্ছা করলে আস্তে আস্তে কুরআন তেলাওয়াতও করতে পারবে। তবে রাসূল (সা:) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নিম্মোক্ত দু'আ পড়ে চক্কর শেষ করতেন:

[رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ] [البقرة: ২০১]

উচ্চারণ: "রব্বানা আতিনা ফিদ দুনইয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাঁও ওয়া কিনা আযাবান নার।"

অর্থ: "হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়া এবং আখিরাতে কল্যাণ দান করুন। এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন।"[৬২]

৭. তাওয়াফের পর নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করতে করতে মাকামে ইব্রাহিমের সামনে দাড়ানো।

[وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًى] [البقرة: ১২৫]

উচ্চারণ: "অত্তাখিজূ মিম মাকামি ইবরাহীমা মুসাল-া।"

অর্থ: "তোমরা 'মাকামে ইবরাহীমকে' সালাতের স্থান হিসাবে গ্রহণ করা।"[৬৩]

৮. সম্ভব হলে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দুই রাকাআত সালাত পড়া। প্রথম রাকাআতে 'সুরা কাফিরূন' এবং দ্বিতীয় রাকাআতে 'সুরা ইখলাস' পাঠ করা। তাওয়াফের পরের দু'রাকাআত সালাত নিষিদ্ধ সময়ে আদায় করাও জায়েজ।

উলে-খ্য যে, তাওয়াফ করতে গিয়ে কোন মুসলি-র সামনে দিয়ে অতিক্রম করা প্রয়োজনের কারণে জায়েজ।

৯. তাওয়াফের পর দু'রাকাআত সালাত আদায় করে যমযমের পানি পান করা এবং মাথায় ঢালা।

[৬২] সুনানে আবু দাউদ ১৮৯৪।

[৬৩] সুরা বাকারা ১২৫।

১০. 'ইলতিযাম' অর্থাৎ হজরে আসওয়াদ এবং কাবা শরীফের দরজার মাঝের স্থানে বুক, গাল এবং হাত লাগিয়ে দু'হাত দুদিকে ছড়িয়ে দেয়া। 'ইলতিযাম' করা মুস্তাহাব।

উলে-খ্য যে, তাওয়াফের সময় কথা বলা জায়েজ। তবে না বলাটাই উত্তম। হ্যা, যদি ভাল কথা হয় তাহলে বলাটাই উত্তম। যেমন: সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ করা, মূর্খ ব্যক্তিদের জ্ঞান দান করা, ফতাওয়ার উত্তর দেয়া।

যদি কোন ব্যক্তি সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও পায়ে না হেঁটে কোন বাহনে চড়ে তাওয়াফ করে তাহলে হানাফী, হাম্বলী এবং মালেকীগণের মতে কাফফারা আদায় করতে হবে। আর শাফেয়ীগণের মতে কাফফারা আদায় করবে না।

তাওয়াফ করতে করতে যদি সালাতের ইকামত দিয়ে সালাত আরাম্ভ হয়ে যায় তাহলেও তাওয়াফ বন্ধ করে সালাত আদায় করবে। সালাতের পর বাকী তাওয়াফ গুলো পূর্ণ করবে। যেই চক্করের মাঝে সালাত আরাম্ভ হয়েছিল সেই চক্করটি আবার পূনরায় শুরু থেকে করতে হবেনা। বরং যেখান থেকে তাওয়াফ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সেখান থেকে আবার চালূ করে তাওয়াফ পূর্ন করবেন।

সাফা-মারওয়া পাহাড়ে সায়ী করা

প্রশ্ন: সায়ী অর্থ কি? শরীয়তে এর বিধান কি?

উত্তর: সায়ী অর্থ দৌড়ানো, চেষ্টা করা। সাফা মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে ইবাদতের নিয়তে সাতবার দৌড়ানোকে শরিয়তের পরিভাষায় 'সায়ী' বলে। সায়ী শুরু করবে সাফা থেকে এবং শেষ করবে মারওয়াতে এসে। বর্তমানে এই স্থানটুকুর কিছু অংশ সবুজ পিলার দিয়ে চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে। সেখানে এসে দ্রুত দৌড়াতে হবে। হানাফীদের মতে সায়ী করা ওয়াজীব। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি সায়ী করতে না পারে তাহলে সে কাফফারা দিয়ে দিবে। তার হজ্জ বাতিল হবে না। কিন্তু অন্য ইমামদের মতে সায়ী করা ফরজ। না করলে হজ্জ হবে না।

যদি কোন মহিলা তাওয়াফ করার পর ঋতুবতী হয়ে যায় তাহলে তার জন্য পবিত্রতা অর্জন করা ব্যতিতই সায়ী করা জায়েজ আছে।

প্রশ্ন: সায়ীর শর্ত সমূহ কি কি?

উত্তর: সায়ীর শর্ত সমূহ হচ্ছে:

১. প্রথমে তাওয়াফ করা তারপর সায়ী করা।

২. সাতবার সায়ী করা। সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত একবার, মারওয়া থেকে সাফা পর্যন্ত একবার। এভাবে সাতবার পূর্ণ করা।

৩. সাফা থেকে শুর করা মারওয়াতে শেষ করা।
৪. নির্দিষ্ট রাস্তায় সায়ী করা। তা হচ্ছে সাফ ও মারওয়ার মাঝবর্তী লম্বা রাস্তা।

প্রশ্ন: সায়ীর সুন্নত সমূহ কি কি?
উত্তর: সায়ীর সুন্নত সমূহ হচ্ছে:
১. পবিত্র অবস্থায় সায়ী করা।
২. সায়ী করতে বের হওয়ার পূর্বে রুকুনে ইয়ামনী স্পর্শ করা।
৩. নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করতে করতে সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী হবে:

[إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ] [البقرة: ١٥٨]

উচ্চারণ: "ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওতা মিন শাআইরিল-াহ।"
অর্থ: "নিশ্চয়ই সাফা-মারওয়া পাহাড় আল-াহর নিদর্শণাবলীর মধ্য থেকে অন্যতম নিদর্শণ।"[৬৪]
এরপর বলবে:

أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ

উচ্চারণ: "আবদাউ বিমা বাদাআল-াহু বিহী"।
অর্থ: " আল-াহ (সুব:) যেভাবে শুর করেছেন আমিও সেভাবে শুর করছি।"
সাফা পাহাড়ে উঠে কিবলার দিকে মুখ করে এই দু'আ পাঠ করবে:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ

উচ্চারণ: " লা ইলাহা ইল-াহু অহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুলি- শাই ইন কাদীর। লা ইলাহা ইল-াহু অহদাহু আনজাযা ওয়া'দাহু ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহু"।
অর্থ: " আল-াহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি একক। তার কোন শরীক নেই। সকল ক্ষমতা তার, এবং সকল প্রশংসার উপযুক্ত তিনিই, তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল-াহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তিনি তার ওয়াদা পূর্ণ করেন, তাঁর বান্দাদের সাহায্য করেন এবং একাই সম্মিলিত দুশমন বাহিনীকে পরাজিত করেন।"
এই দু'আ তিনবার পাঠ করবে।
৫. পুরষের জন্য সবুজ চিহ্ন দেয়া স্থানটুকু দ্রত দৌড়ানো।

[৬৪] সুরা বাকারা ১৫৮।

৬. সাফা মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে দু'আ করা। যেমন ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি নিম্নোক্ত দু'আটি করতেন:

رَب اغفر وارحم وانك انت الأعز الأكرم

উচ্চারণ: "রাব্বিগ ফির ওয়ার হাম, ওয়া ইন্নাকা আন্তাল আআ'জ্জুল আকরাম।"
অর্থ: "হে আমার রব! আপনি আমাকে ক্ষমা করন এবং আমার উপর দয়া করন। নিশ্চয়ই আপনি মহা ক্ষমতাবান এবং সম্মানিত।"
৭. মারওয়াতে ঐসমস্ত আমলই করবে যা সাফাতে করেছিল।

সায়ীর পর 'হজ্জে তামাত্তু' আদায়কারী ব্যক্তি মাথা মুিয়ে অথবা মাথার চুল ছেঁটে ওমরাহ থেকে হালাল হবে। উত্তম হলো এখন মাথা ছেঁটে নিবে পরবর্তীতে কুরবানীর দিন হজ্জের সব কাজ শেষে একবারে মাথা মুাবে। মাথা মুানো বা ছাঁটার পর জিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখ পর্যন্ত তার জন্য সব কাজ হালাল হবে এমনকি স্ত্রী সহবাসও ।

মিনায় রওয়ানা

প্রশ্ন: মিনায় বের হওয়ার সুন্নত সমূহ কি কি?
উত্তর মিনায় বের হওয়ার সুন্নত সমূহ হচ্ছে:
১. জিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখে মক্কায় বসবাসকারী হাজীগণ ও হজ্জে তামাত্তু আদায়কারী ব্যক্তিগণ তাদের বাসা থেকেই ইহরাম এর নিয়ত করে ইহরামের কাপড় পরিধান করবে।
২. সকল হাজিগণ (তামাত্তু, ইফরাদ, কিরান পালনকারী) ৮ তরিখের জোহরের সালাতের পূর্বেই মিনায় এসে একত্রিত হবে।
৩. ৮ তারিখের জোহর, আছর, মাগরীব ও এশা মিনাতেই আদায় করবে।
৪. রাতে মিনাতেই অবস্থান করবে এবং ৯ তারিখের (আরাফাতের দিন) ফজরের সালাত এখানেই আদায় করবে এবং সূর্য উদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।
৫. সূর্য উদয়ের পর আরাফাতের ময়দানের দিকে রওয়ানা করবে। এইক্ষেত্রে হেঁটে যাওয়ার তুলনায় বাহনে যাওয়াই উত্তম।
৬. মিনা থেকে আরাফাতের ময়দানে যাওয়ার পথে বেশি বেশি তালবিয়া এবং আল-াহু আকবার পাঠ করা।

উকূফে আরাফাহ্ বা আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা

প্রশ্নঃ 'উকূফ' শব্দের অর্থ কি? শরীয়তে উহার বিধান কি? কত সময় পর্যন্ত আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করতে হবে?

উত্তরঃ 'উকূফে আরাফাত' বলতে হাজিদের নির্ধারিত বিধান মেনে, নির্দিষ্ট শর্তাবলীর সাথে আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত হওয়াকে বুঝানো হয়।

আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা হজ্জের একটি রুকন। কোন ব্যক্তি তা আদায় করতে না পারলে তার হজ্জই বাতিল হয়ে যাবে।

আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের সময়ঃ ৯ই জিলহজ্জ সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর অর্থাৎ যোহরের সালাতের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর থেকে আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের সময় শুরু হয়। এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত তা স্থায়ী হয়। কোন ব্যক্তি যদি সূর্যাস্তের পূর্বেই আরাফাতের ময়দান ত্যাগ করে তাহলে তার জন্য উচিত হলো পুনরায় আরাফাতের ময়দানে ফিরে আসা এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করা। যদি এমনটি না করে তাহলে তার উপর 'দম' ওয়াজিব হবে।

প্রশ্নঃ আরাফাতের ময়দানে অবস্থান এবং সেখান থেকে প্রস্থানের সুন্নত এবং আদব সমূহ কি কি?

উত্তরঃ আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের সুন্নত এবং আদব সমূহ হচ্ছেঃ

১. আরাফাতের ময়দানে যে কোন স্থানে অবস্থান করতে পারবে। তবে উত্তম হলো জাবালে রহমতের (আরাফাতের ময়দানের মাঝে অবস্থিত একটি পাহাড়) নিচে ছড়ানো ছিটানো পাথরময় জমিতে বসা।

২. কিবলার দিকে ফিরে, হাত উঠিয়ে দু'আ করা। আরাফাতের ময়দানের সর্বোত্তম দু'আ হলোঃ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كَلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

উচ্চারণ: "লা ইলাহা ইল-াল-াহু অহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুলি- শাই ইন কাদীর।"

অর্থ: " আল-াহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি একক। তার কোন শরীক নেই। সকল ক্ষমতা তার, এবং সকল প্রশংসার উপযুক্ত তিনিই, তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

২. তালবিয়া পাঠ করা। আরাফাতের ময়দানে হাজীদের উচিত বেশি বেশি যিকির, দু'আ ও কুরআন তেলাওয়াত করা।

৩. হাজীদের জন্য আরাফাতের ময়দানে সাওম (রোজা) না রাখা উত্তম।

৪. সূর্যাস্তের পর ধীরস্থিরভাবে আরাফাতের ময়দান থেকে প্রস্থান করা।

৫. তালবিয়া পাঠ করতে করতে মুযদালিফার দিকে গমণ করা।

মুযদালিফায় অবস্থান করা

প্রশ্নঃ মুযদালিফার ময়দানে কখন অবস্থান করতে হবে? এবং এর হুকুম কি?

উত্তরঃ মিনা ও আরাফাতের মাঝখানে অবস্থিত ময়দানের নাম মুযদালিফা। এখানে ১০ই জিলহজ্জ (৯ই জিলহজ্জ দিবাগত রাত) অতিবাহিত করা হাজীদের জন্য ওয়াজিব।

মুযদালিফায় পৌঁছে ইশার ওয়াক্ত হলে এক আযান ও দুই ইকামতে প্রথমে মাগরিবের ফরজ তারপর ইশার ফরজ সালাত আদায় করবে। এরপর মাগরীব ও ইশার সুন্নত সালাত আদায় করবে। (প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর 'তাকবীরে তাশরীক' পড়তে হবে)।

মাগরীব ও ইশার সালাতের পর সুবহে সাদেক পর্যন্ত মুযদালিফায় অবস্থান করা সুন্নত।

উকূফে মুযদালিফা বা মুযদালিফার ময়দানে অবস্থান করা ওয়াজিব। মুযদালিফার ময়দানে অবস্থান না করলে 'দম' দিতে হবে। তবে মহিলারা বা রুগ্ন ব্যক্তিগণ অবস্থান করতে অক্ষম হলে তাদের জন্য 'দম' দিতে হবে না। সুন্নত হলো, সুবহে সাদিক থেকে খুব ফর্সা হওয়া পর্যন্ত উকূফ দীর্ঘ করা। তাই সুবহে সাদিক হলেই আযান দিয়ে সুন্নত পড়ে জামাতের সাথে ফজরের সালাত আদায় করে নিবে। সূর্যোদয়ের ৪/৫ মিনিট পূর্বে উকূফ শেষ করবেন এবং মিনা অভিমুখে রওয়ানা হবেন।

মুস্তাহাব হলো মুযদালিফা হতে কংকর নিয়ে যাওয়া। তাই এখান থেকে মটরদানা বা খেজুর বিচির মত ৭০টি কংকর উঠিয়ে নিন।

এরপর মিনায় আপনাকে কমপক্ষে তিনদিন অবস্থান করতে হবে। তাওয়াফে যিয়ারতের জন্য মাত্র একবার মক্কা-মুকাররমায় যেতে হবে।

প্রশ্ন: মুযদালিফায় অবস্থান এবং সেখান থেকে প্রস্থানের সুন্নত সমূহ কি কি?
উত্তর: মুযদালিফায় অবস্থান এবং সেখান থেকে প্রস্থানের সুন্নত সমূহ হচ্ছে:
১. ইশার ওয়াক্তে মাগরীব এবং ইশার সালাত একত্রে আদায় করা।
২. এক আযান এবং দুই ইকামতের সাথে মাগরীব ও ইশার সালাত আদায় করা।
৩. দুই সালাতের মাঝে নফল সালাত না পড়া।
৪. সুবহে সাদিক উদিত হওয়া পর্যন্ত ঘুমানো। এবং সারা রাত জেগে সালাত না পড়া।
৫. ফজরের সালাত শুর ওয়াক্তে আযান ও ইকামতের সাথে আদায় করা।
৬. ফজরের সালাতের পর ফর্সা হওয়া পর্যন্ত পশ্চিম দিকে ফিরে অবস্থান করা। এ সময় দু'আ, আল-াহর প্রশংসা, তালবিয়া এবং আল-াহু আকবার বেশি বেশি পড়া।
৭. সূর্যোদয়ের পর ধীরস্থিরভাবে মুযদালিফা ত্যাগ করা।
৮. যদি কোন বাহনে আরোহন না করে তাহলে 'বতনে মুহাস্সার' নামক স্থান অতিক্রম করার সময় সামান্য দ্রত চলা।
৯. আরাফাতের ময়দানে যেই রাস্তা দিয়ে এসেছিল সেই রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তা দিয়ে মিনায় যাওয়া।

'জামারাতুল আকাবায়' শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করা

প্রশ্ন: 'জামারাতুল আকাবায়' শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করার কুম কি?
উত্তর: ১০ই জিলহজ্জের প্রথম কাজ হলো জামারাতুল আকাবায় গিয়ে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। যদি কোন ব্যক্তি তা না করে তাহলে তাকে 'দম' দিতে হবে।

প্রশ্ন: 'জামারা কয়টি? কোন তারিখে, কখন, কোন কোন জামারায় পাথর নিক্ষেপ করতে হবে?
উত্তর: 'জামারা' তিনটি।
১) জামারাতুল আকাবায়ে কুবরা: তা হচ্ছে মক্কার দিকে প্রথম জামারাহ। এটা মিনার ভিতরে বাম পাশে অবস্থিত।
২) জামারাতুল উসতা: এটি প্রথমটির পার্শ্বে মুযদালিফার দিকে অবস্থিত।
৩) জামারাতুস সুগরা: এটি 'মসজিদে খিফে' র নিকটে মিনায় অবস্থিত।

যেই পাথর একবার নিক্ষেপ করা হয়েছে তা দ্বিতীয়বার নিক্ষেপ করা যাবে। পাথরগুলো ধোঁয়া ব্যতিতই নিক্ষেপ করবে। আরোহিত অবস্থায়ও পাথর নিক্ষেপ করা জায়েজ হবে।

পাথর নিক্ষেপের সময়
চার দিন পাথর নিক্ষেপ করবে। কুরবানীর দিন (১০ই জিলহজ্জ) এবং তার পরের তিন দিন। এই দিনগুলোকে "আইয়্যামে তাশরীক" বলে।
প্রথম দিন অর্থাৎ কুরবানীর দিন শুধুমাত্র "জামারাতুল আকাবায়ে কুবরা" তে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করবে। বাকি তিনদিন তিন জামারতেই পাথর নিক্ষেপ করবে। প্রথমে "জামারাতুছ ছুগরাতে" এরপর "জামারাতুল উসতা" তে এরপর "জামারাতুল কুবরা" তে সাতটি করে পাথর নিক্ষেপ করবে। এভাবে দৈনিক ২১ টি করে তিনদিনে ৬৩টি। আর প্রথম দিন ৭টি মোট ৭০টি পাথর নিক্ষেপ করবে। যদি কোন ব্যক্তি ১৩ তারিখে মিনায় না থাকে তাকতে চায় তাহলে তার জন্য এটা জায়েজ হবে। এই ক্ষেত্রে তার মোট ৪৯টি পাথর নিক্ষেপ করা হবে।

কুরবানীর দিনে জামারাতুল আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করবে
কুরবানীর দিন জামারাতুল আকাবায় সাতটি পাথর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব।
নিক্ষেপ করার স্থান: মুস্তাহাব হলো "বাতনে ওয়াদী" নামক স্থান থেকে এমনভাবে পাথর নিক্ষেপ করা যাতে করে মক্কা তার বামে থাকে আর মিনা তার ডানে থাকে। যদি এমনভাবে সম্ভব না হয় তাহলে সেভাবে সম্ভব সেভাবে নিক্ষেপ করবে।
নিক্ষেপের সময়: কুরবানীর দিন (১০ই জিলহজ্জ) সূর্যোদয়ের পর থেকে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়া পর্যন্ত নিক্ষেপ করতে পারবে। সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অসুস্থ এবং মা'জুর ব্যক্তিরা পাথর নিক্ষেপ করতে পারবে। তবে ১১ এবং ১২ই জিলহজ্জ সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর থেকে পাথর মারার সময় শুর হবে এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত পাথর নিক্ষেপ করতে পারবে। উলে-খ্য যে, মহিলা, অসুস্থ এবং মা'জুর ব্যক্তিরা সূর্যাস্তের পরও পাথর নিক্ষেপ করতে পারবে।
এই সময়ের মধ্যে নিক্ষেপ করতে না পারলে 'দম' দিতে হবে।
মহিলা এবং অন্যান্যদের মধ্যে যারা দুর্বল তাদের জন্য ১০ তারিখের সূর্যাস্তে পূর্বেই (৯ তারিখের দিবাগত রাতে) পাথর নিক্ষেপ করা জায়েজ আছে।

প্রশ্ন: কংকর নিক্ষেপের সুন্নতসমূহ কি কি?

উত্তর: কংকর নিক্ষেপের সুন্নত সমূহ হচ্ছে:
১. কংকর নিক্ষেপ করার আগ মুহুর্তে তালবিয়া পাঠ করা বন্ধ করে দেয়া।
২. প্রত্যেক বার কংকর নিক্ষেপ করার সময় তাকবীর পাঠ করা।
৩. "বাতনে ওয়াদী" নামক স্থান থেকে কংকর নিক্ষেপ করবে।
৪. 'জামারাতুল আকাবায়ে' কংকর নিক্ষেপের পর সেখানে অবস্থান না করে ফিরে আসা।

প্রশ্ন: কুরবানীর দিন মিনায় কয়টি কাজ?
উত্তর: কুরবানীর দিন মিনায় পৌঁছানোর পর চারটি কাজ। নিম্নে তার আলোচনা করা হলো:
১. জামারাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা। (যার আলোচনা পূর্বে করা হলো)।
২. হাদী বা কুরবানীর পশু যবাই করা।
৩. মাথা মু‍ানো।
৪. 'তাওয়াফে ইফাদাহ' করা (যার আলোচানা পূর্বে করা হয়েছে)।
এই চারটি কাজের মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা ওয়াজিব। এটা হানাফীদের মতে। তবে অন্যান্য ওলামাদের মতে সুন্নত।

হজ্জের শোকরিয়া স্বরূপ কুরবানী করা
দমে শোকর করা ওয়াজিব। নিজ হাতে বা করো মাধ্যমে কুরবানী করানো যাবে তবে যবাই হয়েছে কিনা নিশ্চিত হতে হবে। কিরান ও তামাত্তো আদায়কারীদের জন্য এটা ওয়াজিব। আর ইফরাদ পালনকারীদের জন্য এটা মুস্তাহাব। মিনায় কুরবানী করতে না পারলে মক্কায় গিয়েও কুরবানী করতে পারবে।

মাথা মু‍ানো
১০ই জিলহজ্জের তৃতীয় কাজ হলো মাথা মু‍ানো বা মাথার চুল কর্তন করা। তবে মাথা মু‍িয়ে ফেলাটাই উত্তম কেননা আল-াহর রাসূলূল-াহ (সা:) মাথা মু‍নকারীদের জন্য তিনবার দু'আ করেছেন।
যদি কোন ব্যক্তি মাথা না মু‍িয়ে চুল কর্তণ করতে চায় তাহলে তাকে পুরা মাথার চুল আঙ্গুলের গিরা পরিমান বা তারচেয়ে বেশি কাটতে হবে। যাদের চুল এক গিরার চেয়ে কম তাদের মু‍নই করতে হবে। না হলে হালাল হবে না।

কয়েক বার ওমরাহ করার কারণে মাথায় চুল না থাকলে মাথায় ক্ষুর ঘুরাতে হবে। এতেই মু‍ানের দায়িত্ব পালন হয়ে যাবে।
মাথা মু‍ানো বা কর্তণ কুরবানীর পর করতে হবে। নতুবা দম দিতে হবে।
মহিলাগণ তাদের চুলের আগা থেকে আঙ্গুলের গিরা পরিমান চুল কেটে ফেলবে যখন তাদের কুরবানীর নিশ্চিত খবর তাদের কাছে আসবে।
কুরবানী করার পর ইহরামের কাপড় খুলে স্বাভাবিক কাপড় পরিধান করতে পারবে। তবে স্বামী-স্ত্রী সহবাস করতে পারবে না। 'তাওয়াফে যিয়ারতের' পর জায়েজ হবে।
কংকর নিক্ষেপ, দমে শোকর এবং মাথা মু‍ানো এই তিনটির মাঝে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব। নতুবা দম দিতে হবে।

তাওয়াফে যিয়ারত
এই দিনের আরেকটি কাজ হলো তাওয়াফে যিয়ারত করা। একে 'তাওয়াফে ইফাদাহ'ও বলা হয়। এটা হজ্জের শেষ র‍কন। মিনায় উপরোক্ত কাজগুলো সেরে হাজীগণ মক্কায় গিয়ে 'তাওয়াফে যিয়ারত' করবে। এই তাওয়াফে ইজতিবা নেই। ১০ তারিখে সম্ভব না হলে ১১ বা ১২ তারিখের সূর্যাস্তের পূর্বে অবশ্যই এ তাওয়াফ করতে হবে। যারা মক্কা থেকে ৮ই জিলহজ্জ আসার পূর্বে একটি নফল তাওয়াফের সাথে সায়ী করেননি 'তাওয়াফে যিয়ারতে' তাদের অবশ্যই সায়ী করতে হবে।

প্রশ্ন: হজ্জের চতুর্থ দিন (১১ই জিলহজ্জ) কি কাজ?
উত্তর: ১১ই জিলহজ্জ কাজগুলো হচ্ছে: মিনায় রাত্রি যাপন এবং কংকর নিক্ষেপ করা। প্রথমে "জামারাতুছ ছূগরা'তে এরপর "জামারাতুল উসতা"তে এরপর "জামারাতুল কুবরা"তে সাতটি করে পাথর নিক্ষেপ করবে। এভাবে মোট ২১টি পাথর নিক্ষেপ করবে। প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় "আল-াহু আকবার" বলবে। সুস্থ ব্যক্তিদের জন্য দুপুরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সুন্নত সময়। এরপর মাকরূহ হবে। তবে দূর্বল, মাজুর এবং মহিলাদের জন্য সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত মাকরূহ হবে না। দুপুরের আগে কংকর নিক্ষেপ করলে সহী হবে না। যদি কোন ব্যক্তি দুপুরের আগে নিক্ষেপ করে তাহলে দুপুরের পর আবার নিক্ষেপ করতে হবে। অন্যথায় দম দিতে হবে।

জামারাতুছ ছুগরা (ছোট) এবং উসতা (মধ্যম) কংকর নিক্ষেপ করার পর কিবলামুখি হয়ে দীর্ঘ দু'আ করা উত্তম। কিন্তু 'জামারাতুল আকাবায়ে' কংকর নিক্ষেপ করার পর কোন দু'আ নেই।

প্রশ্ন: হজ্জের পঞ্চম দিন (১২ই জিলহজ্জ) কি কাজ?

উত্তর: ১২ই জিলহজ্জেও ১১ই জিলহজ্জের মত কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। অনেকেই তাড়াতাড়ি মক্কায় ফিরে যাওয়ার জন্য সূর্য ঢলার পূর্বেই কংকর নিক্ষেপ করে ফেলে। এটা জায়েজ নেই। তাদের পুনরায় আবার নিক্ষেপ করতে হবে নতুবা দম দিতে হবে।

১২ই জিলহজ্জ কংকর নিক্ষেপ করার পর ইচ্ছা করলে মক্কায় ফিরে যাওয়া জায়েজ। তবে ১৩ই জিলহজ্জ কংকর নিক্ষেপ করে যাওয়াই উত্তম। ১২ই জিলহজ্জ মক্কায় ফিরে যেতে চাইলে সূর্যাস্তের পূর্বেই মিনা থেকে বের হয়ে যাবে। সূর্যাস্তের পর বের হওয়া মাকরূহ। তবে দূর্বল এবং মহিলাগণ সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত বের হতে পারবে। যদি মিনার সিমানাতেই সুবহে সাদেক হয়ে যায় তাহলে ১৩ তারিখেও তিন জামারায় কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। না করলে দম দিতে হবে। মক্কায় পৌছার পরে 'বিদায়ী তাওয়াফ' ব্যতিত অন্য কোন জরুরী কাজ নেই।

প্রশ্ন: যদি কেউ কোন কারণে নিজে পাথর নিক্ষেপ করতে না পারে তাহলে কি করবে?

উত্তর: যদি কেউ কোন কারণে নিজে পাথর নিক্ষেপ করতে না পারে তাহলে অন্য কাউকে প্রতিনিধি হিসাবে পাঠিয়ে তার মাধ্যমে পাথর মারাবে। এটা জায়েজ।

বিদায়ী তাওয়াফ

প্রশ্ন: বিদায়ী তাওয়াফের হুকুম কি?

মক্কা থেকে বিদায়ের পূর্বে বিদায়ী তাওয়াফ করা ওয়াজিব। এতে ইজতিব, রমল, সায়ী নেই। মাকামে ইবরাহীমে দু'রাকাআত সালাত আদায় করবে। মূলতাযাম, কাবার দরজা ও হাতীমে দু'আ করবে। যমযমের পানি পান করে দু'আ করবে। এরপর কাবাগৃহ ত্যাগ করবে।

তৃতীয় অধ্যায়: হজ্জ করার ধারাবাহিক বর্ণনা

প্রশ্ন: হজ্জের কাজগুলো আমরা কোন দিন কিভাবে করবো?

উত্তর: হজ্জ করার ধারবাহিক বর্ণনা নিম্নে পেশ করা হলো।

প্রস্তুতি

প্রথমে ঘর থেকে বের হওয়ার পূর্বে হজ্জের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সঙ্গে নেয়া। নিম্নে তার একটি তালিকা পেশ হলো:

* ইহরামের কাপড় (আড়াই হাত বহরের) আড়াই গজ করে ২ পিস এবং তিন গজ করে ২ পিস। * জামা ২টি। * গায়ের চাঁদর ১টি। * লুঙ্গি ২টি। * পায়জামা/প্যান্ট ২টি। * গেঞ্জি ২টি। * মেসওয়াক/ব্রাশ ও টুথপেষ্ট। * তোয়ালে/গামছা ১টি। * বিছানার চাদর ১টি। * স্পঞ্জ স্যান্ডেল ২ জোড়া। * পেলট, বাটি ও চায়ের কাপ ১টি (স্টীল/মেলামাইন)। * ছোট আয়না ও চিরুনী। * জুতা ও মোজা। * ছোট হ্যান্ড ব্যাগ ১টি। * গলায় ঝুলানো ব্যাগ ১টি। * বড় ব্যাগ ১টি। * স্যান্ডেল ও জুতা রাখার কাপড়ের ব্যাগ ১টি। * পবিত্র হজ্জ বিষয়ক পুস্তক ও প্রয়োজনীয় দোয়ার কিতাব সমূহ। * প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী নিয়মিত সেবনের ঔষধপত্র। * কোমরে বাঁধার বেল্ট ১টি। * প্রয়োজনীয় টাকা-পয়সা। কমপক্ষে দুই হাজার সৌদী রিয়াল। কেননা হজ্জের সফরে অন্যের মুক্ষাপেক্ষী হওয়া তাকওয়ার পরিপন্থী। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

[وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى } [البقرة: ১৯৭}

অর্থ: " এবং তোমরা পাথেয় গ্রহণ কর। নিশ্চয় উত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া। আর হে বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিগণ, তোমরা আমাকে ভয় কর।"[৬৫]

ঘর থেকে রওয়ানা

অজু-গোসল করে ঘর থেকে বের হোন। বের হওয়ার সময় নিম্নের দু'আটি পড়ুন:

بسم الله أمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله

উচ্চারণ: বিসমিল-াহি আমানতুবিল-াহি, ই'তাসামতু বিল-াহি, তাওয়াক্কালতু আলাল-াহি, লা হাওলা ওলা কুউওতা ইল-া বিল-াহি।

অর্থ: "আল-াহর নামে শুরু করছি, আমি আল-াহর প্রতি ঈমান আনছি, আল-াহকে মজবুতভাবে আকড়ে ধরছি, আল-াহর উপর ভরসা করছি এবং আল-াহ ব্যতিত কারো কোন ক্ষমতা এবং শক্তি নেই।"[৬৬]

তারপর আত্মীয়-স্বজনদেরকে বিদায় জানান এবং বিদায় জানানোর সময় নিম্নের দু'আটি পড়ুন:

أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُم

উচ্চারণ: "আসতাও দিউল-াহা দীনাকুম, ওয়া আমানাতাকুম, ওয়া খাওয়াতীমা আ'মালিকুম।"

অর্থ: "আমি আল-াহ নিকট তোমাদের দ্বীন, তোমাদের আমানতসমূহ এবং তোমাদের কাজসমূহের শেষ পরিনতি গচ্ছিত রেখে যাচ্ছি।"[৬৭]

এবারে গাড়িতে উঠে যান। পাসপোর্ট, টিকেট ও ইমিগ্রেশন কার্ড পূরণ করে এয়ারপোর্টের ভিতরে ঢুকে যান। এয়ারপোর্টের ভিতরে গিয়ে লাইনে দাড়িয়ে অতি প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র, কাপড়-চোপড় সাইড ব্যাগে রেখে দিয়ে ভারি মাল-সামান ও বড় লাগেজ জাহাজের বুকিংয়ে দিয়ে দিন। জেনে রাখবেন, এই মাল-সামান বিমানে বসে আপনি আর পাবেন না। জেদ্দা বিমান বন্দরে নেমে ইমিগ্রেশন শেষে বেল্টে মাল ঘুরতে থাকবে সেখান থেকে আপনার মাল আপনি বেঁছে নিবেন। অনেকে ভুল করে অথবা না জেনে জরুরী ঔষধ পত্র এমনকি ইহরামের কাপড় লাগেজে ঢুকিয়ে বেল্টে ছেড়ে দেয় পরে বিমানে বসে ইহরামের কাপড় নিজের কাছে না থাকায় বিনা ইহরামে জেদ্দায় অবতরণ করতে হয়। তাই ইহরামের

---

[৬৫] সুরা বাকারা ১৯৭।

[৬৬] মুসনাদে আহমদ ২০৭০৮।

[৬৭] সুনানে আবূ দাউদ ২৬০৩;হাদীসটি সহীহ।

কাপড় এবং জরুরী ঔষধপত্র যা বিমানে প্রয়োজন হতে পারে সেগুলো বুকিংয়ে না দিয়ে নিজের কাছে যে ব্যাগটি থাকবে ওটায় রাখুন।

বিমানে আরোহন

এরপর বিমানে আরোহনের বোর্ডিং কার্ড সংগ্রহ করে ইমিগ্রেশন লাইনে ঢুকে যান। ইমিগ্রেশন শেষে ভিতরে অজু-ইস্তিঞ্জা সেরে নিন। বিমানের ভিতরে যেহেতু সীমিত পানি থাকে সেকারণে অজু-এস্তেঞ্জা করা ইহরামের কাপড় পরিধান করা ঝামেলাপূর্ন তাই যদিও আমাদের এ অঞ্চলের লোকদের জন্য 'মীকাত' হচ্ছে 'ইয়ালামলাম' যা জেদ্দা থেকে প্রায় ৩০ কি:মি: পূর্বে তখন বিমানে থাকা অবস্থায় ইহরাম বাঁধার ঝামেলা এড়ানোর জন্য আপনি বিমানবন্দর থেকেই ইহরামের কাপড় পরিধান করে নিন। তবে ইহরামের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করা ও নিয়ত করা এবং তালবিয়া পাঠ করা থেকে বিরত থাকুন। কেননা যদিও মীকাতের পূর্বে ইহরাম বাধাঁ বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী জায়েজ, তথাপিও বহু পূর্ব থেকে যেমন অনেকেই এয়ারপোর্ট থেকে ইহরামের নিয়ত করে নেয় এটা মাকরূহ। তাই এয়ারপোর্ট থেকে বা নিজের বাড়ি থেকে ইহরামের কাপড়-চোপড় পরিধান করে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে বিমানে বিমানে উঠার আপেক্ষা করুন। বিমানে উঠার জন্য ঘোষণা হলে লাইনে দাড়িয়ে বোর্ডিং কার্ড হাতে নিয়ে বিমানে প্রবেশ করুন। সিট নাম্বার অনুযায়ী আপনার নির্ধারিত সিটে বসে পড়ুন। বিমান উড্ডয়নের পূর্বে সিট বেল্ট বেঁধে নিন। উড্ডয়নের সময় তিন বার 'আল-াহু আকবার' বলুন। অত:পর সফরের দু'আ পড়ে নিন। দু'আটি হলো:

سُبْحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِى سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِى الأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالأَهْلِ

উচ্চারণ: "সুবহানাল-াযী ছাখ্খারা লানা হাযা ওমা কুন্না লাহু মুকারিনীন, ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লামুনকালিবূন, আল-াহুম্মা ইন্না নাসআলুকা ফী সাফারিনা হাযাল বিররী ওয়াত তাকওয়া, ওয়া মিনাল আমালি মা তারদা, আল-াহুম্মা হাওয়িন আ'লাইনা সাফারানা হাযা, ওয়া আত্বেব আন্না বু'দাহ, আল-াহুম্মা আনতাস সাহেবু ফিস সাফারি ওয়াল খালিফাতু ফিল আহলি, আল-াহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন ওয়া'ছাইস সাফারি ওয়া কাআবাতিল মানযারি ওয়া সূ ইল মুনকালাবি ফিল মালি ওয়াল আহলি।"

অর্থ: "আমি পবিত্রতা বর্ণনা করছি ঐ সত্তার যিনি আমাদের জন্য এটিকে সহজ করে দিয়েছেন। আমারা এটি করতে সক্ষম ছিলাম না। নিশ্চয় আমরা আমাদের রবের দিকে প্রত্যাবর্তণ করব। হে আল-াহ! আমরা আমাদের এই সফরে আপনার নিকটে সততা এবং তাকওয়া চাই এবং এমন আমল চাই যা আপনি পছন্দ করেন। হে আল-াহ! আমাদের এই সফরকে সহজ করুন। এবং এর দুরত্বকে কমিয়ে দিন। হে আল-াহ! আপনিই এই সফরে আমাদের সঙ্গি এবং আমাদের অনুপস্তিতিতে আমাদের পরিবারে আমাদের প্রতিনিধি। হে আল-াহ! আমরা আপনার নিকট সফরের কষ্ট, দুঃখজনক দৃশ্য এবং আমাদের সম্পদে এবং পরিবারে খারাপ পরিনতি থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই।"[৬৮]

তারপরে যখন বিমানে মীকাতের ঘোষণা হবে তখন ইহরামের নিয়ত করে তালবিয়া পাঠ করে নিবেন। তবে মনে রাখবেন, ইহরাম বিহীন মীকাত অতিক্রম করা যাবে না। অনেকে জেদ্দা বিমান বন্দরে নেমে তারপরে ইহরামের নিয়ত করে। এটা ভুল। এ অবস্থায় একটি 'দম' দেওয়া ওয়াজিব। এ মাসআলা শুধু ঐ সকল হজ্জ ও ওমরাহকারীদের জন্য প্রজোয্য যারা সরাসরি এয়ারপোর্ট থেকে মক্কা চলে যাবে। আর যারা এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি মদীনা চলে যাবে তারা ইহরাম বাধঁবে না বরং মদীনা থেকে মক্কায় আসার পথে মদীনার মীকাত 'যুল হুলাইফা' যার বর্তমান নাম 'বি'রে আলী' যেখান থেকে রাসূলুল-াহ (সাঃ) নিজে ইহরাম বেঁধেছিলেন, সেখান থেকে ইহরাম বেঁধে মক্কায় রওয়ানা হবে।

অতঃপর হজ্জে তামাত্তু করতে চাইলে لبيك اللهم بعمرة متمتعا الي الحج (লাব্বাইকা আল-াহুম্মা বি ওমরাতিন মুতামাত্তিআন ইলাল হাজ্জি) আর ইফরাদ হজ্জ করতে চাইলে لبيك اللهم بحج (লাব্বাইকা আল-াহুম্মা বিহাজ্জিন) পাঠ করবে। আর কিরান হজ্জ করতে চাইলে لبيك اللهم بحجة و عمرة (লাব্বাইকা আল-াহুম্মা বিহাজ্জাতিন ওয়া ওমরাতিন) বলে নিয়াত করুন। অতপর তালবিয়া পাঠ করুন। তালবিয়া হচ্ছে

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ

উচ্চারণ: "লাব্বাইক আল-াহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইক লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নিঅ'মাতা লাকা ওয়াল মূলক, লা শারীকা লাকা।"

[৬৮] সহীহ মুসলিম ৩৩৩৯।

অর্থ: "আমি হাজির, হে আল-াহ! আমি হাজির, আমি হাজির, তোমার কোন শরীক নেই। আমি হাজির, নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নিয়ামত তোমারই, আর সকল ক্ষমতা তোমার, তোমার কোন শরীক নাই।"[৬৯] এভাবে ইহরামের কাজ সম্পন্ন হয়ে গেল।

এবার উড়োজাহজে বসে বসে বেশি বেশি তালবিয়া পাঠ করুন। আর পূর্বে ইহরাম বেঁধে না থাকলে বিমানের ভিতরে বসেই 'ইয়ালামলাম' বরাবর উপর দিয়ে অতিক্রম করার সময় ইহরাম বেঁধে নিন। যখন বিমান জেদ্দা বিমান বন্দরে অবতরণ করতে থাকবে তখন 'সুবহানাল-াহ' পাঠ করতে থাকবেন। বিমান থেকে নামার পরে এই দু'আ পাঠ করুন:

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ ، وَرَبَّ الأَرَضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ ، أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا. (مستدرك الحاكم)

উচ্চারণ: "আল-াহুম্মা রব্বাস সামাওয়াতিস সাবই' ওয়ামা আযলাল্না, ওয়া রব্বাল আরাদিনাস সাবই' ওয়ামা আকলালনা, ওয়া রাব্বাশ শায়াতীনি ওয়ামা আদলাল্না, ওয়া রাব্বার রিয়াহী ওয়ামা যারাইনা, আসআলুকা খাইরা হাযিহিল কারইয়াতি ওয়া খাইরা আহলিহা, ওয়া নাউযু বিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি আহলিহা ওয়া শাররি মা ফিহা।"

অর্থ: "হে আল-াহ! আপনি সাত আসমানের এবং তার নিচে যা আছে তার রব। সাত জমিন এবং সেগুলো যা ধারণ করে আছে তার রব। সমস্ত শয়তানগুলো এবং তারা যাদের পথভ্রষ্ট করেছে তাদের রব। বাতাসের এবং বাতাস যা উড়িয়ে নিয়ে যায় তার রব। আমি আপনার নিকট এই গ্রাম এবং এর অধিবাসীদের কল্যাণসমূহ চাইছি। এবং এই গ্রাম এবং এর অধিবাসীদের অকল্যাণ থেকে আশ্রয় কামনা করছি।"[৭০]

এরপর ইমিগ্রেশন পার হয়ে বেল্ট থেকে নিজের বুকিং দেয়া মালগুলো খুজে নিন। এবারে মাল-সামানা নিয়ে সামনে অগ্রসর হোন, চেক পয়েন্ট পার হয়ে বাহিরে গেটে পাসপোর্ট জমা দিন। পাসপোর্টে মুআ'লি-মের স্টিকার লাগানোর পরে মালপত্র নিয়ে জেদ্দা বিমানবন্দরে অবস্থিত বাংলাদেশ হজ্জ মিশনের পতাকা দেখে সেখানে সমবেত হোন। এবারে সকলের পাসপোর্টগুলো গ্রুপ লিডারের কাছে

[৬৯] সহীহ মুসলিম ২৮৬৮।
[৭০] মুসতাদরাকে হাকেম ১৬৩৪; সহীহ ইবনে হিব্বান ২৭০৯; সহীহ ইবনে খুযাইমা ১৫০।

জমা দিন। গ্রুপ লিডার মুআ'লি-ম কতৃক নির্ধারিত বাসের ব্যবস্থা করবেন। এবারে লাইন দিয়ে মক্কা যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাসে চড়ে বসুন। অফিসিয়াল কাজকর্ম সেরে সকলের পাসপোর্টগুলো ড্রাইভারের কাছে জমা দিবে। ড্রাইভার সকলের পাসপোর্ট নির্ধারিত ব্যাগে ভর্তি করে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করবে। এখন আপনি বেশি করে তালবিয়া পড়তে থাকুন। আর মক্কার পথে পাহাড়-পর্বত দেখতে থাকুন আর আল-াহকে স্মরণ করতে থাকুন।

মক্কার হারাম শরিফের সিমানায় প্রবেশমুখে 'রেহালের উপরে কুরআন' আকৃতিতে একটি গেট নজরে পরবে। এই গেট অতিক্রম করলেই আপনি হারাম শরিফের সীমানায় পৌছে গেলেন। এই হারামের সিমানার ভিতরের কোন প্রাণী শিকার করা যাবে না, গাছ কাঁটা যাবে না। এখানে যে প্রবেশ করবে সে নিরাপত্তা পাবে তাকে খুন করা যাবে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

[أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ} [العنكبوت: ৬৭}

অর্থ: " তারা কি দেখে না যে, আমি 'হারাম' কে নিরাপদ বানিয়েছি, অথচ তাদের আশ পাশ থেকে মানুষদেরকে ছিনিয়ে নেয়া হয়?"[৭১]

হারামের সিমানা

হতে	দিকে	পর্যন্ত	ব্যবধান
মক্কা	উত্তর	تنعيمতানঈম	৬ কি:মি
মক্কা	দক্ষিণ	اضاهআযাহ	১২ কি:মি
মক্কা	পূর্ব	جعرانهজিই'রানাহ	১৬ কি:মি
মক্কা	উত্তর-পূর্ব	وادي نخلةওয়াদি-নাখলাহ	১৩ কি:মি
মক্কা	পশ্চিম	حديبية شميسي হুদাইবিয়া শুমাইসী	১৫ কি:মি

মক্কার কাছাকাছি গিয়ে মুআ'লি-মের অফিসের সামনে গাড়ি থামবে। সেখানে ড্রাইভার পাসপোর্ট জমা দিয়ে দিবেন। মুআ'লি-ম অফিস থেকে আপনাকে

[৭১] সুরা আনকাবূত ৬৭।

হালকা নাস্তা দেয়া হবে। আর পাসপোর্টের পরিবর্তে আপনাকে একটি ঘরির মত হাতবেল্ট পরিয়ে দিবে। এই বেল্টে মুআ'লি-মের অফিসের নাম্বার, টেলিফোন নাম্বার ও ঠিকান লেখা থাকবে। এটি সঙ্গে রাখবেন।

আপনি এখন মক্কায়

এবারে মুআ'লি-ম অফিস থেকে আপনি মক্কা শহরের ভিতরে প্রবেশ করছেন। পূর্ণ আবেগের সহিত জোরে জোরে তালবিয়া পাঠ করুন। সম্ভব হলে ইব্রাহিম আ: এর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আপনিও পড়ুন:

{رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [البقرة: ১২৬]

উচ্চারণ: "রাব্বিজ আল হাযা বালাদান আমিনাঁও অর যুক আহলাহু মিনাছ ছামারাতি মান আমান মিনহুম বিল-াহি ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি।"

অর্থ: "হে আমার রব! আপনি একে নিরাপদ নগরী বানান এবং এর অধিবাসীদেরকে ফল-মুলের রিয্ক দিন যারা আল-াহ ও আখিরাত দিবসে ঈমান এনেছে।"[৭২] আরও পাঠ করতে পারেন :

{فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ} [إبراهيم: ৩৭]

উচ্চারণ: "ফাজআ'ল আফ ইদাতাম মিনান্নাসি তাহবী ইলাইহিম অর যুকহুম মিনাছ ছামারাতি লাআ'ল-াহুম ইয়াশকুরূন।"

অর্থ: "সুতরাং কিছু মানুষের হৃদয় আপনি তাদের দিকে ঝুঁকিয়ে দিন এবং তাদেরকে রিয্ক প্রদান করুন ফল–ফলাদি থেকে, আশা করা যায় তারা শুকরিয়া আদায় করবে'।"[৭৩] আরও একটি আয়াত পাঠ করতে পারেন:

{رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ } [إبراهيم: ৩৫]

উচ্চারণ: "রাব্বিজ আল হাযাল বালাদা আমিনাঁও অজ নুবনী ওয়া বানিয়্যা আন নাঅ'বুদাল আছনাম।"

অর্থ: "হে আমার রব, আপনি এ শহরকে নিরাপদ করে দিন এবং আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখুন'।"[৭৪]

[৭২] সুরা বাকারা ১২৬।

[৭৩] সুরা ইব্রাহীম ৩৭।

[৭৪] সুরা ইব্রাহীম ৩৫।

আস্তে আস্তে আপনি এখন মক্কায় আপনার ভাড়া করা বাড়ির সামনে উপস্থিত। এখন আপনি আপনার জন্য ভাড়া করা বাসার নির্দিষ্ট সিটের দখল নিন। এখানে মাল-সামান রেখে অজু-এস্তেঞ্জা, খাওয়া-দাওয়া শেষে আপনার গ্রুপ লিডারের মোবাইল নাম্বার, বাসার কার্ড, ফোন নাম্বার সংগ্রহ করে সাথে রাখুন। গ্রুপ লিডারের নেতৃত্বে ওমরাহ করার উদ্দেশ্যে দলবদ্ধভাবে বাইতুল-াহর দিকে অগ্রসর হোন।

মসজিদুল হারামের দিকে রওয়ানা

প্রথমে কাবার চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত মসজিদুল হারাম নজরে পরবে। যার সর্ম্পকে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

[فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ] [البقرة: ১৪৯]

অর্থ: "তোমার চেহারা মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও।"[৭৫] আরও বলা হয়েছে:

[وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا] [آل عمران: ৯৭]

অর্থ: আর যে তাতে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ হয়ে যাবে।[৭৬]

মসজিদুল হারামে প্রবেশ করার সময় প্রথমে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করুন এবং এই দু'আটি পড়ুন:

أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

উচ্চারণ: "আউযুবিল-াহিল আজিম ওয়া বি ওজহিহিল কারীম ওয়া সুলতানিহীল কাদীম মিনাশ শাইতানির রাজিম"।

অর্থ: "আমি মহান আল-াহ (সুব:), তার সম্মানিত সত্তা এবং তার আদি কাল থেকে স্থায়ী তার রাজত্বের নিকটে বিতারিত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থণা করছি।"[৭৭]

এখনই আপনি বাইতুল-ায় পৌঁছে যাচ্ছেন, যে বাইতুল-াহ সর্ম্পকে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

[৭৫] সুরা বাকারাহ ১৪৯।

[৭৬] সুরা আল ইমরান ৯৭।

[৭৭] আবু দাউদ ৪৬৬।

[إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ] [آل عمران: ৯৬]

অর্থ: "নিশ্চয় প্রথম ঘর, যা মানুষের জন্য স্থাপন করা হয়েছে, তা মক্কায়। যা বরকতময় ও হিদায়াত বিশ্ববাসীর জন্য।"[৭৮]

যেই বাইতুল-াহর দিকে ফিরে আপনি সালাত আদায় করেন, যেই বায়তুল-াহ আপনার প্রাণের চেয়েও প্রিয়।

উলে-খ্য যে, মাসজিদুল হারামে যেহেতু সবসময় হাজার হাজার লোক নফল, ফরজ সালাত আদায় করতে থাকে। অপর দিকে অনেকের প্রয়োজনের কারণে বের হতে হয় সে কারণে মাসজিদুল হারামে সালাত আদায়কারীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা জায়েজ। চাই পুরুষ, মেয়েলোক যেই হোক না কেন। এ সম্পর্কে একটি হাদীসও রয়েছে যদিও হাদীসটি সনদের দিক থেকে দূর্বল তবুও প্রয়োজনের কারণে বাস্তব আমল ঐ হাদীস অনুযায়ীই হয়ে থাকে। হাদীসটি এই:

عن كَثِيرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ عَمَّنْ سَمِعَ جَدَّهُ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهْمٍ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ سُتْرَةٌ

অর্থ: "আবূ ওদাআ' (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল-াহ (সা:) কে দেখেছি যে, তিনি বাবে বনী সাহমের দিকে সালাত আদায় করছিলেন। লোকেরা তার সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া করছিলো অথচ তার মাঝে এবং কা'বার মাঝে কোন ছুতরাও ছিল না।"[৭৯]

যাই হোক, এবারে আপনি আস্তে আস্তে বাইতুল-াহর দিকে অগ্রসর হোন।

বায়তুল-াহ দিকে প্রথম তাকিয়ে এই দু'আ পড়বেন:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ ، اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيما وَمَهَابَةً وَزِدْ مَنْ حَجَّهُ أَوِ اعْتَمَرَهُ تَكْرِيمًا وَتَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَبِرا

উচ্চারণ: "আল-াহুম্মা আন্নাত সালাম ওয়া মিনকাস সালাম ফাহায়্যিনা রব্বানা বিস সালাম। আল-াহুম্মা যিদ হাজাল বাইতা তাশরীফান ওয়া তা'জিমান ওয়া তাকরীমান ওয়া মাহাবাতান ওয়া যিদ মান হাজ্জাহু আও ই'তামারাহু তাকরীমান ওয়া তাশরীফান ওয়া তা'জিমান ওয়া বিররান"।

[৭৮] সুরা আল ইমরান ৯৬।

[৭৯] মুসনাদে আহমদ ২৭২৪২; সুনানে আবু দাউদ ২০১৬;

অর্থ: "হে আল-াহ! আপনার একটি গুণবাচক নাম হচ্ছে 'সালাম' (নিরাপত্তা), এবং সমস্ত সৃষ্টজীব তোমার মাধ্যমেই নিরাপত্তা পায়। সুতরাং আমাদের নিরাপত্তার সাথে জীবন-যাপন করার সুযোগ দান কর ন। হে আল-াহ! এই ঘরের (বাইতুল-ার) মর্যাদ, শ্রেষ্টত্ব, সম্মান এবং গাম্ভীরতা বাড়িয়ে দিন। এবং যারা এই ঘরে হজ্জ বা ওমরাহ করে তাদেরও সম্মান, মর্যাদা, শ্রেষ্টত্ব ও আনুগত্য বাড়িয়ে দিন।"[৮০]

এবারে আপনি আস্তে আস্তে কাবার চতুর্দিকে খোলা চত্তর 'মাত্বাফ' দিয়ে হাজরে আসওয়াদ বরাবর চলে যান। মনে মনে তাওয়াফের নিয়ত কর ন। যদি সুযোগ হয় তাহলে ডান হাতে 'হাজরে আসওয়াদ' পাথরকে স্পর্শ কর ন সম্ভব হলে চুমু দিন। আর সম্ভব না হলে হাত দিয়ে ইশারা করবেন। কিন্তু সাবধান! পাথর চুমা দিতে গিয়ে মানুষকে কষ্ট দেয়া, ধাক্কা-ধাক্কি করা থেকে বিরত থাকুন। কেননা রাসূলুল-াহ (সা:) ওমর বিন খাত্তাব (রা:) কে বলেছিলেন:

عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: –يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله فهلل وكبر(المسند للإمام أحمد بن حنبل)

অর্থ: ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত, আল-াহর রাসূল (সা:) বলেছেন, হে ওমর! তুমি শক্তিশালী পুর ষ 'হাজরে আসওয়াদ' এর কাছে গিয়ে ভীর করে দূর্বল মানুষদের কষ্ট দিও না। যদি খালি পাও তাহলে পাথর স্পর্শ কর নতুবা সেদিকে ফিরে ইশারা করে তাহলীল ও তাকবীর বল।[৮১]

আপনিও এ হাদীস অনুযায়ী আমল কর ন। হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করে (সম্ভব হলে) অথবা হাতে ইশারা করে (স্পর্শ করা সম্ভব না হলে) এই দু'আ পর ন:

اللَّهُمَّ إِيمَانًا بِكَ وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم

উচ্চারণ: "আল-াহুম্মা ঈমানাম বিকা ওয়া তাসদীকান বিকিতাবিকা ওয়া ওফাআন বিআহদিকা ওয়া ইত্তিবাআন লি সুন্নাতি নাবিইয়্যকা সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম।"।

[৮০] সুনানে বাইহাকী ৮৯৯৫।

[৮১] মুসনাদে আহমদ ১৯০।

অর্থ: "হে আল-াহ! তোমাকে স্বরণ করছি তোমার প্রতি ঈমান এনে, তোমার কিতাবকে সত্যায়ণ করে, তোমার ওয়াদা পূরণ করার প্রতি অঙ্গিকারাবদ্ধ হয়ে এবং তোমার রাসূলের আনুগত্য করে।"[৮২]

এবারে তাওয়াফ শুর কর ন। হাজরে আসওয়াদ থেকে শুর করে পুনরায় হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত ঘুরে আসলে একবার তাওয়াফ হবে। এভাবে মোট সাতবার তাওয়াফ করতে হবে। তাওয়াফে কুদূম এবং ওমরাহর তাওয়াফে দুটো কাজ অতিরিক্ত করতে হবে। প্রথমটি হলো: 'ইজতিবা' শুধুমাত্র তাওয়াফের শুর থেকে শেষ পর্যন্ত করবে অন্যকোন সময়ে নাই। এর বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। আর দ্বিতীয়টি হলোঃ রমল যার আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে গিয়েছে। রমল শুধুমাত্র পুর ষের জন্য প্রথম তিন তাওয়াফে করতে হবে। বাকি চার তাওয়াফে স্বাভাবিকভাবে হাঁটবে। মহিলাদের রমল করতে হবে না। প্রতি তাওয়াফে 'র কনে ইয়ামানী' স্পর্শ করা সম্ভব হলে শুধু স্পর্শ করবেন চুমু দিবেন না। কেননা চুমু দেওয়া শুধু হজরে আসওয়াদের ক্ষেত্রেই জায়েজ। আর যদি র কনে ইয়ামানী স্পর্শ করা সম্ভব না হয় তাহলে হাতে ইশারা করবেন না। প্রতি তাওয়াফে র কনে ইয়ামনী ও হাজরে আসওয়াদের মাঝখানে নিম্নের দু'আটি পাঠ কর ন:

}رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ{ [البقرة: ২০১]

উচ্চারণ: "রব্বানা আতিনা ফিদ দুনইয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাঁও ওয়া কিনা আযাবান নার।"

অর্থ: "হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন। আর আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা কর ন।"[৮৩]

প্রতি তাওয়াফে হাজরে আসওয়াদ বরাবর অতিক্রম করার সময় সম্ভব হলে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করবেন ও চুমু খাবেন। এখানে মনে রাখবেন পাথরের কোন ক্ষমতা নাই বরং আল-াহর রাসূল (সা:) চুমু খেয়েছেন বলেই চুমু খাওয়ার বিধান রয়েছে। একারণেই হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ (صحيح البخاري)

[৮২] বাইহাকী ১৬৫৬।

[৮৩] সুনানে আবু দাউদ ১৮৯৪।

অর্থ: "ওমর বিন খাত্তাব (রা:) 'হাজরে আসওয়াদ' এর কাছে এলেন। অতপর পাথরে চুমু খেলেন। তারপর বললেন: আমি জানি তুমি একটি পাথর ছাড়া কিছুই নও। তুমি কারো ক্ষতিও করতে পার না উপকারও করতে পার না। আমি যদি রাসূলুল-াহ (সা:) কে তোমাকে চুমু দিতে না দেখতাম তাহলে আমি তোমাকে চুমু দিতাম না।[৮৪]

মুহতারাম হাজীসাহেব! জেনে রাখুন, যে পাথরে আল-াহর রাসূল (সা:) চুমু খেয়েছেন, স্পর্শ করেছেন, যে পাথর জান্নাত থেকে নাজিল করা হয়েছে, যে পাথর কাবার সাথে লেগে আছে সেই পাথরেরই যখন কোন উপকার-অপকারের ক্ষমতা নেই। তখন অন্যান্য পাথরের কি ক্ষমতা থাকতে পারে। সুতরাং যারা বিভিন্ন রকমের পাথরের ক্ষমতায় বিশ্বাসী হয়ে পাথর ব্যবহার করছেন তারা এই শিরকের থেকে বাঁচার ব্যাপারে সতর্ক হোন।

যাই হোক, যদি 'হাজরে আসওয়াদ' পাথরে চুমু খাওয়া সম্ভব না হয় তাহলে শুধু হাতে স্পর্শ করে হাতে চুমু খাবেন। আর যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে ঐ বরাবর এসে শুধু হাতে ইশারা করবেন। এবং মুখে 'বিসমিল-াহি আল-াহু আকবার' পাঠ করবেন। সেক্ষেত্রে হাতে চুমু খাবেন না। তাওয়াফ চলাকালীন সময় যে কোন দু'আ তাসবীহ-তাহলীল পাঠ করতে পাড়েন। র ুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মাঝখানে "রব্বানা আতিনা ফিদ দুনইয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাঁও ওয়া কিনা আযাবান নার।" ছাড়া অন্য কোন দু'আ সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমানিত নেই। তবে কিছু কিছু হাদীসে প্রথম তিন তাওয়াফে

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجّاً مَبْرُوراً وذنْباً مَغْفُوراً، وَسَعْياً مَشْكُوراً

উচ্চারণ: "আল-াহুম্মাজ আ'লহু হাজ্জান মাবর ুরান, ওয়া যাম্বান মাগফূরান, ওয়া সা'ইয়ান মাশকূরান।"

অর্থ: "হে আল-াহ ! আপনি আমার হজ্জকে কবুল কর ুন, আমার গুনাহকে ক্ষমা কর ুন এবং আমার সায়ীকে গ্রহণ কর ুন।"

এবং শেষের চার তাওয়াফে

اللَّهُمَّ اغْفِر وَارْحَمْ، وَاعْفُ عَمَّا تَعْلَمْ وَأَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَم، اللَّهُمَّ رَبَّنا آتنا في الدُّنْيا حَسَنَةً وفي الآخِرة حَسَنةً وَقِنا عَذَابَ النَّارِ

[৮৪] সহীহ বুখারী ১৫৯৭; সহীহ মুসলিম৩১২৯; সুনানে তিরমিজি ৮৬১ ; আবূ দাউদ ১৮৭৫।

উচ্চারণ: " আল-াহুম্মাগ ফির, ওয়ার হাম, ওয়া'ফু আম্মা তা'লামু ওয়া আন্তাল আয়া'জ্জুল আকরাম, আল-াহুম্মা রাব্বানা আতিনা ফিদ দুনইয়া হাসানাতাওঁ ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতওঁ ওয়াকিনা আযাবান্নার।"

অর্থ: "হে আল-াহ! আপনি আমাকে ক্ষমা কর ুন এবং আমার উপর রহমত বর্ষণ কর ুন। এবং আমার অপরাধ গুলোকে মার্জণা কর ুন। হে আল-াহ! আপনি আমাকে দুনিয়ায় এবং আখেরাতে উত্তম বিনিময় দান কর ুন এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর ুন।" দোয়াটি পড়ার কথা উলে-খ রয়েছে।[৮৫]

তাওয়াফের সময় কথা-বার্তা ও এদিক সেদিক তাকানো ইত্যাদি থেকে বিরত থাকুন। তবে দ্বীনি আলোচনা, সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ, প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল প্রদান করা জায়েজ। তাওয়াফের সংখ্যা ভূলে গেলে কমের সংখ্যা ধর্তব্য হবে। এভাবে সাতবার তাওয়াফ শেষ হলে সম্ভব হলে মাকামে ইব্রাহিমের পিছনে চলে যান। এবং পড়ুন:

[وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلى} [البقرة: ১২৫}

উচ্চারণ: "অত্তাখিজূ মিম মাকামি ইবরাহীমা মুসাল-া।"

অর্থ: "তোমরা 'মাকামে ইবরাহীমকে' সালাতের স্থান হিসাবে গ্রহণ করা।"[86]

তারপরে ওখানে দু'রাকাত সালাত আদায় কর ুন। আর মাকামে ইব্রাহিমের পিছনে সম্ভব না হলে হারাম শরীফের যেকোন জায়গায় আদায় করা যাবে। প্রথম রাকাআতে সুরা ফাতেহার পরে 'সুরা কাফের ূন' এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সুরা ফাতেহার পরে 'সুরা ইখলাস' পাঠ কর ুন। অতঃপর সুযোগ হলে একটু যমযমের পানি পান করে নিন। কেননা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عن جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه سلم يقول " ماء زمزم لما شرب له"

অর্থ: "জাবের (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূল (সা:) কে বলতে শুনেছি 'জমজমের পানি যেই উদ্দেশ্যে পান করবে তার জন্যই ফলদায়ক হবে।"[৮৭]

[৮৫] আল আযকার ুন নাবাবী ১/১৯৪।
[৮৬] সুরা বাকারা ১২৫।
[৮৭] সুনানে ইবনে মাজাহ ৩০৬২।

আরেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ অর্থ: "নিশ্চয়ই জমজমের পানি বরকতময় এবং উহা খাদ্যও বটে।"[৮৮]

আপনি এখন সাফা-মারওয়া পাহাড়ে

এবারে ওখান থেকে পিছনে ডানদিকে সাফা-মারওয়া পাহাড়ে চলে যান। প্রথমে পাঠ করুন:

[إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ] [البقرة: ١٥٨]

উচ্চারণ: "ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওতা মিন শাআইরিল-াহ।"
অর্থ: "নিশ্চয়ই সাফা-মারওয়া পাহাড় আল-াহর নিদর্শণাবলীর মধ্য থেকে অন্যতম নিদর্শণ।"[৮৯]

এরপর বলবে:

أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ

উচ্চারণ: "আবদাউ বিমা বাদাআল-াহু বিহী"।
অর্থ: " আল-াহ (সুব:) যেভাবে শুরু করেছেন আমিও সেভাবে শুরু করছি।"
সাফা পাহাড়ে উঠে কিবলার দিকে মুখ করে এই দু'আ পাঠ করবে:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ

উচ্চারণ: " লা ইলাহা ইল-াহু, অহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুলি- শাই ইন কাদীর। লা ইলাহা ইল-াহু, অহদাহু, আনজাযা ওয়া'দাহু, ওয়া নাসারা আবদাহু, ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহু"।
অর্থ: " আল-াহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি একক। তার কোন শরীক নেই। সকল ক্ষমতা তার, এবং সকল প্রশংসার উপযুক্ত তিনিই, তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল-াহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তিনি তার ওয়াদা পূর্ণ করেন, তাঁর বান্দাদের সাহায্য করেন এবং একাই সম্মিলিত দুশমন বাহিনীকে পরাজিত করেন।"
এই দু'আ তিনবার পাঠ করবে। তারপর ইবাদতের নিয়ত করে সাফা থেকে মারওয়া এবং মারওয়া থেকে সাফা এভাবে সাতবার সায়ী করুন। সাফা থেকে

[৮৮] সহীহ মুসলিম ৬৫১৩।
[৮৯] সুরা বাকারা ১৫৮।

শুরু হবে, মারওয়া গিয়ে শেষ হবে। অনেকে ভুল করে সাফা থেকে মারওয়া এবং মারওয়া থেকে পুনরায় সাফা এসে একবার সায়ী' হয় বলে মনে করেন। এটা ভুল। বরং সাফা থেকে মারওয়া গেলেই একবার সায়ী পূর্ণ হয়ে যাবে।। মারওয়া পাহাড়ে ঐ আমলগুলোই করুন যা সাফা পাহাড়ে করেছিলেন। আবার মারওয়া থেকে সাফা পর্যন্ত গেলে আরেকবার পূর্ণ হয়ে যাবে। এভাবে মারওয়া গিয়ে শেষ হবে। সাফা-মারওয়া সায়ী করার সময় পুরুষগণ দুই সবুজ বাতির মাঝখানে দৌড়াবে আর এই দু'আটি পাঠ করবে:

رَب اغفر وارحم وانك انت الأعز الأكرم

উচ্চারণ: "রাব্বিগ ফির ওয়ারহাম ওয়া ইন্নাকা আন্তাল আআ'জ্জুল আকরাম।"
অর্থ: "হে আমার রব! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার উপর দয়া করুন। নিশ্চয়ই আপনি মহা ক্ষমতাবান এবং সম্মানিত।"
এভাবে সায়ী করা শেষ হলে তাম্মাত্তু' হজ্জ আদায়কারী পুরুষগণ মাথা মুন্ডিয়ে অথবা মাথার চুল কেঁটে আর মহিলাগণ চুলের একগিরা পরিমান কেটে নিলেই হালাহ হয়ে যাবে। আর 'ইফরাদ' ও 'কিরান' হজ্জ আদায়কারীগণ মাথা না মুন্ডিয়ে ইহরাম পরিধান করা অবস্থায় থাকবেন। ইফরাদ হজ্জকারীর জন্য শুধু তাওয়াফে কুদূম' করাই জরুরী ছিল। সাফা-মারওয়া সায়ী করার প্রয়োজন নেই। তবে যদি হজ্জের সায়ী'র উদ্দেশ্যে তাওয়াফে কুদূমের সঙ্গে সায়ী করে নেয় তাহলে হজ্জের ফরজ তাওয়াফ 'তাওয়াফে ইফাদাহ' এরপরে আর সায়ী করতে হবে না। যাই হোক, তারপর পুরুষেরা মাথা মুন্ডান বা চুল ছাঁটুন আর মহিলারা আঙ্গুলের এক গিরা পরিমান চুল কাটুন। তারপর আপনি হোটেলে চলে যান। সেখানে গিয়ে গোসল করে (যদি হজ্জে তামাত্তু আদায়কারী হন) স্বাভাবিক জামা-কাপড় পরিধান করতে পারেন। এখন আপনি মক্কায় সম্পূর্ন হালাল অবস্থায় চলা ফেরা করতে পারেন। হারাম শরিফে সালাত, আদায় করুন, বাইতুল-ায় নফল তাওয়াফ করুন, কুরআন তিলাওয়াত, তাসবিহ , তাহলীল ইত্যাদিতে বেশি বেশি সময় কাটান। বেহুদা ঘোরা-ফেরা করা থেকে বিরত থাকুন। আর জিলহজ্জে ৮ তারিখের আপেক্ষায় থাকুন।

হজ্জ শুরু

জিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখ

জিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখকে 'ইয়াওমুত তারবিয়া' বলা হয়। কেননা এই দিন কুরবানীর পশুগুলোকে পানি পান করানো হতো। এই দিন যোহর, আছর,

মাগরীব, এশা ও ফজর মিনায় আদায় করতে হয়। বর্তমানে জিলহজ্জের ৭ তারিখ রাতেই মিনায় নিয়ে যায়। তাই জিলহজ্জের ৭ তারিখ বিকালে অজু-গোসল করে পুরুষগণ ইহরামের কাপড় পরিধান করে এবং মহিলাগণ ইহরামের প্রস্তুতি নিয়ে পূর্বের ন্যায় দু'রাকাআত সালাত আদায় করে 'লাব্বাইকা বিহাজ্জাতিন' বলে হজ্জের নিয়ত করে নিন। তারপরে তালবিয়া পাঠ করুন। রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে মিনায় যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় মাল-সামান যেমন: অতিরিক্ত এক সেট ইহরামের কাপড়, হালাল হওয়ার পরে পরিধান করার জন্য একটি জামা একটি পাজামা বা লুঙ্গি একটি গেঞ্জি একটি চাঁদর, মেসওয়াক, জরুরী ঔষধপত্র, টয়লেটপেপার ইত্যাদি একটি সাইড ব্যাগে ভর্তি করে সাথে নিয়ে নিন। বেশি ভারি বোঝা নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। মনে রাখবেন আজকের থেকেই হজ্জের কাজ শুরু হলো। আরাফাহ, মুযদালিফা, মিনায় অবস্থান করতে হবে। অনেক সময় প্রচণ্ড ভিড়ের মাঝে পায়ে হেঁটে পথ চলতে হবে। তাই নিজে খুব সহজে যতটুকু বোঝা বহন করতে পারবেন অতটুকুই সাথে নিবেন। অন্য কারো উপর ভরসা করে বেশি মাল-সামান সাথে নিবেন না। যাতে হারিয়ে গেলে আপনাকে পেরেশান হতে না হয়। আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে: **যে যত বেশি দূর্বল তার বোঝা তত ভারি।** অনেক সময় প্রচণ্ড ভিরের কারণে এই মাল-সামান দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মিনায় রওয়ানা হওয়ার পূর্বে একটি তাবুর কার্ড দেয়া হবে। এটি অবশ্যই সঙ্গে রাখবেন। নতুবা আপনাকে তাবুর গেটে আটকে দেয়া হবে। আপনি এবার মিনায় যাওয়ার জন্য গাড়ির আপেক্ষা করুন। আপনার মুআল্লিমের গাড়িতে বড় অক্ষরে মুআল্লিমের নাম্বার লেখা থাকবে। আপনার গ্রুপ লিডারের নেতৃত্বে সারিবদ্ধভাবে গাড়িতে উঠে যান। মিনায় গিয়ে আপনার নির্দিষ্ট তাবুতে প্রবেশ করে একটি সিট নিয়ে নিন। সুযোগ হলে ঘুমিয়ে পড়ুন। তা না হলে এস্তেঞ্জা করে ফজরের সালাতের অপেক্ষা করুন। সালাতের পরে বাহিরে বের হয়ে আপনার তাবুর লোকেশন,খুটি নাম্বার ইত্যাদি ভাল করে চিনে নিন কারণ আরাফাহ, মুযদালিফা শেষে আপনাকে আবার এই তাবুতেই ফিরে আসতে হবে। তাই যদি আপনি আরাফাতের ময়দানে থেকে আসার পথে অথবা মুযদালিফায় হারিয়ে গেলে একা একাই যেন মিনার তাবুতে ফিরে আসতে পারেন সেভাবে নিজ তাবুটাকে চিনে নিবেন তারপর হালকা নাস্তা করে ঘুমিয়ে পড়ুন। সকাল ১০টা বা ১১টায় উঠে অজু-ইস্তেঞ্জা বা গোসল সেরে নিন। মনে রাখবেন এখানে প্রতিটি বাথরুমের সামনে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। তাই একটু বেশি সময় নিয়েই অজু-এস্তেঞ্জার জন্য বের হবেন। তারপর যোহর থেকে শুরু করে পরের দিন ফজর পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করা

সুন্নত। কিন্তু বর্তমানে হাজীদের চাপ বেশি থাকায় অর্ধরাতের পরই মিনা থেকে আরাফাতের উদ্দেশ্যে হাজী সাহেবদেরকে গাড়িতে বহন করা শুরু হয়ে যায়।

জিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখে আরাফাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা

আপনি এখন আরাফাতের ময়দানে যাওয়ার জন্য আপনার মুআল্লিমের স্টিকারযুক্ত গাড়িতে পূর্বের ন্যায় গ্রুপ লিডারের নেতৃত্বে উঠে যান। আরাফাতের ময়দানে গিয়ে আপনার মুআল্লিমের নির্দিষ্ট তাবুতে অবস্থান নিন। সময় থাকলে আরাফাতের ময়দানে অবস্থিত 'মসজিদে নামিরা' 'জাবালে রহমত' ইত্যাদি ঘুরে দেখতে পারেন। তারপরে সম্ভব হলে গোসল করে নিন। আরাফাতের দিন আরাফাতের ময়দানে গোসল করা অত্যান্ত মর্যাদাসম্পন্ন একটি ইবাদত। গোসল করে নিজের তাবুতে আপেক্ষা করুন। যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়া শুরু হবে তখন থেকেই সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করুন। কিছুক্ষনের জন্য হলেও আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা ফরজ। আর সূর্যাস্ত পর্যন্ত পূর্ণ সময় থাকা হল ওয়াজিব। দিনের বেলায় সম্ভব না হলে রাতেও যদি সুবহে সাদেকের পূর্বে অবস্থান করে তাতেও ফরজ আদায় হয়ে যাবে। একারণেই হাদীসে বলা হয়েছে:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ نَاسٌ فَسَأَلُوهُ عَنْ الْحَجِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ عَرَفَةُ فَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ

অর্থ: "আবদুর রহমান ইবনে ইয়া'মার (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কাছে উপস্থিত ছিলাম এমতাবস্থায় কিছু লোক এসে রাসূলুল্লাহ (সা:) কে হজ্জ সর্ম্পকে প্রশ্ন করলো। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন: হজ্জ হলো 'আরাফাহ'। সুতরাং যে ব্যক্তি মুযদালিফার রাত্রের সূবহে সাদেকের পূর্বে (হলেও) আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করতে পারলো তার হজ্জ পূর্ণ হলো।[৯০]

এবারে যোহর ও আছরের সালাত একত্রে যোহরের সময় আদায় করুন। সম্ভব হলে মসজিদে নামিরায় যেখান থেকে বর্তমানে হজ্জের খুতবা দেয়া হয় সেখানে 'ইমামূল হজ্জ' এর ইমামতিতে হজ্জের খুতবা শ্রবণ করুন ও যোহর, আছর 'কসর' (সফরের সালাত) এবং 'জমা' (একত্র) করে আদায় করুন। আর যদি মসজিদে নামিরায় পৌঁছা সম্ভব না হয় তাহলে নিজ নিজ তাবুতে এক আজান ও

---

[৯০] সুনানে নাসায়ী ৩০১৬।

দুই ইকামতে যোহর এবং আছর কছর (সফরের সালাত) এবং জমা' (একত্র) করে আদায় করুন।

একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা, বাংলা বা উর্দূ ভাষায় লিখিত অনেক হজ্জের বইতে বলা হয়েছে যে, যদি ইমামূল হজ্জের সাথে আরাফাতের ময়দানে মসজিদে নামিরায় সালাত আদায় করে তাহলেই কেবল মাত্র যোহর আছর একত্রে আদায় করবে। নতুবা যোহরের সময় যোহর আছরের সময় আছর আদায় করবে। এই মাসআলাটি ভূল, এর কোন দলীল নেই। বরং এটি হজ্জের মাসআলা, হজ্জের সময় মাসআলা হলো, আরাফাতের ময়দানে যোহর ও আছর একত্র করে 'জম'য়ে তাকদীম' অর্থাৎ আছরকে যোহরের সময় এনে একত্র করে আদায় করতে হবে। ঐ দিনের জন্য যোহরের সময়ই উভয় সালাতের জন্য সময় হিসাবে শরিয়ত কতৃক নির্ধারণ করা হয়েছে। আর মুযদালিফার ময়দানে মাগরিব ও এশাকে 'জম'য়ে তাখীর' অর্থাৎ মাগরিবকে এশার সময়ে এশার সালাতের সাথে এক আযান ও দুই ইকামতে আদায় করতে হবে। এটাই শরিয়তের নিয়ম। এক্ষেত্রে কেউ বলে না যে, মুযদালিফার ময়দানে অবস্থিত মসজিদে 'মাশআ'রুল হারাম' এ যদি ইমামূল হজ্জের ইমামতিতে আদায় করে তাহলে মাগরিব এশা একত্র করে আদায় করবে। নতুবা মাগরিবকে মাগরিবের সময় ও এশাকে এশার সময় আদায় করবে। বরং সকলেই একমত যে, মুযদালিফার মাঠে ইমামূল হজ্জের ইমামতিতে সালাত আদায় করুক বা ভিন্ন ভিন্ন আদায় করুক সর্বাবস্থায় 'জম'য়ে তাখীর' অর্থাৎ এশার সময়ে আদায় করবে। তাহলে আরাফাতের ময়দানে ভিন্ন ভিন্ন জামাআ'ত করলে যোহরকে যোহরের সময় আর আছরকে আছরের সময় আদায় করতে হবে এর কারণ কি? তাই দলীল-প্রমাণ বিহীন, মনগড়া লিখিত ঐসকল পুস্তিকাগুলোর প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ না করে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর অনুসরণ করুন। এরপর মুআ'ল্লিম কর্তৃক সরবরাহকৃত খাবার খেয়ে নিন। তারপরে পূর্ণ একাগ্রতার সাথে আন্তরিকভাবে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বিনয়ের সাথে আল্লাহর কাছে দু'আ করতে থাকুন। জেনে রাখুন! আরাফাতের ময়দান দু'আ কবুলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোর অন্যতম। হাদীস শরীফে এসেছে,

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ? قَالَ : " مَا رُئِيَ الشَّيْطَانُ يَوْماً، هُوَ فِيهِ أَصْغَرُ وَلاَ أَدْحَرُ وَلاَ أَحْقَرُ وَلاَ أَغْيَظُ، مِنْهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ، وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لِمَا رَأَى مِنْ تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ، وَتَجَاوُزِ اللَّهِ عَنِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ،

অর্থ: "তালহা ইবনে ওবাইদুল্লাহ থেকে বর্নিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন: আরাফাতের দিন শয়তানকে যেভাবে আপমানিত, হতাশাগ্রস্থ, লাঞ্চিত,বঞ্চিত ও ইর্ষান্বিত দেখা যায় তা অন্যকোন সময়ে দেখা যায় না। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে ঐদিন বেশি বেশি পরিমানে আল্লাহর রহমত বর্ষণ হওয়া এবং আল্লাহ (সুব:) কর্তৃক মানুষের বড় বড় গুনাহগুলোকে ব্যাপকভাবে ক্ষমা করে দেওয়া।" এই হাদীসটি মুরসাল সনদে বর্ণিহ হয়েছে এর সর্মথনে আরও অনেক দলীল-প্রমাণ রয়েছে। মুসলিম শরিফের সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِى يَقُولُ يَا وَيْلَهُ - وَفِى رِوَايَةِ أَبِى كُرَيْبٍ يَا وَيْلِى - أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِىَ النَّارُ ».

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্নিত: রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করছেন: যখন বনী আদম সিজদার আয়াত তিলওয়াত করে অতপর সেজদাহ করে তখন শয়তান নির্জনে কাঁদে আর বলে, হায় আমার দুর্ভাগ্য! বনী আদমকে সিজদাহ করতে বলা হলে তারা সিজদাহ করলো, তাদের জন্য জান্নাত। আর আমাকে সিজদাহ করতে বলা হলে আমি অস্বীকার করলাম, আমার জন্য জাহান্নাম।"[৯১]

শয়তান থেকে সাবধান

এজন্য শয়তান হজ্জের শুরুর থেকে প্রতিটি জায়গায়, প্রতিটি কাজে ধোঁকা দেওয়ার জন্য ও আমালকে বিনষ্ট করে দেওয়ার জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ইবনে আবী হাতেম স্বীয় তাফসীরে উল্লেখ করেন:

عن مجاهد رحمه الله : ما من رفقة تخرج إلى مكة إلا جهز معهم إبليس مثل عدتهم

অর্থ: "মুজাহিদ (র:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখনই কোন ব্যক্তি বা দল হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে রওয়ানা হয় তখন ইবলিসও হাজীদের মত মাল-সামান নিয়ে সর্বাত্মক প্রস্তুতিসহ তাদের সঙ্গে রওয়ান হয়।"[৯২]

ইবলিসের এই কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কুরআনের নিম্নের এই আয়াতটিও সমর্থণ করে:

{ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (১৬) ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ} [الأعراف: ১৬، ১৭]

অর্থ: "সে বলল, 'আপনি আমাকে যে কারণে পথভ্রষ্ট করেছেন, সে কারণে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আপনার সোজা পথে বসে থাকব। তারপর অবশ্যই

---

[৯১] সহীহ মুসলিম ২৫৪।

[৯২] ইগাছাতুল লাহফান ১ম খন্ড ৯৪ পৃষ্ঠা।

তাদের নিকট উপস্থিত হব, তাদের সামনে থেকে ও তাদের পেছন থেকে এবং তাদের ডান দিক থেকে ও তাদের বাম দিক থেকে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না’।”[৯৩]

ইবনে জারীর বলেন, এ আয়াতে প্রমাণিত হলো যে, শয়তান সব রাস্তায় ওঁৎ পেতে বসে থাকে না। বরং ‘সীরাতে মুস্তাকীম’ অর্থাৎ আল-াহকে পাওয়ার সহজ, সরল ও সঠিক পথেই শুধুমাত্র বসে থাকে। আর হাজীগণ হজ্জের উদ্দেশ্যে যখন তালবিয়া পড়তে পড়তে মক্কায় রওয়ানা হয় তখন এটিও একটি ‘সীরাতে মুস্তাকীম’। মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে:

عن سبرة بن أبي فاكه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد له بطريق الإسلام فقال له أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك قال فعصاه فأسلم ثم قعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول قال فعصاه فهاجر قال ثم قعد له بطريق الجهاد فقال له هو جهد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال قال فعصاه فجاهد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة أو قتل كان حقا على الله عز و جل أن يدخله الجنة وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة أو وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة

অর্থ: “সাবুরা ইবনু আবী ফাকেহা (রা:) থেকে বর্নিত: তিনি বলেন যে, রাসূলুল-াহ (সা:) বলেছেন ‘নিশ্চয়ই শয়তান বনী আদমের সব রাস্তায় ওঁৎ পেতে বসে থাকে। প্রথমে চেষ্টা করে ইসলাম গ্রহণে বাঁধা দিতে। সে বলে, তুমি ইসলাম গ্রহণ করবে? তুমি তোমার ধর্ম ত্যাগ করবে? তোমার বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করবে? এরপরও যদি কেউ ইসলাম গ্রহণ করে ফেলে তখন শয়তান হিজরত করার পথে বাঁধা সৃষ্টি করে। সে বলে, তুমি কি হিজরত করবে? তুমি তোমার বাড়ি-ঘর, ক্ষেত-খামার ত্যাগ করবে? আরে হিজরত করা তো ঘোড়ার দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার মত। এতদসত্ত্বেও যদি লোকটি হিজরত করে তাহলে সে জিহাদের পথে বাঁধা সৃষ্টি করে। সে বলে, আরে জিহাদতো জান-মাল ব্যয় করার নাম, যুদ্ধ করার নাম, তুমি যুদ্ধে গেলে তুমি নিহত হবে, তোমার স্ত্রী বিধবা হবে, অন্যকে বিয়ে করবে, তোমার ধন-সম্পদ বন্টন হয়ে যাবে। এতদসত্ত্বেও যখন লোকটি জিহাদে বের হয়ে যায়। এবং লোকটি মারা যায় তখন আল-াহর (সুব:)

[৯৩] সুরা আ'রাফ ১৬-১৭।

এর দায়িত্ব হয়ে যায় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো। অথবা যদি সে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যায় তখন আল-াহর দায়িত্ব হয়ে যায় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো। আর যদি সে ডুবে যায় তখন আল-াহর দায়িত্ব হয়ে যায় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো। অথবা যদি সে বাহন থেকে পড়ে মারা যায় তখন আল-াহর দায়িত্ব হয়ে যায় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো।”[৯৪]

একারণেই আল-াহ (সুব:) মানুষকে শয়তান থেকে সাবধান করেছেন। পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন পর্যায়ে ইরশাদ হয়েছে:

}إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ{ [فاطر: ৬]

অর্থ: “ নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে শত্রু হিসেবে গণ্য কর। সে তার দলকে কেবল এজন্যই ডাকে যাতে তারা জ্বলন্ড় আগুনের অধিবাসী হয়।”[৯৫]

অপর আয়াতে বলা হয়েছে:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} [النور: ২১]

অর্থ: “হে মুমিনগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করো না। আর যে শয়তানের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করবে, নিশ্চয় সে অশ-ীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেবে।”[৯৬]

{ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ} [الأعراف: ২৭]

অর্থ: “হে বনী আদম, শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ড় না করে, যেভাবে সে তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বের করেছিল; সে তাদের পোশাক টেনে নিচ্ছিল, যাতে সে তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখাতে পারে। নিশ্চয় সে ও তার দলবল তোমাদেরকে দেখে যেখানে তোমরা তাদেরকে দেখ না।”[৯৭]

শয়তান থেকে বাঁচার উপায়

[৯৪] মুসনাদে আহমদ ১৬০০০।
[৯৫] সুরা ফাতের ৬।
[৯৬] সুরা নূর ২১।
[৯৭] সুরা আল আ'রাফ ২৭।

শয়তান থেকে বাঁচার জন্য প্রতিটি মুমিনকে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। কেননা শয়তান এক মারাত্মক শত্রু। সেই আদম (আ:) এর যুগ থেকে শুরু করে তার গোটা জীবন ব্যয় করেছে মানুষকে ধংস করার জন্য। দীর্ঘ জীবনের মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার ও গোমরাহ করার সব অভিজ্ঞতা তার আছে। অপর দিকে মানুষের বয়স সীমিত। শয়তানের চক্রান্ত এবং ষড়যন্ত্র সম্পর্কে একটু অভিজ্ঞতা হতেই তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। তাই শয়তান থেকে বাঁচতে হলে আল-াহর কাছে আশ্রয় চাওয়া ও শয়তানের অনিষ্ট থেকে পানাহ চাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আর আল-াহ যাকে পানাহ দিবেন শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। একারণেই আল-াহ (সুব:) বলেছেন:

{فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (৯৮) إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (৯৯) إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ} [النحل: ৯৮ – ১০০]

অর্থ: "সুতরাং যখন তুমি কুরআন পড়বে তখন আল-াহর কাছে বিতাড়িত শয়তান হতে পানাহ চাও। নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের রবের উপর তাওয়াক্কুল করেছে, তাদের উপর শয়তানের ক্ষমতা নেই। তার ক্ষমতা তো কেবল তাদের উপর, যারা তাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে এবং যারা আল-াহর সাথে শরীক করে।"[৯৮] আল-াহ (সুব:) আরও বলেন:

[وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [الأعراف: ২০০}

অর্থ: " আর যদি শয়তানের পক্ষ হতে কোন প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে তুমি আল-াহর আশ্রয় চাও। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"[৯৯] আল-াহ (সুব:) আরও বলেন:

}وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ (৯৭) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ}
[المؤمنون: ৯৭، ৯৮]

অর্থ: " আর বল, 'হে আমার রব, আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার কাছে পানাহ চাই'। আর হে আমার রব, আমার কাছে তাদের উপস্থিতি হতে আপনার কাছে পানাহ চাই।"[১০০] আল-াহ (সুব:) আরও বলেন:

[৯৮] সুরা নহল ৯৮-১০০।
[৯৯] সুরা আল আ'রাফ ২০০।
[১০০] সুরা মু'মিনূন ৯৭-৯৮।

}قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (১) مَلِكِ النَّاسِ (২) إِلَهِ النَّاسِ (৩) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (৪) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (৫) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (৬)} [الناس: ১ – ৬]

অর্থ: "বল, 'আমি আশ্রয় চাই মানুষের রব, মানুষের অধিপতি, মানুষের ইলাহ-এর কাছে, কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে, যে দ্রুত আত্ম গোপন করে। যে মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দেয় জিন ও মানুষ থেকে।"[১০১]

এজন্য সবসময় আল-াহর যিকিরে মশগুল থাকা। কোন একটি মূহুর্তও যেন আল-াহর যিকির থেকে গাফিল হয়ে না যায়। কেননা যারা আল-াহর যিকির থেকে গাফেল হয়ে যায় শয়তান তাদেরকেই আক্রমন করার সুযোগ পায়। এ প্রসঙ্গে কুরআনুর কারীমে ইরশাদ হয়েছে:

{وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ} [الزخرف: ৩৬]

অর্থ:" আর যে পরম করুণাময় আল-াহর যিকির থেকে বিমুখ থাকে আমি তার জন্য এক শয়তানকে নিয়োজিত করি, ফলে সে হয়ে যায় তার সঙ্গী।"[১০২]

আরাফাতের ময়দানের দু'আ

আরাফাতের ময়দানে বেশি বেশি 'লা ইলাহা ইল-াল-াহ' পাঠ করুন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلى : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অর্থ: "রাসূলুল-াহ (সা:) ইরশাদ করেন, সবচেয়ে উত্তম দু'আ আরাফাতের ময়দানের দু'আ, এবং সবচেয়ে উত্তম কথা যা আমি বলেছি এবং আমার পূর্বের সকল নাবীগণ বলেছেন: তা হচ্ছে لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ উচ্চারণ: "লা ইলাহা ইল-াহু ওহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুলি- শাইইন কাদীর।"

অর্থ: "আল-াহ ব্যতিত আর কোন (হক্) ইলাহ নেই। তিনি এক ও একক তার কোন শরীক নেই। সকল ক্ষমতার মালিক কেবল মাত্র তিনিই। সকল প্রশংসার মালিক তিনিই। তিনি সব কিছুর উপর শক্তিশালী।"[১০৩]

[১০১] সুরা নাস ১-৬।
[১০২] সুরা যুখরুফ ৩৬।
[১০৩] সুনানে তিরমিজী ৩৬৫৫।

এটিই আরাফাতের ময়দানে পড়ার জন্য সবচেয়ে উত্তম দু'আ।

মুযদালাফায় রাত্রি যাপন

আরাফাতের ময়দানে সূর্যাস্তের পরে মুযদালাফায় যাওয়ার জন্য আপনার নির্দিষ্ট মুআ'লি-মের গাড়িতে অথাবা ভাড়ার গাড়িতে অথবা পায়ে হেঁটে মুযদালাফার দিকে যাত্রা শুরু করুন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ} [البقرة: ১৯৮]

অর্থ: " সুতরাং যখন তোমরা আরাফাহ থেকে বের হয়ে আসবে, তখন 'মাশআরে হারামে'র নিকট আল্লাহকে স্মরণ কর এবং তাকে স্মরণ কর যেভাবে তিনি তোমাদেরকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। যদিও তোমরা এর পূর্বে অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।"[১০৪]

মুযদালাফার মাঠে পৌঁছার পরে বাথরুম, পানি কাছাকাছি দেখে যেখানে খালি পান সেখানে চাঁদর বিছিয়ে তারপরে অজু-এস্তেঞ্জা শেষে মাগরিব ও এশার জন্য একবার আযান দিন। তারপর মাগরিবের একামত দিয়ে মাগরিবের ফরজ সালাত আদায় করুন তারপর আবার একামত দিয়ে এশার সালাত 'কসর' আদায় করুন। মাগরিব এশার মাঝখানে কোন সুন্নত বা নফল পড়া যাবে না। সালাত শেষে পরের দিন মিনায় 'জমরাতুল আকাবায়ে' (বড় শয়তানকে) পাথর মারার জন্য সাতটি কংকর এখান থেকে সংগ্রহ করুন। ইচ্ছে করলে পুরা জামরাতের জন্য মোট ৭০ টি পাথর এখান থেকে নিতে পারেন। এখান থেকেই সব পাথর নিতে হবে এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। যেকোন জায়গা থেকে পাথর সংগ্রহ করা যেতে পারে। এবারে ইচ্ছে করলে তাসবীহ, তাহলীল, তাওবা, ইস্তেগফার ও নফল সালাতে মশগুল হতে পারেন। আর ইচ্ছে করলে ঘুমাতেও পারেন। এখানে রাত্রিযাপন করাই হজ্জের কাজ অন্য কোন খাস ইবাদত নেই। সারা রাত্রি জাগরণ করার কোন সহীহ প্রমাণ নেই। মুযদালাফার মাঠের যে কোন জায়গায় অবস্থান করা যাবে। তবে 'ওয়াদিয়ে মুহাছ্ছার' (মুযদালাফা ও মিনার মধ্যবর্তী স্থান) ব্যতিত। এখানে ফজরের সালাত আদায় করে সূর্যোদয়ের পূর্বে খুব পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পরে মিনার দিকে রওয়ান করুন।

মিনার আমল সমূহ

[১০৪] সুরা বাকারা ১৯৮।

মুযদালাফা থেকে জিলহজ্জের ১০ তারিখ 'ইয়াওমে নাহার' সকালে প্রথমে মিনায় গিয়ে আপনার নির্ধারিত তাবুতে মাল-সামান রাখুন। অজু-এস্তেঞ্জার প্রয়োজন হলে তা সেরে নিন। নাস্তা খাওয়ার পরে আপনার চারটি কাজ করতে হবে। ১. জামারাতুল আকাবা (বড় শয়তান) কে পাথর মারা। ২. কুরবানী করা। ৩. মাথা মুণ্ডানো বা ছাটানো। ৪. তাওয়াফুল ইফাদাহ (ফরজ তাওয়াফ) করা।

পাথর মারার জন্য আপনার গ্রুপ লিডারের পরামর্শ অনুযায়ী রওয়ানা হোন। ১০ তারিখ সূর্যোদয়ের থেকে যোহরের সালাতের সময় হওয়ার আগ পর্যন্ত শুধু জামারাতুল আকাবায় বা বড় শয়তানকে সাতটি কংকর মারতে হবে। ছোলা বুট অথবা খেজুরের বিচির মত সাতটি পাথর একটি একটি করে মারতে হবে। প্রতিটি পাথর মারার সময় "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার" বলে মনে মনে এই নিয়ত করে যে, আমি শয়তানকে ও শয়তানের অনুসারীদেরকে অপমান করার জন্য এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই পাথর নিক্ষেপ করছি। মা'জুর লোকদের জন্য (অসুস্থ, বৃদ্ধ, দূর্বল) সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত পাথর মারা জায়েজ আছে। পাথর মারার পরে তামাত্তু' ও কিরান হজ্জকারীদের জন্য কুরবানী করতে হবে। বর্তমানে কুরবানীর টাকা ব্যাংকে জমা দেয়া যায়। আবার ইচ্ছে করলে নিজেরা পশু কিনে কুরবানী করা যায়। যারা নিজেরা কুরবানী দিতে চান তারা পাথর মেরে সামনের দিকে গিয়ে গাড়িতে কুরবানীর পশুর বাজারে চলে যান। ওখানে উট, গরু, দুম্বা, ভেড়া, ছাগল সহ সব রকমের বিভিন্ন দামের পশু পাওয়া যায়। আপনি আপনার সাধ্যমত পছন্দের পশুটি ক্রয় করে ওখানেই নির্ধারিত ব্যবস্থাপনায় যবাই করে নিন। তারপরে মাথার চুল কাটুন বা মুণ্ডিয়ে ফেলুন। এবার আপনি ছোট হালাল হলেন। অর্থাৎ ইহরাম অবস্থায় যা কিছু নিষিদ্ধ হয়েছিল এখন তা সবকিছুই জায়েজ হয়ে যাবে। তবে স্ত্রী ব্যবহার করা তাওয়াফে ইফাদাহ না করা পর্যন্ত জায়েজ হবে না। যদি সম্ভব হয় তাহলে আজকেই তাওয়াফে ইফাদাহ (ফরজ তাওয়াফটি) সেরে ফেলুন। নতুবা ১১ তারিখ অথবা ১২ তারিখ পর্যন্ত যে কোন সময়ে করতে পারেন। এজন্য কোন দম দিতে হবে না। কিন্তু এর পরে বিলম্ব করলে দম দিতে হবে। এই তাওয়াফ করার পরে আপনি পূর্ণ হালাল হলেন। এখন আপনার জন্য স্ত্রী ব্যবহার করাও হালাল হয়ে গেল। এই তাওয়াফ না করা পর্যন্ত স্ত্রী ব্যবহার করা হালাল হবে না। করে ফেললে একটি উট কুরবানী দিতে হবে।

(উল্লেখ্য, এই চারটি কাজ হানাফী মাযহাব মতে ধারাবাহিকভাবে করা ওয়াজিব। অর্থাৎ প্রথমে পাথর মারা তারপরে কুরবানী দেওয়া তারপর মাথা মুণ্ডানো বা ছাটানো তারপর ফরজ তাওয়াফ করা। যদি আগে পরে হয়ে যায়

যেমন: কুরবানী করার আগে মাথা মুন্ডানো বা মাথা মুন্ডানোর আগে ফরজ তাওয়াফ করা অথবা পাথর মারার আগে কুরবানী করা। এমতাবস্থায় ওয়াজিব তরক করার কারণে তার একটি ছাগল/ ভেড়া/ দুম্বা দম দিতে হবে। কিন্তু অন্যান্য ইমামদের মতে এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব না। সুতরাং আগে পরে করলে কোন অসুবিধা নেই। দম দেওয়ারও কোন প্রয়োজন নেই।)

এবার আপনি আপনার মিনার তাবুতে ফিরে যান। মিনাতে রাত্রি যাপন করুন। তাসবীহ, তাহলীল, যিকির, আযকার, তওবা, ইস্তেগফার ও দূরূদ ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকুন।

জিলহজ্জের ১১ তারিখ

জিলহজ্জের **১১** তারিখের সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর থেকে সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যে কোন সময়ে তিনটি জামারাতে পূর্বের নিয়মানুযায়ী ৭টি করে কংকর নিক্ষেপ করুন। প্রথমে ‘জামরাতুস সুগরা’ (ছোট শয়তানকে) একটি একটি করে ৭টি পাথর নিক্ষেপ করুন। তারপরে একটু দুরে সরে গিয়ে দু’হাত তুলে আল-াহর কাছে নিজের ইচ্ছামত দু’আ করুন। তারপরে সামনে অগ্রসর হোন এবং ‘জামরাতুল উসত্বা’ (মধ্যম শয়তানকে) পূর্বের নিয়মানুযায়ী ৭টি পাথর নিক্ষেপ করুন। এবারেও একটু দূরে সরে গিয়ে দু’হাত তুলে নিজের ইচ্ছামত আল-াহর কাছে দু’আ করুন। আরও সামনে অগ্রসর হোন। এবারে ‘জামরাতুল আকাবা’ (বড় শয়তানকে) পূর্বের নিয়মানুযায়ী ৭টি পাথর নিক্ষেপ করুন। জামরাতুল আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করার পরে দ্রুত সরে পড়ুন। এখানে কোন দু’আ নেই।

এবারে আবার মিনার তাবুতে চলে যান। মিনার তাবুতেই রাত্রি যাপন করুন।

জিলহজ্জের ১২ তারিখ

জিলহজ্জের **১২** তারিখ পূর্বের দিন (**১১** তারিখ) এর ন্যায় আজকেও সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর তিন জামারাতে পূর্বের নিয়মানুযায়ী পাথর নিক্ষেপ করুন। এরপর ইচ্ছে করলে মিনার থেকে সবকিছু নিয়ে সূর্য ডোবার আগে মক্কার উদ্দেশ্যে মিনা ত্যাগ করুন। অবশ্য মিনা ত্যাগের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে গিয়ে যদি রাত্র হয়ে যায় তাতে কোন অসুবিধা নেই। আর যদি কেউ আজকের রাত্র (১২ তারিখের দিবাগত রাত্র) মিনায় অবস্থান করে এবং সুবহে সাদেক হয়ে যায় তাহলে তাকে **১৩** তারিখে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পর

পূর্বের নিয়মানুযায়ী তিন জামারায় ৭টি করে **২১**টি কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} [البقرة: ২০৩]

অর্থ: “আর আল-াহকে স্মরণ কর নির্দিষ্ট দিনসমূহে। অতঃপর যে তাড়াহুড়া করে দু’দিনে চলে আসবে। তার কোন পাপ নেই। আর যে বিলম্ব করবে, তারও কোন অপরাধ নেই। (এ বিধান) তার জন্য, যে তাকওয়া অবলম্বন করেছে। আর তোমরা আল-াহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় তোমাদেরকে তাঁরই কাছে সমবেত করা হবে।”[১০৫]

এর মাধ্যমে আপনার মিনার আমল শেষ হলো।

মক্কায় প্রত্যাবর্তণ

এখন আপনি মক্কায় গিয়ে নিজ ভাড়া করা বাড়িতে অবস্থান করুন। হারাম শরীফে সালাত আদায় করুন, সুযোগ হলে বেশি বেশি তাওয়াফ করুন। জেনে রাখবেন, মসজিদুল হারামে প্রবেশ করার পরে ‘তাহিয়্যাতুল মসজিদের’ পরিবর্তে তাওয়াফ করাই উত্তম। তবে যদি তাওয়াফ করার সুযোগ না হয় তাহলে দু’রাকাআত ‘তাহিয়্যাতুল মসজিদ’ আদায় করে নিন।

বারবার ওমরাহ করা

অনেকে এই সুযোগে বারবার ওমরাহ করে। সকালে একটা, বিকালে একটা, কেউ চল্লিশটা, কেউ পঞ্চাশটা আবার কেউ ওমরাহর সেঞ্চুরী করে থাকে। এতে যাদের জরুরী তাওয়াফ রয়ে গেছে তাদের যেমন কষ্টের কারণ হয় তেমনিভাবে এটি রাসূল (সা:) এর সুন্নাহর পরিপন্থীও বটে। কেননা রাসূলুল-াহ (সা:) এক সফরে একাধিক ওমরাহ করেছেন বলে কোন প্রমাণ নেই বরং তিনি যখন বাহিরের থেকে মক্কায় প্রবেশ করতেন তখনই কেবল ওমরাহ করতেন। মক্কায় থাকা অবস্থায় হারামের বাইরে গিয়ে আবার ইহরাম বেঁধে এসে ওমরাহ করেছেন এর কোন প্রমাণ নেই। রাসূলুল-াহ (সা:) এর যুগে কোন সাহাবী এমন আমল করেছেন তারও কোন প্রমান নেই। শুধু মাত্র আয়েশা (রা:) রাসূলুল-াহ (সা:)

---

[১০৫] সুরা বাকারা ২/২০৩।

এর সাথে বিদায় হজ্জের সময় ওমরাহর উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধে ছিলেন কিন্তু হায়েজ এসে যাওয়ার কারণে তিনি ওমরাহ করতে পারেন নাই। বরং তাকে ঐ একই ইহরামে হজ্জে কিরান করার জন্য আদেশ দিলেন। আয়েশা (রা:) আমলের প্রতিযোগীতায় অন্যান্য সাথি-সঙ্গিদের চেয়ে একটু পিছনে পরে যাওয়ায় মনে মনে কষ্ট অনুভব করলেন। কারণ সকলেই স্বতন্ত্র ভাবে ওমরাহও করলো হজ্জও করলো। আর তিনি হজ্জের সঙ্গে মিলিয়ে ওমরাহ করলেন। একারণে রাসূলুল-াহ (সা:) আয়েশা (রা:) এর ভাই আবদুর রাহমানকে নির্দেশ দিলেন যে, হারামের সীমানার বাহিরে 'তানঈম' নামক জায়গা থেকে ইহরাম বেঁধে এসে ওমরাহ আদায় করার জন্য। এখান থেকেই সুচনা হলো 'তানঈম' থেকে ওমরাহ করার প্রচলন। সুতরাং কেউ যদি আয়েশা (রা:) এর মত কোন কারণে হজ্জের আগে ওমরাহ করতে না পারে, তাহলে তার জন্য হজ্জের পরে ওমরাহ করতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু যারা মক্কায় এসে হজ্জের পূর্বে একবার ওমরাহ করে ফেলেছে তাদের জন্য বারবার 'তানঈম' বা আয়েশা মসজিদে গিয়ে ওমরাহ করার কোন প্রমাণ নেই। বরং ঐ পর্যন্ত যেতে আসতে যে পরিমান সময় ব্যয় হবে সে সময়টাকে নফল তাওয়াফ করার পেছনে ব্যয় করা অনেক ভাল। বারবার ওমরাহ করা যদি কোন বেশী সওয়াবের কাজ হতো তাহলে রাসূলুল-াহ (সা:) নিজেও অনেক ওমরাহ করতেন। কিন্তু না, তিনি তা করেননি। বরং তিনি সারা জীবনে সর্বমোট ৪টি ওমরাহ করেছেন। ১. ওমরাহতুল হুদাইবিয়া (মক্কার কাফেরদের বাধার কারণে হুদাইবিয়া থেকেই ফিরে যেতে হয়েছিল)। ২. ওমরাহতুল কাযা।(পরবর্তী বছর হুদাইবিয়ার কাযা ওমরাহ) ৩. ওমরাহতুল জিই'ররানাহ ।(যেখানে হুনাইন যুদ্ধের গনিমতের মাল বণ্টন করা হয়েছিল) ৪. বিদায়ী হজ্জের সাথে।

এতদসত্ত্বেও কেউ যদি মক্কা থাকা অবস্থায় ওমরাহ করতে চায় তাহলে তাকে হারামের সীমানার বাহিরে গিয়ে ইহরাম বেঁধে আসতে হবে। সবচেয়ে নিকটে যেই জায়গাটি তার নাম হলো 'তানঈম'। যেখান থেকে আয়েশা (রা:) ওমরাহ করেছিলেন। একারণে বর্তমানে ওখানে যে মসজিদটি রয়েছে সেটি 'আয়েশা মসজিদ' নামে পরিচিত। হারাম শরীফ থেকে ওখানে যাওয়ার জন্য সব রকমের গাড়ি পাওয়া যায়। আপনি ইচ্ছে করলে যে কোন সময়ে ওখানে গিয়ে পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী ইহরাম বেঁধে ওমরাহ করতে পারেন। এভাবে মক্কায় সময় কাটাতে থাকেন। মক্কা থেকে বিদায়ের অপেক্ষায় থাকুন। যেদিন মক্কা থেকে বিদায় হবেন তারপূর্বে বিদায়ী তাওয়াফ করে নিন। বিদায়ী তাওয়াফ করা ওয়াজিব। এতে ইজতিবা, রমল, সায়ী নেই। বিদায়ী তাওয়াফ শেষে মাকামে

ইবরাহীমের পিছনে দুই রাকাআত সালাত আদায় কর"ন। মূলতাযাম, কাবার দরজা ও হাতীমে দু'আ কর"ন। যমযমের পানি পান করে দু'আ কর"ন।

উলে-খ্য যে, বিদয়ী তাওয়াফ করার পরেও যদি হারাম শরীফে অবস্থান করেন এবং সালাত আদায়ের সময় হয়ে যায় তাহলে সালাত আদায় করে নিবেন এতে বিদায়ী তাওয়াফ পূনরায় করার কোন প্রয়োজন নেই। এভাবে আপনার মক্কার কাজ শেষ হলো। এখন আপনি হয়তো দেশে চলে যাবেন অথবা মদীনায় না গিয়ে থাকলে মদিনায় চলে যান।

চতুর্থ অধ্যায় : হাজীদের ভুল-ভ্রান্তি সমূহ

ইহরামের ভুল

১. কোন কোন হাজী সাহেব বিমানে উঠার পূর্বে ইহরামের কাপড় লাগেজে দিয়ে দেন। তারা জানেন না যে, এই লাগেজের সাথে জেদ্দা বিমানবন্দরে অবতরণ করা ছাড়া মুলাকাত হবে না। বিমানে বসে ইহরামের কাপড় না থাকায় অথবা অজ্ঞতার কারণে অথবা অবহেলার কারণে ইহরাম বিহীন অবস্থায় মীকাত অতিক্রম করে যায়। এটা মারাত্মক ভুল। এতে 'দম' ওয়াজিব হয়।

২. অনেক হাজী সাহেব নিজ বাড়ি থেকে অথবা এয়ারপোর্ট থেকেই ইহরাম বেঁধে তালবিয়া পড়ে বিমানে উঠেন। এটা যদিও সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ। তবে এত আগে ইহরাম বাঁধা বিশুদ্ধ মতানুযায়ী মাকরূহ। তবে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না।

৩. মহিলাদের ইহরামের জন্য বিশেষ পোষাক বা বিশেষ কোন রঙ্গের পোশাককে জর"রী মনে করা। অথচ মহিলাদের স্বাভাবিক যে কোন রঙ্গের পোষাকই যথেষ্ট।

৪. মহিলাদের ইহরাম অবস্থায় চেহারা খোলা রাখা। বিশেষ করে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্ডিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, তুর্কি এসব মহিলারা হজ্জ করতে গিয়ে পর্দা বিধানকে ভুলে যায়। অথচ পর্দা করা ফরজ। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী যদিও ইহরাম অবস্থায় মেয়েলোকের চেহাড়া ঢাকা নিষেধ তথাপিও পর্দার

বিধানকে সকলেই গুর”ত্ব দিয়েছেন। এজন্য মহিলাগণ মাথায় বিশেষ ধরনের ক্যাপ পরে তার উপর দিয়ে নেকাব ঝুলিয়ে দিতে পারেন। তাহলে পর্দার বিধানও ঠিক থাকে আবার চেহারায়ও কাপড় লাগবে না।

৫. অনেক মহিলারা মীকাত অতিক্রম করার সময় হায়েজ অবস্থায় থাকার কারণে ইহরাম বাঁধে না। তাদের ধারণা হায়েজ অবস্থায় ইহরাম বাধাঁ যায় না। ফলে তারা ইহরাম ছাড়াই মীকাত অতিক্রম করে। এটা ভুল। কেননা হায়েজ অবস্থায় ইহরাম বাঁধা যাবে এবং তাওয়াফ ছাড়া সকল কাজই করবে। হায়েজ থেকে পবিত্র হওয়ার পরে তাওয়াফ করবে। ফরজ তাওয়াফ না করা পর্যন্ত হজ্জ পূর্ণ হবে না। কারো যদি হায়েজ শুর” হয়ে যায় অপর দিকে টিকিটের কারণে অথবা সাথী-সঙ্গীরা ও মাহরাম চলে যাচ্ছে একারণে মক্কায় থাকা সম্ভব না হয় তাহলে রক্ত বের হওয়ার স্থানকে তুলা ও কাপড়-চোপড় দিয়ে ভালভাবে বন্ধ করবে। তারপরে তাওয়াফ করে চলে যাবে। আর যদি বিদায়ী তাওয়াফ করার আগে এ অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহলে তাওয়াফ না করেই চলে যাবে।

৬. অনেক হজ্জ ওমরাহকারী মনে করেন যে, ইহরামের সময় যে কাপড় পরিধান করেছে সে কাপড় পরিবর্তণ করা যাবে না। যদিও ময়লা ও দুর্গন্ধ হয়ে যায়। এটা ভুল। বরং ইহরামের কাপড় ময়লা হয়ে গেলে অনুরূপ অন্য ইহরামের কাপড় দ্বারা পরিবর্তণ করা যাবে। এমনিভাবে সেন্ডেল পরিবর্তণ করার প্রয়োজন হলে পরিবর্তণ করতে পারবে। এমনিভাবে গোসলও করতে পারবে।

৭. ইহরাম বাঁধার পর উচ্চস্বরে নিয়ত করা। এটিও একটি ভুল। কেননা নিয়ত বলা হয় ‘মনের সংকল্পকে’। সুতরাং উচ্চস্বরে নিয়ত করা জর”রী না।

তাওয়াফের ভুল সমূহ

১. অনেক হাজী সাহেব হাজরে আসওয়াদ এর কাছে পৌঁছানোর পূর্বেই তাওয়াফ শুর” করেন। এটা ভূল কেননা হাজরে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ শুর” করা অপরিহার্য।

৪. সাত চক্করেই ‘রমল’ করা ইসলাম বিরোধী। প্রথম তিন চক্করে ‘রমল’ করা সুন্নত।

৫. হাজরে আসওয়াদ পাথরকে চুমু দিতে গিয়ে অতিরিক্ত ভিড় করা এবং কখনো কখনো এনিয়ে আপোষে মারামারি করা।

৬. তাওয়াফে প্রত্যেক চক্করের জন্য আলাদা আলাদ দুআ’ নির্ধারণ করা। কেননা এটি রাসূলুল-াহ (সা:) থেকে প্রমানিত নয়। বরং কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমানিত যেকোন দুআ করা যাবে।

৭. তাওয়াফ করার সময় দলবদ্ধভাবে বা একাকীভাবে উচ্চকণ্ঠে দুআ’ ও যিকর করা। এতে অন্যান্য তাওয়াফকারীদের একাগ্রতা বিনষ্ট হয়।

৮. কাবা শরীফের সমস্ত র”কন (কোণা) স্পর্শ করা এবং সমস্ত দেয়ালে চুম্বন করা ও স্পর্শ করা। কেননা রাসূলুল-াহ (সা:) থেকে শুধুমাত্র হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা এবং র”কনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করার কথা প্রমানিত আছে।

৯. মাকামে ইবরাহীমের পিছনে সালাত আদায় করার জন্য ভিড় করা। এটা সুন্নাতের বিপরীত। সুযোগ হলে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে সালাত আদায় করা উত্তম নতুবা ‘মসজিদুল হারামে’র যে কোন জায়গায় সালাত আদায় করা জায়েজ।

১০. কখনো কখনো হাজী সাহেবগণ র”কনে ইয়ামানীকে ছুতে না পারলে হাজরে আসওয়াদের মত তার দিকে ইশারা করে এবং ‘আল-াহু আকবার’ বলে। এটা একটি ভুল। কারণ, সহীহ দলীলের ভিত্তিতে র”কনে ইয়ামানীকে শুধুমাত্র স্পর্শ করাই প্রমানিত হয়। ইশারা করার কথা প্রমানিত হয় না। হ্যা! যদি হাজরে আসওয়াদ পাথরে স্পর্শ করতে না পারে তাহলে ইশারা করবে এবং ‘আল-াহু আকবার’ পাঠ করবে।

সায়ী সম্পর্কিত ভুল সমূহ

১. সাফা থেমে মারওয়া আবার মারওয়া থেকে সাফা পর্যন্ত একবার সায়ী মনে করা। এটা ভুল। বরং সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত গেলে একবার সায়ী হবে। আবার মারওয়া থেকে সাফা পর্যন্ত গেলে দুইবার হবে। এভাবে সাফা থেকে শুর” করে মারওয়া গিয়ে শেষ হবে।

২. প্রত্যেক সায়ীর জন্যে আলাদা আলাদা দুআ’ নির্দিষ্ট করা। যেমন কিছু কিছু বইতে দেখা যায়। বরং এই ক্ষেত্রে যতটুকু রাসূলুল-াহ (সা:) থেকে প্রমানিত আছে ততটুকু পড়বে। এবং নিজের ইচ্ছামত অন্যকোন দুআ’ পাঠ করবে। কোন দুআ’ নির্দিষ্ট করবে না। কারণ রাসূলুল-াহ (সা:) যা নির্দিষ্ট করেননি তা শরীয়তে নির্দিষ্ট করার অধিকার কারো নেই।

৩. সায়ীর সময় একজন দলনেতা উচ্চস্বরে বই বের করে ঐ দুআ’গুলো পড়তে থাকেন। বাকিরা পিছন পিছন উচ্চস্বরে উচ্চারণ করতে থাকেন এটা বিদআত।

৪. সাফা-মারওয়ার সায়ীর সময় অনেক মহিলাগণ পুর”ষের মত দৌড়ান এটা সুন্নত বিরোধী।

৫. কোন কোন হাজীগণ সাফা-মারওয়া সায়ী কালে পুরা সময়টাই দ্রুত হাটেন এটা ঠিক না। বরং শুধুমাত্র সবুজ দুচিহ্নের মধ্যখানে দ্রুত চলা সুন্নত।
৬. সাফা-মারওয়া পাহাড়ে আরোহনকালীন কিবলামূখী হয়ে তিন তাকবীরের সাথে সালাতের ন্যায় দু'হাত উত্তোলন করে কাবাগৃহের দিকে ইংগীত দেয়া বিদআত। এই সময় হাত তুলে দুআ' করার কথা রয়েছে। কিন্তু সালাতের মত করে হাত তোলা এবং কাবা ঘরের দিতে ইংগীত করার কোন দলীল নেই।

'আরাফাতে অবস্থান' সর্ম্পকীয় ভুলসমূহ

১. কোন কোন হাজী সাহেবগণ আরাফাতের ময়দানের বাহিরে অবতরণ করে এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেখাহে অবস্থান করে মুযদালাফার উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তণ করে। এটা এমন ভুল যার কারণে হজ্জ বাতিল হয়ে যায়।
২. অনেক হাজী সাহেবগণ সূর্য না ডুবার পূর্বে আরাফাতের ময়দান থেকে বেরিয়ে মুযদালিফায় যান। এটিও মারাত্মক ভুল। এই ভূলের জন্য দম বা কুরবানী ওয়াজিব।
৩. অনেকের ধারনা যে, জাবালে রাহমাত নামক পাহাড়ে আরোহন করা উত্তম। এটি ভ্রান্ত ধারনা।
৪. দুআ'র জন্য আরাফাতে 'জাবালে রহমাত' কে অনেক হাজী সাহেব কিবলা বানিয়ে থাকেন। অথচ এ ব্যাপারে কাবাঘর কে কিবলা বানানোই সুন্নত।
৫. অনেকে পাহাড়ে চড়ে দুআ' করাকে সুন্নত মনে করেন। এটা ভূল।
৬. কোন কোন হাজী সাহেব 'জাবলে রহমত' এর পাথরে বরকতের উদ্দেশ্যে নিজের নাম লেখেন। আবার কেউ সুতা বাঁধেন। আবার কেউ মাটি-পাথর বরকতের জন্য সঙ্গে নিয়ে আসে। এগুলো ভুল।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ হজ্জের শিক্ষা

১.ইহরামের উদ্দেশ্যে অজু-গোসল করার সময় শিক্ষনীয় বিষয়

আপনি যখন ইহরামের উদ্দেশ্যে অজু-গোসল করবেন তখন যেভাবে জাহেরী ময়লা-আবর্জনা থেকে অঙ্গ-প্রতঙ্গকে পরিষ্কার করছেন ঠিক সেভাবে বাতেনী ময়লা-আবর্জণা অর্থাৎ পাপ-পঙ্কিলতা থেকে তওবা করে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে নিবেন। আর মনে মনে ধারণা করবেন মৃত্যুব্যক্তিকে যেভাবে গোসল করানো হয় আমিও যেন সেভাবেই গোসল করছি।..........

২. ইহরামের কাপড় পরিধান করার সময় শিক্ষনীয় বিষয়

আপনি যখন ইহরামের কাপড় পরিধান করবেন তখন খেয়াল করবেন যেভাবে এখন সিলাই করা দামি জামা-কাপড় ত্যাগ করে দু'খানা সাদা চাঁদর পরিধান করছেন ঠিক তেমনিভাবে মৃত্যুর পরেও এভাবেই সাদা চাঁদর পরিধান করে দুনিয়ার সমস্ত মাল-সম্পদ, বাড়ি-গাড়ী, স্ত্রী-সন্তান, আত্নীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সব ত্যাগ করে চিরবিদায় নিতে হবে। ইহরামের কাপড়ে যেমন কোন পকেট নাই

ঠিক তেমনিভাবে মৃত্যুর পরে কাফনের কাপড়েও কোন পকেট থাকবে না। রাসূলুল-াহ (সা:) যথার্থই বলেছেন:

عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقْرَأُ (أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ) قَالَ يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِى مَالِى قَالَ وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلاَّ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ (صحيح مسلم)

অর্থ: "মুতাররিফ (রা:) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন যে, আমি আল-াহর রাসূল (সা:) এর নিকটে এলাম তখন তিনি الهاكم التكاثر (সম্পদ আর্জনের প্রতিযোগীতা তোমাদের গাফেল করে দিয়েছে) পাঠ করছিলেন। এরপর রাসূলুল-াহ (সা:) বললেন: বনি আদম বলে থাকে 'আমার মাল, আমার মাল' (আমার বাড়ি, আমার গাড়ি, আমার নারী, আমার... আমার...)। রাসূল (সা:) বলেন, হে বনী আদম! তুমি কি চিন্তা করে দেখেছ যে, তোমার মাল কী? তোমার মাল তো শুধু তাই যা তুমি পেট ভরে খেয়েছ এবং নষ্ট করেছ অথবা পরিধান করেছ এবং পুরাতন করেছ অথবা সাদাকাহ করে (আল-াহর কাছে) সঞ্চয় করেছ।[১০৬] এছাড়া যা কিছু আছে সবকিছুই মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আপনার মালিকানা থেকে বের হয়ে ওয়ারিসদের মালিকানায় চলে যায়। আর যেই ওয়ারিসদের মালিকানায় চলে যায় তাদের সর্ম্পর্কেও পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:

{يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (৩৪) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (৩৫) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (৩৬) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ} [عبس: ৩৪ – ৩৭]

অর্থ: "সেদিন মানুষ পালিয়ে যাবে তার ভাই থেকে, তার মা ও তার বাবা থেকে, তার স্ত্রী ও তার সন্ড়ান–সন্ড়তি থেকে। সেদিন তাদের প্রত্যেকেরই একটি গুর"তর অবস্থা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ড় করে রাখবে।[১০৭] তাই ইহরামের কাপড় পারিধান করার সময় মৃত্যুর কথা স্মরণ কর"ন। রাসূলুল-াহ (সা:) ইরশাদ করেছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ (النسائي و ابن ماجه)

[১০৬] সহীহ মুসলিম ৭৬০৯।

[১০৭] সুরা আবাসা ৩৪-৩৭।

অর্থ: "আবূ হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আল-াহর রাসূল (সা:) বলেছেন: তোমরা বেশি করে ঐ জিনিষটাকে স্মরণ কর যা তোমাদের সকল আরাম-আয়েশ ও বড় বড় পরিকল্পনার সমাপ্তি ঘটায়।"[১০৮]

বিশিষ্ট সাহাবী আবূ বকর সিদ্দীক (রা:) বলেন:

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ– وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

অর্থ: "প্রতিটি মানুষ তার পরিবাবের মাঝে ঘুম থেকে উঠে সকালে বড় বড় স্বপ্ন ও পরিকল্পনা করে। অথচ মৃত্যু তার জুতার ফিতার চেয়েও নিকটে।"[১০৯]

আল-াহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে বলেন:

{كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ} [آل عمران: ১৮৫]

অর্থ: " প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর 'অবশ্যই কিয়ামতের দিনে তাদের প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে। সুতরাং যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে–ই সফলতা পাবে। আর দুনিয়ার জীবন শুধু ধোঁকার সামগ্রী।"[১১০] আরেক আয়াতে ঘোষণা দিয়েছেন:

{أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ} [النساء: ৭৮]

অর্থ: "তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবে, যদিও তোমরা সুদৃঢ়-মজবুত অট্টালিকায় অবস্থান কর।"[১১১] আরেক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [الجمعة: ৮]

অর্থ:" বল, যে মৃত্যু হতে তোমরা পলায়ন করছো তা অবশ্যই তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে। তারপর তোমাদেরকে অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্পর্কে পরিজ্ঞাত আল-াহর কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে। তারপর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন যা তোমরা করতে।"[১১২] এ আয়াতে আল-াহ (সুব:) বান্দার সকল আমল

[১০৮] সুনানে নাসায়ী ১৮২৩; ইবনে মাজাহ ৪২৫৮।

[১০৯] সহীহ বুখারী ৩৯২৬।

[১১০] সুরা আল ইমরাম ১৮৫।

[১১১] সুরা নিসা ৭৮।

[১১২] সুরা জুমুআ' ৮।

সর্ম্পকে অবহিত করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। অন্য আরেকটি আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

[الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ} [الملك: ٢}

অর্থ: " যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতিশয় ক্ষমাশীল।"[১১৩] যদিও আল-াহ (সুব:) দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছু সর্ম্পকে জ্ঞাত তারপরেও তিনি প্রতিটি মানুষের যাবতীয় আমল লিপিবদ্ধ করার জন্য বিমানের ব-্যাক বক্সের মত রিপোর্ট সংরক্ষণের জন্য কিরামান কাতিবীন নিয়োগ করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (১০) كِرَامًا كَاتِبِينَ (১১) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ} [الانفطار: ১০ – ১২]

অর্থ: " আর নিশ্চয় তোমাদের উপর সংরক্ষকগণ রয়েছে। সম্মানিত লেখকবৃন্দ। তারা জানে, যা তোমরা কর।[১১৪]

এতসব ব্যবস্থা গ্রহনের পরেও কিয়ামতে হিসাব-নিকাশের সময় যদি কেউ কোন কিছুকে অস্বীকার করে তাহলে তার নিজের অঙ্গ-প্রতঙ্গই তার বিরূদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। আল-াহ (সুব:) ইরশাদ করেন:

}الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [يس: ৬৫]

অর্থ: " আজ আমি তাদের মুখে মোহর মেরে দেব এবং তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে ও তাদের পা সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে যা তারা অর্জন করত।"[১১৫] সেদিন শুধু আক্ষেপ করা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

}وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا (৬৭) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا} [الأحزاب: ৬৭، ৬৮

অর্থ: " তারা আরো বলবে, 'হে আমাদের রব, আমরা আমাদের নেতৃবর্গ ও বিশিষ্ট লোকদের আনুগত্য করেছিলাম, তখন তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল'। 'হে আমাদের রব, আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব দিন এবং

[১১৩] সুরা মূলক ২।
[১১৪] সুরা ইনফিতার ১০-১২।
[১১৫] সুরা ইয়াসীন ৬৫।

তাদেরকে বেশী করে লা'নত কর‍ুন'।"[১১৬] আজকে যারা রাজনৈতিকভাবে বিভিন্ন নেতা-নেত্রীর আনুগত্য করতে গিয়ে আর ধর্মীয়ভাবে বিভিন্ন পীর-বুযুর্গের আনুগত্য করতে গিয়ে বিভিন্ন দল, মত ও তরিকার অনুসরণ করছেন তাদের জন্য এ আয়াতটি খুবই গুর‍ুত্বপূর্ন। আপনি কারো উপর দোষ চাপিয়ে রেহাই পাবেন না। এমনকি শয়তানকেও দোষ দিয়ে কোন লাভ হবে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [إبراهيم: ২২]

অর্থ: " আর যখন যাবতীয় বিষয়ের ফয়সালা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে, 'নিশ্চয় আল-াহ তোমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছিলেন সত্য ওয়াদা, তোমাদের উপর আমার কোন আধিপত্য ছিল না, তবে আমিও তোমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছিলাম, এখন আমি তা ভঙ্গ করলাম। তোমাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি, আর তোমরা আমার দাওয়াতে সাড়া দিয়েছ। সুতরাং তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করো না, বরং নিজেদেরকেই ভর্ৎসনা কর। আমি তোমাদের উদ্ধারকারী নই, আর তোমরাও আমার উদ্ধারকারী নও। ইতিঃপূর্বে তোমরা আমাকে যার সাথে শরীক করেছ, নিশ্চয় আমি তা অস্বীকার করছি। নিশ্চয় যালিমদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব'।"[১১৭]

তাই কাফনের কাপড় পরিধান করে সোজা হওয়ার পূর্বে ইহরামের কাপড় পরিধান করে খালিস তাওবা করে আল-াহর (সুব:) সোজা রাস্তা 'সিরাতে মুস্তাকীম' তথা কুরআন-সুন্নাহর পথে ফিরে আসুন।

৩. হজ্জের নিয়ত করে 'তালবিয়া' পাঠ করার সময় শিক্ষনীয় বিষয়

তালবিয়া:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ

উচ্চারণ: "লাব্বাইক আল-াহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইক লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নিঅ'মাতা লাকা ওয়াল মূলক, লা শারীকা লাকা।"

[১১৬] সুরা আহযাব ৬৭-৬৮।
[১১৭] সুরা ইব্রাহীম ২২।

অর্থ: "আমি হাজির, হে আল-াহ! আমি হাজির, আমি হাজির, তোমার কোন শরীক নেই। আমি হাজির, নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নিয়ামত তোমারই, আর সকল ক্ষমতা তোমার, তোমার কোন শরীক নাই।"[১১৮]

তালবিয়ার প্রথমাংশ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ "লাব্বাইক আল-াহুম্মা লাব্বাইক" অর্থ: "হে আল-াহ! আমি তোমার হুকুমের আনুগত্য করার জন্য সবসময় প্রস্তুত"

প্রথম শিক্ষা

এখানে লাব্বাইক বলে আপনি কারো আহবানে সাড়া দিচ্ছেন। যিনি আপনাকে অত্যন্ত আদর করে আহবান করছেন, যিনি আপনাকে শত অন্যায় করা সত্বেও অভয় দিচ্ছেন। কে সেই আহবানকারী? কার ডাকে আপনি সাড়া দিচ্ছেন? তিনি আর কেউ নন, তিনি হচ্ছেন:

{الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (৭৮) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (৭৯) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (৮০) وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (৮১) وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ} [الشعراء: ৭৮ – ৮২]

অর্থ: "'যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনিই আমাকে হিদায়াত দিয়েছেন। আর যিনি আমাকে খাওয়ান এবং পান করান'। আর যখন আমি অসুস্থ হই, তখন যিনি আমাকে আরোগ্য করেন'। আর যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন তারপর আমাকে জীবিত করবেন। আর যিনি আশা করি, বিচার দিবসে আমার ত্র"টি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেবেন'।[১১৯]

দ্বিতীয় শিক্ষা

'লাব্বাইক' শব্দের মধ্যে রয়েছে আন্তরিকতা, মুহাব্বত, ভালবাসা। কারণ মানুষ যাকে ভালবাসে কেবলমাত্র তাকেই এধরণের প্রতিশ্র"তি দিয়ে থাকে। হ্যাঁ! সত্যিই। কারণ যিনি আহবান করছেন তিনিওতো অত্যন্ত আদর করে নিজের অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আহবান করেছেন। কি সুন্দর! সে আহবান। ইরশাদ হচ্ছে:

}وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ } [غافر: ৬০]

[১১৮] সহীহ মুসলিম ২৮৬৮।
[১১৯] সুরা শুআরা ৭৮-৮২।

অর্থ: " আর তোমাদের রব বলেছেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা অহঙ্কার বশতঃ আমার ইবাদাত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"[১২০] এখানে আহবানকারী নিজের পরিচয় দিয়েছেন 'তোমাদের রব' বলে। আর রবের পরিচয় হচ্ছে যিনি সৃষ্টির সুচনা থেকে পূর্ণতায় পৌঁছানো পর্যন্ত জীবনের ধাপে ধাপে যখন যা প্রয়োজন তখন তা নিজের পক্ষ থেকে বুঝে শুনে বিনা দরখাস্তে, বিনা আবেদনে, বিনা মিছিলে, বিনা হরতালে পূরণ করেন। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى.

অর্থ: "মূসা আ. বললেন, আমার রব হচ্ছেন তিনি, যিনি সকল মাখলুকাতকে সৃষ্টি করেছেন এরপর সৃষ্টি থেকে পূর্ণতায় পৌঁছানো পর্যন্ড় প্রয়োজনীয় সকল কিছুর ব্যবস্থা করে থাকেন।"[১২১] সত্যিই তো আমরা যখন মায়ের পেটে ছিলাম তখন আমাদের খাবারের প্রয়োজন ছিল। পৃথিবীর কোন শক্তি সেখানে খাবার পৌঁছাতে সক্ষম ছিল না। সেখানে কান্না-কাটি করেও কোন লাভ ছিল না। তখন তিনিই তো আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন। মায়ের মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ করে দিয়ে নাভির মাধ্যমে খাবারের ব্যবস্থা করলেন। আবার যখন পৃথিবীতে আসার সময় ঘনিয়ে এলো। তখন পৃথিবীতে এসে কি খাব? মানুষের তৈরী করা খাবার খেলে, ঠা"া হলে সর্দি লাগতে পারে, গরম হলে মুখ পুরে যেতে পারে, শক্ত হলে গলায় আটকে যেতে পারে। তাছাড়া বিভিন্ন রোগ জীবানুর আক্রমন থেকে বাঁচার জন্য ঔষধের প্রয়োজন ছিল। তখন তিনিই নিজের পক্ষ থেকে বুঝে শুনে একটু ঘন হলুদ বর্ণের খাদ্য তৈরী করে মায়ের স্তনে সংরক্ষণ করে রাখলেন। যা একেবারে ঠা"াও না একেবারে গরমও না, একেবারে শক্তও না, আবার একেবারে পাতলাও না। যা একদিকে খাবারের কাজ করে, পানির কাজ করে অপরদিকে বিভিন্ন রোগ জীবানুর আক্রমন থেকে বাঁচার জন্য প্রতিশেধক ঔষধ হিসাবে কাজ করে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা যার নাম দিয়েছেন 'শাল দুধ'। তারপরে বাচ্চা আস্তে আস্তে দুধ পান করতে থাকে। কি চমৎকার সেই ব্যবস্থাপনা! দুধ যাতে একবারে বেশী পরিমান বের হয়ে মস্তিষ্কে চলে না যায় সেজন্য দুধের বোঁটার মধ্যে অনেকগুলো ছিদ্র সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এবারে বাচ্চা আস্তে আস্তে বড় হতে লাগল। এখন শুধু দুধ পান করলে চলে না। তাকে খিচুরী খেতে হবে,

[১২০] সুরা গাফের ৬০।
[১২১] সুরা ত্বাহা ৫০।

মুরগীর বাচ্চা, কবুতরের বাচ্চা খেতে হবে। তখন সে মহান রব, আবারও নিজের পক্ষ থেকে বুঝে শুনে বাচ্চার কচি মুখে মুক্তার মতো কতগুলো সাদা দাঁত দিয়ে মুখটাকে ভরে দিলেন। এবারে বাচ্চার ওগুলো খেতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না। বাচ্চা আরও বড় হয়ে গেল। এখন তাকে গরুর হাড্ডি, ছাগলের হাড্ডি, উট, দুম্বা, মহিষ ও ভেড়া ইত্যাদির হাড্ডি চিবাতে হবে এজন্য ঐ ছোট মুখের ছোট ছোট দাঁতগুলো যথেষ্ট নয়। তাই আবারও সেই মহান রব নিজের পক্ষ থেকে বুঝে শুনে পর্যায়ক্রমে ঐ ছোট দাঁতগুলো ভেঙ্গে ফেলে বড় দাঁত দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিলেন। এভাবে যখন যা প্রয়োজন হয় তখনই তিনি নিজের পক্ষ থেকে বুঝে শুনে পূরণ করে দিচ্ছেন।

শুধু কি তাই? ডিমের ভিতরে যে সকল বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে ডিমের ভিতরে থাকা অবস্থায় তারও খাবারের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সেখানে তো মায়ের পেটের সাথে সংযোগ দেওয়ারও কোন ব্যবস্থা নেই। হ্যাঁ! সেখানেও সেই মহান রব ডিমের ভিতরে বাচ্চার খাবারের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আপনি দেখবেন ডিমের ভিতরে দুটি আংশ একটি সাদা লালা আরেকটি হলুদ বর্ণের কুসুম। হলুদ অংশটি দিয়ে বাচ্চা তৈরী হয় আর সাদা অংশটি খাবারের জন্য তৈরী করে রাখা হয়েছে। ডিমের ভিতরে যখন বাচ্চা তৈরী হয়ে গেল তখন সে উক্ত খাবার খেয়ে জীবন-যাপন করতে লাগলো। একসময় খাবারের গুদাম ফুরিয়ে গেল তখন মহান রবের নির্দেশ হয় তোমার চতুর্দিকে যে প্রাচীর রয়েছে ওটাকে ঠোঁট দিয়ে চতুর্দিকে সমান ভাবে ঠোকরাতে থাক। ঠোকরাতে ঠোকরাতে যখন চতুর্দিক ভেঙ্গে ফেলল তখন মহান রবের নির্দেশ হয় এবারে মাথা দিয়ে মারো ধাক্কা। ধাক্কা মেরে যখন পৃথিবীতে চলে আসল তখনও দেখবেন তার বাঁচার জন্য যা কিছু প্রয়োজন সব কিছুই মহান রবের পক্ষ থেকে পূরণ করা হচ্ছে। আপনি লক্ষ করুন! একটি হাসের বাচ্চা হাসের ডিম থেকে বের হলো। আরেকটি মুরগীর বাচ্চা মুরগীর ডিম থেকে বের হলো। দুটো বাচ্চাকে আপনি পানির কাছে নিয়ে যান। হাসের বাচ্চা পানি দেখা মাত্র আনন্দে মেতে উঠবে। সাতার কাটতে শুরু করবে। কোন প্রকার ভয় পাবে না। বরং সে বুঝতে পেরেছে যে, যে পানি তার উপযোগী । পানি তার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। পক্ষান্তরে মুরগীর বাচ্চা মরতে রাজি তবুও পানিতে নামতে রাজি না। কে শিক্ষা দিল হাসের বাচ্চাকে যে, পানি তোর জন্য উপযুক্ত। তোর কোন ভয় নেই। আর কে শিক্ষা দিল মুরগীর বাচ্চাকে যে পানি তোর জন্য উপযুক্ত নয়। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন তিনি তো আর কেউ নন। তিনিই হচ্ছেন সে মহান রব। তাই তিনি অত্যন্ত আদর করে আহবান করছেন:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

অর্থ:"আর তোমাদের রব বলেছেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের জন্য সাড়া দেব।"[১২২] যেভাবে একজন মা অথবা একজন বাবা তার কোন সন্তান অন্যায় করলে তাকে আদর করে ডাকে আসো! আমার কাছে আসো! সন্তান ভয় পায়। কৃত অন্যায়ের জন্য লজ্জা পায়। একটু আসে আবার সরে যায়। না যেন মা-বাবা মার দেয়। তখন পিতা-মাতা তাকে অভয় দেয়। না তোমাকে আমি মারব না। বকা-ঝকা দেব না। আস! আমি তোমার আব্বু। আমি তোমাকে আদর করবো। মিষ্টি খাওয়াব। কলা খাওয়াব। চকলেট খাওয়াব। খেলনা কিনে দিব ইত্যাদি। ঠিক তেমনিভাবে আল-াহ (সুব:) বান্দাকে অভয় দিয়ে আদর করে আহবান করছেন আমিই তোমাদের রব। আমিই তোমাকে আহবান করছি। যত অন্যায় করেছ সব ক্ষমা করে দিব। বান্দা ভয় পায় আল-াহ (সুব:) তখন বলেন, আমিই তো তোমাকে সৃষ্টি করেছি। লালন-পালন করি, হেদায়াত দান করি, ক্ষুধা পেলে খাবার দেই, অসুস্থ হলে শিফা দেই, পিপাসিত হলে পানি দেই, অন্যায় করলে ক্ষমা করি। আসো! আমার কাছে আসো!! আমার রহমত থেকে নৈরাশ হইয়ো না। তখন বান্দা 'লাব্বাইক আল-াহুম্মা লাব্বাইক' বলে উপরোক্ত আহবানে সাড়া দেয়।

তৃতীয় শিক্ষা

'লাব্বাইক' শব্দের মধ্যে সব সময়, সর্বাবস্থায় কারো হুকুম পালন করার জন্য প্রস্তুত থাকা। ব্যক্তি জীবনে , পরিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, ব্যাংকে, আদালতে, ব্যবসা-বানিজ্যে, সংসদে, বঙ্গভবনে এক কথায় রান্না ঘর থেকে শুরু করে বঙ্গভবন পর্যন্ত জীবনের সকল ক্ষেত্রে এক রবের হুকুমের আনুগত্য করার জন্য সবসময় সর্বাবস্থায় প্রস্তুত আছি বলে ঘোষণা করা হয়। মূলত: এটাই হচ্ছে মানব সৃষ্টির মূল রহস্য। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: ৫৬]

অর্থ:"আমি মানব এবং দানবকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য।[১২৩] এজন্যই আমরা সালাত আদায় করার সময় বলি

{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: ৫]

---

[১২২] সুরা গাফের ৬০।

[১২৩] সুরা আয যারিয়্যাত ৫৬।

অর্থ: “আমরা কেবলমাত্র তোমারই ইবাদত কারি এবং কেবলমাত্র তোমার কাছেই সাহায্য চাই।” অনেকে প্রশ্ন করে থাকে যে, সব সময় যদি আল-াহর ইবাদত করি তাহলে পেট চলবে কিভাবে সংসার চলবে কিভাবে? মূলত: এই প্রশ্নের উৎস হচ্ছে ইবাদতের অর্থ না বুঝা। নতুবা শুধু সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত, তাসবীহ, তাহলীল, যিকির, আযকার, তিলাওয়াত ইত্যাদির নামই কেবলমাত্র ইবাদত নয়। তবে হ্যাঁ! ঐগুলো কে পিলার বলা হয়েছে আর শুধু পিলারকে বিল্ডিং বলে না। বরং ছাদ লাগবে, দরজা লাগবে, জানালা লাগবে, প-াস্টার, আস্তর, রং লাগবে তারপর হবে বিল্ডিং। অনুরূপ এখানেও বিষয়টি এরকম। শুধু সালাত, সাওম, হজ্জ ইত্যাদি গুটি কয়েক ইবাদতই ইসলামের সবকিছু না বরং এগুলো শুধু ইসলামের মূল ভিত্তি। এগুলো ছাড়াও আরো অনেক ইবাদত রয়েছে এবং এই সবধরনের ইবাদত মিলেই পূর্নাঙ্গ ইসলাম। তাই আল-াহর হুকুম মেনে যদি ব্যবসা-বানিজ্য, ক্ষেত-খামার, চাকরি-নকরি ইত্যাদি করা হয় সেগুলোও ইবাদত বলে গন্য হবে।

চতুর্থ শিক্ষা

‘লাব্বাইক’ শব্দের মধ্যে খুশু-খুজু অর্থাৎ বিনয় ও নম্রভাবে মনিবের হুকুমের আনুগত্য করার স্বীকৃতি রয়েছে। মূলতঃ আল-াহ (সুবঃ) অহংকারকে পছন্দ করেন না। কুরআনে বলা হয়েছে:

{وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا } [الإسراء: ৩৭]

অর্থ: “ আর যমীনে বড়াই করে চলো না; তুমি তো কখনো যমীনকে ফাটল ধরাতে পারবে না এবং উচ্চতায় কখনো পাহাড় সমান পৌঁছতে পারবে না।”[১২৪] ঘাড় উচু করে, সীনা টান করে যারা অহংকার ভরে দুনিয়াতে বিচরণ করে তাদেরকে আল-াহ (সুবঃ) এই আয়াতের মাধ্যমে তিরস্কার করেছেন। রাসূলুল-াহ (সা:) হাদীসে ইরশাদ করেছেন যে, আল-াহ (সুবঃ) বলেন:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ – قَالَ هَنَّادٌ – قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِى وَالْعَظَمَةُ إِزَارِى فَمَنْ نَازَعَنِى وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِى النَّارِ ».

[১২৪] সুরা ইসরা ৩৭।

অর্থ: “আল-াহ (সুবঃ) বলেন (হাদীসে কুদসি) অহংকার হচ্ছে আমারা চাঁদর আর মহাত্ব হচ্ছে আমার লুঙ্গি। যে ব্যক্তি এর কোন একটা নিয়ে আমার সঙ্গে টানা-টানি করবে আমি তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবো।[১২৫] অহংকার করা মূলতঃ শয়তানের কাজ। কেননা সর্ব প্রথম ইবলিস শয়তানই অহংকার করতঃ আদম (আ:) কে সিজদাহ করা থেকে বিরত ছিল। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

{قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} **[الأعراف: ১২]**

অর্থ: “ তিনি বললেন, ‘কিসে তোমাকে বাধা দিয়েছে যে, সিজদা করছ না, যখন আমি তোমাকে নির্দেশ দিয়েছি’? সে বলল, ‘আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদামাটি থেকে’।”[১২৬] আগুনের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য হলো অহংকার। যদি আগুন জ্বালানো হয় তাহলে তা উপরের দিকে চড়তে থাকে। এ কারণেই ইবলিস অহংকার করেছিল।
কুরআনুল কারীমে আরও বলা হয়েছে:

{إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ} [لقمان: ১৮]

অর্থ: “নিশ্চয় আল-াহ কোন দাম্ভিক, অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না।”[১২৭]
মানুষ কি করে অহংকার করতে পারে অথচ তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সামান্য কাঁদা মাটি থেকে। আবার তাকে সেই মাটির মধ্যেই মিশে যেতে হবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى [طه: ৫৫]

অর্থ: “মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, মাটিতেই আমি তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেব এবং মাটি থেকেই তোমাদেরকে পুনরায় বের করে আনব।”[১২৮]
কোন এক আল-াহ ওয়ালা কৌতুক করে কতই না সুন্দর বলেছেন:

الانسان اوله نطفة – اخره جيفة – وما بينهما حمال عذرة

[১২৫] সুনানে আবু দাউদ ৪০৯২। ইবনে মাজাহ ৪১৭৪।
[১২৬] সুরা আ'রাফ ১২।
[১২৭] সুরা লুকমান ১৮।
[১২৮] সুরা তাহা ৫৫।

অর্থ: “মানুষের সূচনা হলো ‘নুত্বফা’ (বীর্য), সমাপ্তি হলো ‘জিফাহ’ (পঁচা-গলা লাশ) আর এ দুয়ের মধ্যবর্তী সময়ে হলো ‘পায়খানার বোঝা বহনকারী’।
সেজন্য তালবিয়া পাঠের মাধ্যমে বিনয়ের সাথে আনুগত্য প্রকাশ করা হলো।

পঞ্চম শিক্ষা

‘লাব্বাইক আল-াহুম্মা লাব্বাইক’ এর মধ্যে লাব্বাইক শব্দটির মূল উৎস হচ্ছে ‘আললুব্বু’ যার অর্থ হলো ‘খালেস’ বা ‘পিওর’। তালবিয়ার মাধ্যমে মূলত: ইখলাসের সাথে হজ্জ সম্পাদনের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। উলে-খ্য: যে কোন ইবাদত সহীহ হওয়ার জন্য দুটি শর্ত। ১. ইখলাস। ২. ইত্তিবায়ে সুন্নত। প্রথমটি সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ [البينة/৫]

অর্থ: “আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল-াহর ‘ইবাদাত’ করে তাঁরই জন্য দীনকে খালিস করে।”[১২৯]

এই আয়াতে পরিষ্কারভাবে উলে-খ করা হয়েছে যে, যেকোন ইবাদতে শুধুমাত্র আল-াহ (সুব:) এর নৈকট্য লাভের খালেস নিয়ত করতে হবে। নিয়তখাঁটি না হলে শিরক হয়। আর **শিরকযুক্ত ইবাদত** আল-াহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। অপরদিকে যত ইখলাসের সঙ্গেই ইবাদত করা হোক না কেন যদি ‘ইত্তিবায়ে সুন্নত’ বা রাসূল (সা:) এর তরিকা অনুসরণ করা না হয় তাহলে সেটি হবে ‘বিদআত’। ইবাদতের নামে সওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরআন-সুন্নাহর দলীল প্রমাণ ছাড়া নবআবিস্কৃত কোন **বিদ‘আতযুক্ত ইবাদত** আল-াহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। নিয়্যাতের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলুল-াহ (সা:) পবিত্র হাদীসে ইরশাদ করেন:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ (رواه البخاري و مسلم)

অর্থ: “ওমর ইবনে খাত্তার (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল-াহ (সা:) বলেছেন, নিশ্চয়ই সকল আমল নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল।”[১৩০]

এ হাদীসেও রাসূলুল-াহ (সা:) পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে, নিয়তছাড়া কোন আমলই আল-াহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আর হজ্জও গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল।

[১২৯] সুরা বাইয়িনা ৫ নং আয়াত।

[১৩০] সহীহ মুসলিম ৫০৩৬; সহীহ বুখারী ১ নং হাদীস।

তাই হজ্জেও নিয়ত করা ফরজ। ‘লাব্বাইকের’ মাধ্যমে সেই ইখলাসের বিষয়টিকেই প্রকাশ করা হয়।

ষষ্ঠ শিক্ষা

‘লাব্বাইকা’ শব্দের শেষে ‘কা’ শব্দটি আরবীতে কাউকে সম্বোধন করার জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। আর সরাসরি সম্বোধন করা যায় তাকে যে বক্তার কথা নিজে শুনতে পায়। যে ব্যক্তি বক্তার কথা শুনতে পায় না তাকে সম্বোধন করার কোন অর্থ হয় না। তাই তালবিয়ার প্রথমেই ‘লাব্বাইকা’ বলে সরাসরি আল-াহর আনুগত্যের জন্য নিজেকে পেশ করা হচ্ছে। যেখানে বান্দার মাঝে এবং আল-াহর মাঝে কোন পীর-ফকির, দরগাওয়ালা-দূর্গাওয়ালা, খাজাবাবা-গাঁজাবাবা, লেংটাবাবা কারো কোন ভায়া-মাধ্যম নেই। মূলত: মক্কার কুফ্ফারদের সঙ্গে মুসলিমদের পার্থক্য ছিল এখানেই নতুবা তারাও আল-াহকে বিশ্বাস করতো। আল-াহ (সুব:) যে সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা। আসমান-যমিন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র সবকিছুর পরিচালক, একথা তৎকালিন আরবের কাফের, মুশরিক, ইয়াহুদী, খৃষ্টান, ফেরাউন, নমরূদ, আবূ জাহেল, আবূ লাহাব এমনকি শয়তানও বিশ্বাস করতো ও করে। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ

অর্থ: “যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তবে অবশ্যই তারা বলবে, আল-াহ্, অত:পর তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? (যুখরূফ, ৪৩ ঃ ৮৭) এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, মক্কার কাফেরগণ নিজেদের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল-াহ (সুব:) কেই বিশ্বাস করতো। আরেকটি আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ.

অর্থ: “আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন কে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল-াহ্। (যুখরূফ, ৪৩ ঃ ৯) এ আয়াতে আরো পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আসমান সমূহ ও যমিনের সৃষ্টিকর্তা হিসাবে তারা আল-াহ (সুব:) কেই বিশ্বাস করতো। শুধু তাই না, এখানে আরও বলা হয়েছে যে, তারা আল-াহকে (সুব:) মহা পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী বলেও স্বীকার করতো। এমনিভাবে আল-াহ (সুব:) তাদের ব্যাপারে আরও বলেন:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ.

অর্থ: "যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে, অত:পর তা দ্বারা মৃত্তিকাকে উহার মৃত হওয়ার পর সঞ্জীবিত করে? তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল-াহ্। বলুন, সমস্ড় প্রশংসা আল-াহ্রই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বোঝে না। (আনকাবুত, ২৯ ঃ ৬৩) এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তারা বৃষ্টিদাতা, মৃত যমিনকে বৃষ্টির মাধ্যমে জীবিত করে ফসল উৎপন্ন করার একমাত্র মালিক হিসাবে আল-াহ (সুব:) কেই বিশ্বাস করতো। এমনিভাবে তাদের সর্ম্পকে আরও ইরশাদ হয়েছে:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ.

অর্থ: "যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছে, চন্দ্র ও সূর্যকে কর্মে নিয়োজিত করেছে? তবে তারা অবশ্যই বলবে আল-াহ্। তাহলে তারা কোথায় ঘুরে বেড়াচেছ? (আনকাবুত, ২৯ ঃ ৬১) এ আয়াতে ঘোষনা করা হলো যে, তারা আসমান-যমিনের সৃষ্টিকর্তা ও চন্দ্র-সূর্যের পরিচালক হিসাবে আল-াহ (সুব:) কেই বিশ্বাস করতো। এমনিভাবে তাদের সর্ম্পকে আরও বলা হয়েছে:

قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ

অর্থ: "বলুন পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যারা আছে, তারা কার? যদি তোমরা জান। এখন তারা বলবে: সবই আল-াহ্র। বলুন, তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না? (মুমিনুন, ২৩ ঃ ৮৪-৮৫) এ আয়াতে তারা আল-াহর একচ্ছত্র মালিকানাকেও স্বীকার করতো বলে জানানো হয়েছে। শুধু কি এ পর্যন্তই শেষ? না! আল-াহ (সুব:) তাদের সর্ম্পকে আরও বলছেন:

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ (سورة يونس)

অর্থ: "তুমি জিজ্ঞেস কর, কে রিযিক দান করে তোমাদেরকে আসমান থেকে ও যমীন থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করেন এবং কেইবা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে করেন কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, আল-াহ্! তখন তুমি বলো তারপরেও ভয় করছ না? (ইউনুস, ১০ ঃ ৩১)

এ আয়াতে তারা আল-াহ (সুব:) কে গোটা সৃষ্টির রিযিকদাতা, সবকিছুর মালিকানা ইত্যাদির স্বীকৃতি দেয়ার সাথে সাথে সকল কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপক হিসাবেও স্বীকার করতো। এখানেই শেষ নয় বরং তারা আল-াহর (সুব:) সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতিও দিত। যেমন ইরশাদ হচ্ছে:

قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ.

অর্থ: "বলুনঃ তোমাদের জানা থাকলে বল, কার হাতে সব বস্তুর কর্তৃত্ব, যিনি রক্ষা করেন এবং যার কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না ? এখন তারা বলবেঃ আল-াহ্র। (মুমিনুন, ২৩ ঃ ৮৮) এ আয়াতে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে তৎকালিন কাফেরগণ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হিসাবে আল-াহ (সুব:) কেই বিশ্বাস করতো। অথচ বর্তমান মুসলিম বিশ্বের মুসলিম দাবিদার দেশগুলো তাদের সংবিধানে লিখে দিয়েছে 'সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ' 'সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ' ইত্যাদি। এই জঘন্য কুফরি আক্বিদাহ মক্কার কাফেরদেরও ছিল না।

মক্কার লোকেরা যে মহান আল-াহকে বিশ্বাস করতো তার অন্যতম একটি প্রমাণ হলো মহানবী (সা:) এর পিতার নাম ছিলো আব্দুল-াহ। আব্দুল-াহ অর্থ হচ্ছে আল-াহর বান্দা। অর্থাৎ মহানবী (সা:) দুনিয়াতে আসার আগেই সেখানকার মানুষ নিজেদেরকে মহান আল-াহর বান্দা বলে পরিচয় দিতে আনন্দ পেতো। যদি মক্কার লোকেরা আল-াহকে বিশ্বাস নাই করতো তাহলে তারা আব্দুল-াহ নাম রাখতো না।

মক্কার লোকেরা যে মহান আল-াহকে বিশ্বাস করতো তার আরেকটি প্রমাণ হচ্ছে যখন 'আবরাহা' বাদশাহ বাইতুল-াহ ধ্বংস করতে এসেছিলো তখন তার কিছু সৈনিকেরা মক্কার চারণভূমিতে এসে তৎকালীন কাবার 'মুতাওয়াল-ী' আব্দুল মুত্তালিবের কিছু জীব-জন্তু, দুম্বা-ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি নিয়ে যায়।

'আবরাহা' বাদশাহ তখন মক্কা থেকে একটু দূরে মিনা ও মুযদালিফার মাঝামাঝি 'বাতনে মুহাস্সার' নামক স্থানে অবস্থান করছিলো।

আব্দুল মুত্তালিব যখন আবরাহার কাছে উপস্থিত হলেন। আবরাহা ইতিপূর্বে আব্দুল মুত্তালিবের প্রশংসা শুনেছিলো। কুরাইশদের সর্দার, কাবার মুতাওয়াল-ী হিসেবে আব্দুল মুত্তালিবের প্রভাব আবরাহা বাদশার অন্তরে ছিলো। আব্দুল মুত্তালিব দেখতেও খুবই সুদর্শন ছিলেন। তাই আব্দুল মুত্তালিবকে দেখার পর আবরাহা বাদশাহ আরো প্রভাবিত হলো। নিজের মোবাইল সিংহাসন থেকে নেমে জমীনে কার্পেট বিছিয়ে বসলো। আব্দুল মুত্তালিব তখন কোন ভূমিকা ছাড়াই কথা বলা শুরু করলেন। তিনি বললেন, "আমি শুনেছি আপনার লোকেরা আমার

কিছু ভেড়া-বকরী-দুম্বা ছিনতাই করে নিয়ে এসেছে। আমি সেগুলো ফেরত নিতে এসেছি।"

আবরাহা বাদশাহ এই কথা শুনে বললো, "আমার মনে আপনার ব্যাপারে একটি বড় প্রভাব কাজ করছিলো। আমি আপনার সম্পর্কে অনেক ভালো কথা শুনেছি এবং আপনাকে দেখার পর তা আরো গভীর হয়েছে। কিন্তু আপনার কথা শুনে সে সব কিছুই আমার অন্তর থেকে ম্-ান হয়ে গেছে। আমি আবাক হয়েছি। কারণ আমি আপনাদের কাবা ধ্বংস করার জন্য এসেছি, যার সাথে আপনাদের সম্মান ও মর্যাদা জড়িত। অথচ আপনি সেই কাবা সংক্রান্ড় কোন কথা না বলে আপনি এসেছেন আপনার তুচ্ছ কিছু ভেড়া-বকরী নেওয়ার জন্য।"

তখন আব্দুল মুত্তালিব যেই উত্তর দিয়েছিলেন তা আমাদের সকলের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়। তিনি বললেন, "হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো। আমি আমার ভেড়া-বকরী গুলো নিতে এসেছি। কারণ আমি সেগুলোর মালিক। আর তুমি যেই কাবা ভাঙ্গতে এসেছো সেই কাবার মালিক আমি না, সেই কাবার মালিক হলেন মহান আল-াহ। আসমান-যমীন, আমি-তুমি আমাদের সবার মালিক হলেন তিনি। সুতরাং কাবার বিষয়ে তিনিই তোমার সঙ্গে বুঝা-পারা করবেন। পরের ইতিহাস তো আমাদের সবারই জানা আছে। যা সূরায়ে ফিলের মধ্যে আবরাহার ধ্বংসের সেই ঘটনা বিস্ড়ারিতভাবে বর্ণিত রয়েছে।

আরবের লোকেরা যে মহান আল-াহকে বিশ্বাস করতো তার প্রমাণ শুধু এখানেই শেষ নয়। মহানবী (সা:) এর বয়স যখন পয়ত্রিশ বছর। তখন খানায়ে কাবা পুন:নির্মাণের প্রয়োজন হলো। মক্কার তৎকালীন সংসদ ভবন 'দারু্ন নদওয়ায়' বসে আবু জাহেল, আবু লাহাব, আবু সুফিয়ান সহ সকল লিডাররা খানায়ে কাবা পুন: নির্মাণের জন্য চাঁদা তোলা শুরু্ করলেন। তবে তারা বলে দিলেন যে, যেহেতু খানায়ে কাবা মহান আল-াহর ঘর, তাই এর জন্য কোন হারাম পয়সা গ্রহণ করা হবে না। শুধুমাত্র হালাল উপার্জন থেকেই এটির নির্মাণ কাজ করা হবে। কিন্তু যখন চাঁদা তোলা শেষ হলো তখন দেখা গেলো যে, যেই পরিমাণ টাকা হয়েছে তাতে পুরো কাবা নির্মাণ সম্ভব নয়। তখন একদল মত দিলো যে যেহেতু শুধু হালাল টাকায় পুরো কাবা নির্মাণ করা যাচ্ছে না, তাই হালাল টাকার সাথে কিছু হারাম টাকাও যোগ করা হোক। আরেকদল বললো, না কাবার নির্মাণে আমরা হারাম পয়সা লাগাবো না। তাতে যে পর্যন্ড় নির্মাণ করা যায় সে পর্যন্ড়ই আমরা নির্মাণ করবো। শেষ পর্যন্ড় এটাই সিদ্ধান্ড় হলো যে, কাবা ঘরের নির্মাণে কোন হারাম পয়সা লাগানো হবে না। হালাল পয়সা দ্বারা যতটুকু নির্মাণ করা যায় তাই করা হবে। এজন্য প্রয়োজনে কিছু অংশ বাদ দিবো। তাই করা

হলো। আজ পর্যন্ড় কাবার সেই অংশ সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। 'হাতীমে কাবা' নামে কাবার প্রায় এক তৃতীয়াংশ কাবার বাহিরে রয়ে গেছে।

এ ঘটনা প্রমাণ করে যে, মক্কার লোকেরা শুধু আল-াহকে বিশ্বাস করতো তাই না, বরং তারা হালাল-হারাম সর্ম্পকেও সচেতন ছিল। অথচ বর্তমান মুসলিম জাতি মসজিদ নির্মাণ করার ক্ষেত্রে হালাল-হারামের কোন তোয়াক্কা করে না। বরং সূদখোর-ঘুষখোর, মদখোর-জুয়াচোর সব রকমের লোকের টাকাই গ্রহণ করা হয়।

এমনিভাবে যে ফেরআউন নিজেকে ইলাহ এবং রব বলে দাবী করেছিল সেও আল-াহকে বিশ্বাস করতো। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَقَالَ الْمَلا مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ.

অর্থ: "ফেরাউনের সম্প্রদায়ের র্সদাররা বলল, তুমি কি মূসা ও তার সম্প্রদায়কে এই সুযোগ দিবে যে তারা দেশময় হৈ-চৈ করবে এবং তোমাকে ও তোমার আলেহা (দেব-দেবী)কে বাতিল করে দেবার জন্য। (আরাফ, ৭ ঃ ১২৭)

এই আয়াতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, ফেরাউন ও বিশ্বাস করতো যে, আল-াহ আছে। তবে সে নিজেকেও রব দাবী করেছিলো এই হিসেবে যে সে সমগ্র মিশরের স্বার্বভৌম আল-াহ মতার মালিক আর যেহেতু সার্বভৌমত্বের কমা্ই হলো আইন তাই সে হিসাবে সে আইন-কানুন ও বিধান তৈরী করে দিত। অর্থাৎ সে নিজেকে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হিসাবে আল-াহ দাবি করেছিল। যেমন ইরশাদ হয়েছে:

{وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي} [القصص: ৩৮]

অর্থ: "আর ফির'আউন বলল, 'হে পারিষদবর্গ, আমি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ আছে বলে আমি জানি না।"[১৩১]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

{قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ} [الشعراء: ২৯]

অর্থ: "ফির'আউন বলল, 'যদি তুমি আমাকে ছাড়া কাউকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাকে কয়েদীদের অন্ড়র্ভুক্ত করব।"১৩২

---

[১৩১] সুরা কাসাস ৩৮।
[১৩২] সুরা শুআরা ২৯।

তারপর যেহেতু সাবভৌমত্বের কমা হচ্ছে আইন সেহেতু সে আইন-বিধান রচনা করতো এবং এই হিসাবে নিজেকে রব দাবী করেছিলো। ইরশাদ হচ্ছে:

[فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى} [النازعات: ২৪ }

অর্থ: "সে বললো, আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় রব।"[১৩৩]

ফেরআইনের এই ইলাহ বা রব দাবী করার মানে ছিল সে মিশরের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক ও আইন-বিধানদাতা দাবী করা। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ} [الزخرف: ৫১]

অর্থ: "আর ফির'আউন তার কওমের মধ্যে ঘোষণা দিয়ে বলল, 'হে আমার কওম, মিসরের রাজত্ব কি আমার নয়? আর এ সব নদ–নদী কি আমার পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে না, তোমরা কি দেখছ না'?"[১৩৪]

বুঝা গেল সে আসমান-যমিনের রব দাবী করে নাই বরং শুধুমাত্র মিশরের রব হিসাবে দাবী করেছে। এছাড়া সে আসমান-যমিনের অন্য একজন রব আছে বলে বিশ্বাসও করতো যেমনঃ পূর্বের আয়াতে বুঝা গেল।

মোটকথা, সে নিজেকে আইনদাতা ও স্বার্বভৌমত্বের মালিক হিসেবে রব ও আল- াহ দাবি করেছিলো। এজন্য সে কাফির ছিলো।

একইভাবে ইবলীসও আল- াহকে স্বীকার করতো, বিশ্বাস করতো। ইবলীসকে যখন মহান আল- াহ বেহেশত হতে বিতাড়িত করলেন তখন ইবলীস আল- াহর কাছেই দোয়া করেছিলো। সূরায় হিজরের মধ্যে সেই ঘটনা উলে- খ করে মহান আল- াহ বলছেন,

قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ.

অর্থ: "হে আমার রব! তুমি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ড় সুযোগ দাও। আল- াহ তা'আলা বললেন, তোমাকে কিয়ামত পর্যন্ড় হায়াত দেয়া হলো।" (আরাফ, আয়াত ১৪-১৫)

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ

[১৩৩] সুরা নাজিআ'ত ২৪।
[১৩৪] সুরা যুখরুফ ৫১।

অর্থ: "হে আমার রব! তুমি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ড় সুযোগ দাও। আল- াহ তা'আলা বললেন, তোমাকে কিয়ামত পর্যন্ড় হায়াত দেয়া হলো।" (হিজর, আয়াত ৩৬-৩৭) একইভাবে অন্য এক স্থানে ইরশাদ হচ্ছে,

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ.

অর্থ: "তারা শয়তানের মত, যে মানুষকে কাফের হতে বলে। অত:পর যখন সে কাফের হয়, তখন শয়তান বলে: তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্বপালনকর্তা আল- াহ্ তা'আলাকে ভয় করি। (হাশর, ৫৯ ঃ ১৬)

এভাবে বদরের যুদ্ধেও শয়তানের ঘটনা আছে। মহানবী (সা:) বদরের দিকে গিয়েছিলেন আবূ সুফিয়ানের সিরিয়া থেকে আসা কাফেলাকে ধরার জন্য। তখন আবু সুফিয়ান মক্কায় সাহায্য চেয়ে লোক পাঠালে আবু জাহেলের বাহিনী বদরের ময়দানে গিয়েছিলো আবূ সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলাকে রক্ষা করার জন্য। কিন্তু আবু সুফিয়ান মক্কায় সাহায্য চেয়ে সে আবার নিজের নিরাপত্তার জন্য নিজেই পথ পরিবর্তন করে সাগরের পাড় দিয়ে বিকল্প পথে মক্কায় পৌঁছে গেলো। মক্কায় পৌঁছে আবু সুফিয়ান আবু জাহেলের কাছে চিঠি লিখলো, আমরা নিরাপদে চলে এসেছি তোমরাও মক্কায় চলে এসো। তখন আবু জাহেল সবাইকে নিয়ে পরামর্শে বসলো যে, যুদ্ধ করবে না এমনিই মক্কা ফিরে যাবে। বেশির ভাগ লোক পরামর্শ দিলো ফিরে যাবার জন্য কেননা, তারা যে জন্য এসেছিলো সেই আবু সুফিয়ান নিরাপদে মক্কায় চলে গেছে। তখন শয়তান নজদ এলাকার এক সর্দারের রূপ ধরে সেখানে এলো। শয়তান এসে তাদেরকে উৎসাহ দিলো যুদ্ধের জন্য। কুরআন সেই ঘটনা সম্পর্কে বলছে,

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

অর্থ: "আর যখন সুদৃশ্য করে দিল শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপকে এবং বলল যে, আজকের দিনে কোন মানুষই তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না আর আমি হলাম তোমাদের সমর্থক, অতঃপর যখন সামনা সামনি হল উভয় বাহিনী তখন সে অতি দ্রুত পায়ে পেছনের দিকে পালিয়ে গেল এবং বলল, আমি তোমাদের সাথে না। আমি দেখছি, যা তোমরা দেখছ না; আমি ভয় করি আল- াহকে। আর আল- াহর আযাব অত্যন্ড় কঠিন। (আনফাল, ৮ ঃ ৪৮)

এই আয়াত থেকে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তা হলো গযব থেকে বাঁচতে হলে আল-াহর শত্রুদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। শয়তান ইচ্ছে করলেও আল-াহকে অস্বীকার করতে পারে না। কারণ শয়তান আল-াহর ফিরিশতাদেরকে দেখছিলো। শয়তান আল-াহর জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছে।

তাহলে পার্থক্য কোথায়

এখন প্রশ্ন হলো: যে মক্কার কাফেরদের সাথে আমাদের পার্থক্য কোথায়? কেউ হয়তো বলবে যে, তারা মূর্তিপূজা করতো তাই তারা কাফের আর আমরা মুর্তিপূজা করিনা তাই আমরা মুসলিম। কিন্তু আমরা যদি কুরআনকে জিজ্ঞেস করি যে, তারা কেন মুর্তিপূজা করতো? তারা কি মুর্তিগুলোকে আল-াহ বিশ্বাস করে তাদের ইবাদত করতো? কুরআন পরিষ্কারভাবে উত্তর দিবে যে, না! তারা দেব-দেবী আর মুর্তিগুলোকে আল-াহ হিসাবে বিশ্বাস করতো না। বরং এগুলোকে আল-াহর কাছে সুপারিশকারী ও আল-াহ এবং তার বান্দার মাঝে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে বিশ্বাস করতো। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

অর্থ: " যারা আল-াহ্ ব্যতীত অপরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে রেখেছে। তারা বলে যে, আমরা তাদের ইবাদত এ জন্যেই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল-াহ্র নিকটবর্তী করে দেয়।" (যুমার, ৩৯ঃ ৩) এ আয়াতে বুঝা গেল যে, মক্কার মুর্তিপূজকরা মুর্তিগুলোকে আল-াহর নৈকট্য লাভের জন্য মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিলো। অপর আয়াতে বলা হয়েছে:

{وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ} [يونس: ১৮]

অর্থ: "আর তারা আল-াহ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদত করছে, যা তাদের ক্ষতি করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে, 'এরা আল-াহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী'।[১৩৫] এ আয়াতে প্রমাণ হলো যে, মক্কার কাফেররা মূর্তিগুলোকে আল-াহর কাছে সুপারিশকারী হিসাবে বিশ্বাস করতো। আল-াহ হিসাবে নয়। তাহলে বর্তমানে যারা পীর-বুযূর্গ, ওলী-আওলিয়া, জ্বীন-ফেরেশতা, মাজারওয়ালা-দরগাওয়ালাদেরকে ভায়া-মাধ্যমরূপে গ্রহণ করেছে। যারা বিশ্বাস করে পীরের মাধ্যম ছাড়া আল-াহকে পাওয়া সম্ভব নয়। যার পীর

[১৩৫] সুরা ইউনুস ১৮।

নাই তার পীর শয়তান।[১৩৬] পীরের কৃলবের দিকে নিজের কৃলবকে 'মুতাওয়াজ্জুহ' করতে হবে। পীরের 'মুরাকাবা' করে আপন পীরকে কৃলবে বসাতে হবে। পীর মুরীদকে পরকালে পার করে নিবে। কারো যদি দুই জন পীর হয় তাহলে দুই পীর দুই ডানা ধরে মুরীদকে বেহেস্তে নিয়ে যাবে কোন সমস্যা নেই।[১৩৭] তাদের মাঝে ও মক্কার মুর্তিপূজক কাফের-মুশরিকদের মাঝে পার্থক্য কোথায়? প্রকৃতপক্ষে এদের মাঝে এবং মক্কার তৎকালীন মূতিপূজকদের মাঝে তেমন কোন পার্থক্য নাই। একারণেই আল-াহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন:

{وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} [يوسف: ১০৬]

অর্থ: বেশীর ভাগ লোক ঈমান আনা সত্ত্বেও মুশরিক।"[১৩৮]

মূলত: এই জাতীয় কালিমা পড়া ও দাড়ি-টুপিওয়ালা মুসলিম নামধারীদের ভ্রান্ত আক্বিদাহ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যই ইহরামের নিয়ত করার পরই সমস্ত ভায়া-মাধ্যমকে বর্জণ করে সরাসরি আল-াহর কাছে নিজেকে পেশ করার জন্য বলতে হয় "লাব্বাইক আল-াহুম্মা লাব্বাইক" অর্থ: "হে আল-াহ! আমি তোমার হুকুমের আনুগত্য করার জন্য সবসময় প্রস্তুত"। এটাই হচ্ছে একজন মুসলিম ও একজন কাফের-মুশরিক এর মধ্যে মূল পার্থক্য। একারণেই ঈমানের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত সালাতে দাড়িয়ে 'তাকবিরে তাহরিমা'র পরে যে দু'আ গুলো পড়ার কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে:

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

অর্থ:"নিশ্চয় আমি নিবিষ্ট করেছি আমার চেহারা একনিষ্ঠভাবে তাঁর জন্য, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই'। বল, 'নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল-াহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব। 'তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমাকে এরই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আর আমি মুসলমানদের মধ্যে প্রথম।" [১৩৯]

এমনিভাবে যে কোন সালাতের প্রতি রাকাআ'তে সুরায়ে ফাতিহা পাঠ করতে হয়। সেখানেও আমরা সরাসরি আল-াহর কাছে ঘোষণা করি:

[১৩৬] দেখুন 'ভেদে মারেফাত' ৪২ পৃষ্ঠা। আল ইসহাক পাবলিকেশন্স।

[১৩৭] দেখুন 'মাওয়ায়েজে এসহাকিয়া' আল এসহাক প্রকাশনী। পৃষ্ঠা ৫৫।

[১৩৮] সুরা ইউসূফ ১০৬।

[১৩৯] তাবরানি ৯২৮।

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

অর্থ: "আমরা কেবল মাত্র তোমারই ইবাদত করি, এবং কেবলমাত্র তোমার কাছেই সাহায্য চাই।"[১৪০] এখানেও সরাসরি আল-াহর (সুব:) ইবাদত করার ঘোষণা করা হয়েছে। কোন ভায়া-মাধ্যম গ্রহণ করা হয় নাই। তারপরে সরাসরি আল-াহর (সুব:) কাছেই সাহায্য কামনা করা হয়েছে। এটাই বান্দার প্রতি আল-াহর (সুব:) নির্দেশ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

৭ পবিত্র কুরআনে আরও ইরশাদ হয়েছে:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} [البقرة: ১৮৬[

অর্থ: "আর যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, আমি তো নিশ্চয় নিকটবর্তী। আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই, যখন সে আমাকে ডাকে। সুতরাং তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে। আশা করা যায় তারা সঠিক পথে চলবে।"[১৪১] এই আয়াতে আল-াহ (সুব:) বলেছেন যে আমি বান্দার নিকটেই রয়েছি সুতরাং কোন ভায়া মাধ্যমের প্রয়োজন নেই। কত নিকটে রয়েছেন এটা অপর আয়াতে ঘোষণা দেয়া হয়েছে:

[وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ} [ق: ১৬ }

অর্থ: "আমি তার (মানুষের) শাহরগেরও নিকটে।"[১৪২] সুতরাং শুধু আল-াহ (সুব:) কেই ডাকতে হবে। এবং শুধু তার কাছেই সরাসরি প্রার্থণা করতে হবে। কোন কোন পীরের বইতে লেখা আছে: "বান্দা অসংখ্য গুনাহ করার ফলে আল-াহ পাক তাহাকে কবুল করিতে চান না । পীর সাহেব আল-াহ পাকের দরবারে অনুনয়-বিনয় করিয়া ঐ বান্দার জন্য দু'আ করিবেন যাহাতে তিনি কবুল করিয়া নেন। ঐ দু'আর বরকতে আল-াহ পাক তাহাকে কবুল করিয়া নেন।"[১৪৩] অথচ এই আক্বিদাহ পোষণ করা সরাসরি কুরআনের আয়াতের পরিপন্থী। কেননা আল-াহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন:

[১৪০] সুরা ফাতিহা ৫।
[১৪১] সুরা বাকারা ১৮৬।
[১৪২] সুরা ক্বাফ ১৬।
[১৪৩] দেখুন "ভেদে মারেফাত" ৩৪ পৃষ্ঠা "আল ইছহাক পাবলিকেশন্স"।

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(الزمر ৫৩)

অর্থ: "বল, 'হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ তোমরা আলাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আলাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।"[১৪৪] এ আয়াতে আল-াহ (সুব:) স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে, বান্দা যত অন্যায় এবং পাপ কর‍ুক না কেন কোনভাবেই আল-াহর রহমত থেকে নৈরাশ হওয়া যাবে না। অপর আয়াতে আল-াহ (সুব:) ঘোষণা করছেন:

[نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} [الحجر: ৪৯ }

অর্থ: " আমার বান্দাদের জানিয়ে দাও যে, আমি নিশ্চয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১৪৫]

এ সকল আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে সরাসরি আল-াহকে ডাকতে হবে। কোন প্রকার ভায়া-মাধ্যম করা যাবে না। তাছাড়া আল-াহকে ডাকার ক্ষেত্রে আল-াহর সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করাও যাবে না। এ প্রসঙ্গে আল-াহ (সুব:) বলেন:

[وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} [الجن: ১৮}

অর্থ: "আর নিশ্চয় মসজিদগুলো আল-াহরই জন্য। কাজেই তোমরা আল-াহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না।"[১৪৬]

আল-াহর সাথে অন্য কাউকে ডাকাই হচ্ছে আল-াহর সাথে শিরক করা।

শির্ক শব্দের আভিধানিক অর্থ- অংশীদারিত্ব, অংশীবাদ, মিলানো, সমকক্ষ করা, অংশীস্থির করা, সমান করা, ভাগাভাগি, সম্পৃক্ত করা।

ইংরেজীতে Poytheism (একাধিক উপাস্যে বিশ্বাস), Sharer, Partner, Associate.

শরীয়তের পরিভাষায় "যেসব গুনাবলী কেবল আল-াহ্র জন্য নির্ধারিত সেসব গুনে অন্য কাউকে গুনান্বিত ভাবা বা এতে অন্য কারো অংশ আছে বলে মনে করাই শিরক্।"

[১৪৪] সুরা যুমার ৫৩।
[১৪৫] সুরা হজর ৪৯।
[১৪৬] সুরা জ্বীন ১৮।

শিরক্ হচ্ছে আল-াহর সাথে এমন বিষয়ে সমকক্ষ স্থির করা যেটা আল-াহর জন্যই প্রযোজ্য। যেমন- আল-াহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করা, অন্য কারো নিকট আশা করা, আল-াহর চাইতে অন্য কাউকে বেশী ভালবাসা, অর্থাৎ আল-াহর ইবাদতের কোন একটি অন্যের দিকে সম্বোধন করাকে শিরক্ বলে। তাওহীদুল-াহ হচ্ছে আল-াহর সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত মানুষের সকল বিশ্বাস, কথা ও কাজে আল-াহর এককত্বের উপলব্দি ও মেনে চলা। পক্ষান্তরে শিরক্ হচ্ছে এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

- ইমাম কুরতুবী বলেন, শিরক্ হল আল-াহর নিরংকুশ প্রভূত্বে কারো অংশীদারিত্বের আক্বীদা পোষণ করা।
- আক্বীদার পরিভাষায়, শিরক্ হচ্ছে আল-াহর সাথে সংশি-ষ্ট ও সীমাবদ্ধ কোন বিষয় আল-াহ্ ছাড়া অন্য কারো জন্য করা।

শিরকের ক্ষেত্রে একটা বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, এতে দু'শরীকের অংশ সমান হওয়া আবশ্যক নয়। বরং শতভাগের একভাগের অংশীদার হলেও তাকে অংশীদার বলা হয়। তাই আল-াহতা'য়ালার হক্বের সামান্যতম অংশ অন্যকে দিলেই তা শির্কে পরিণত হবে। এতে আল-াহর অংশটা যতই বড় রাখা হোক না কেন।

৪. لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ (লা শারীকা লাকা লাব্বাইক) এর শিক্ষনীয় বিষয়

ইসলামের মূল ভিত্তি পাঁচটি। এই পাঁচটি ভিত্তির মূল ভিত্তি হচ্ছে ঈমান। আর ঈমানের মূল ভিত্তি হচ্ছে 'তাওহীদ'। সকল নবী রাসূলগণের মূল দাওয়াত ছিল 'তাওহীদ' পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِ.

অর্থ: "আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। সুতরাং আমারই এবাদত কর।"[১৪৭]

আমাদের রাসূলুল-াহ (সা:) নবুওয়াত প্রাপ্তির পরে প্রথমে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করেছিলেন সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত এগুলো অনেক পরে নাযিল হয়েছিল। তাওহীদ বিহীন শিরকযুক্ত কোন ইবাদত আল-াহ তায়াল কবুল করেন না। একারণেই যখন বান্দা ইহরাম বেঁধে "লাব্বাইক আল-াহুম্মা লাব্বাইক" অর্থ: "হে আল-াহ! আমি তোমার হুকুমের আনুগত্য করার জন্য সবসময় প্রস্তুত" বলে ঘোষণা করে তখন যেন আল-াহ (সুব:) বলেন: না! তোমার "লাব্বাইক" গৃহীত

[১৪৭] সুরা আল-আম্বিয়া, ২১:২৫

হবে না। আগে বল তোমার অন্তরে কোন খাজাবাবা-গাঁজাবাবা, পীরবাবা ইত্যাদি আছে কিনা? তখন বান্দা সুস্পষ্টভাবে আল-াহ (সুব:) কে জানিয়ে দেয় যে, না! **لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ** "লা শারীকা লাকা লাব্বাইক"। না! তোমার কোন শরীক নাই। আমার অন্তরে তোমার সাথে আর অন্য কাউকে শরীক করছি না। তোমার আইন-কানুন, বিধি-বিধানই কেবলমাত্র আমি অনুসরণ করবো। তোমার ইবাদতের ক্ষেত্রে অন্য কাউকে তোমার সাথে অংশিদার বানাবো না। মূলত: এটাই হজ্জের সবচেয়ে গুর"ত্বপূর্ণ শিক্ষা। কেননা আল-াহ (সুব:) ইব্রাহিম আ; কে যখন খানায়ে কাবা নির্মাণ করতে বলেছিলেন তখনই তাকে নির্দেশ করেছেন কাবাকে শিরকমুক্ত রাখার জন্য। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

}وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [الحج: ২৬]

অর্থ: " আর স্মরণ কর, যখন আমি ইবরাহীমকে সে ঘরের (বায়তুল-াহ্র) স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম, 'আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না এবং আমার ঘরকে পাক সাফ রাখবে তাওয়াফকারী, র"কূ-সিজদা ও দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর জন্য'।"[১৪৮] বুঝা গেল মুশরিকের জন্য বাইতুল-ায় অংশগ্রহণ করার কোন অনুমতি নাই। পবিত্র কুরআনে আরো স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে:

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ } [التوبة: ২৮ }

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয় মুশরিকরা নাপাক, সুতরাং তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হয়।"[১৪৯] সুতরাং যেসকল পীর পুজারী, মাজার পূজারী পীরের মূর্তি অন্তরে লালন করেন, যারা পীরকে আল-াহকে পাওয়ার জন্য সুপারিশকারী ও ভায়া–মাধ্যম বিশ্বাস করে তাদের মক্কায় যাওয়ার অনুমতি নাই। কেননা আল-াহ (সুব:) শিরকযুক্ত ইবাদত কবুল করেন না। এজন্য পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

[১৪৮] সুরা হজ্জ ২৬।

[১৪৯] সুরা তাওবা ২৮।

অর্থ: "যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলম (শির্ক) দ্বারা কলুষিত করে নাই, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই হেদায়েত প্রাপ্ত।"[১৫০] এ আয়াতে জুলুম বলতে সাধারণ অন্যায়-অত্যাচারকে বুঝানো হয় নাই বরং এখানে জুলুম বলতে 'শিরক' কে বুঝানো হয়েছে। যেমন নিম্নের হাদীসটিতে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ } شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا أَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيْسَ بِذَاكَ أَلَا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ لِابْنِهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (صحيح البخاري)

অর্থ: আবদুল-াহ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হলো তখন সাহাবায়ে কেরামদের কাছে বিষয়টি খুব কঠিন মনে হলো। কারণ এ আয়াতে বলা হয়েছে, যারা তাদের ঈমানকে জুলুম দ্বারা কলুষিত করে নাই। অথচ এমন কে আছে যে, তার ঈমানকে কোন না কোনভাবে জুলুম দ্বারা কলুষিত করে নাই। (একারণে তারা বিষয়টি রাসূল (সা:) এর কাছে উপস্থাপন করলো) তিনি বললেন, এখানে জুলুম বলতে তোমরা যা মনে করেছ তা নয়। বরং এখানে জুলুম বলতে 'শিরক' কে বুঝানো হয়েছে। তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ না যে লোকমান তার ছেলেকে কি বলেছেন? তিনি তার ছেলেকে বলেছেন, "নিশ্চয়ই শিরক হলো বড় জুলুম।"(সুরা লোকমান ১৩ নং আয়াত)।" [১৫১]

শিরক এমন একটি মারাত্মক গুনাহ যা আল-াহ (সুব:) তওবা ছাড়া কখনো ক্ষমা করবেন না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ.

অর্থ: "নি:সন্দেহে আল-াহ্ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর (আল-াহর) সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। (নিসা, ৪ঃ ৪৮) অপর আয়াতে আল-াহ (সুব:) বলেন: إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. অর্থ: "নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল-াহ্র সাথে অংশীদার স্থির করে, আল-াহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন। (মায়েদা, ৫ঃ ৭২)

[১৫০] সূরা আন'আম: ৮২।

[১৫১] সহীহ বুখারী ৪৭৭৬; সহীহ মুসলিম ৩৪২;

পবিত্র কুরআনে মহান আল-াহ তা'আলা ১৮জন নবীদের নাম উলে-খ করার পর বলেছেন, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. অর্থ: "তারা যদি শিরক্ করতো তবে তাদের কৃতকর্ম নিস্ফল হত।" (সূরা আন'আম, আয়াত : ৮৮)

এমনকি আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সা:) কে উদ্দেশ্য করেও আল-াহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন,

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

অর্থ: "তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই এই ওহী হয়েছে তুমি আল-াহর সাথে শরীক্ করলে তোমার আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং অবশ্যই তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্থ।" (যুমার, ৩৯ঃ৬৫)

শিরকের ভয়াবহতা সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে

عن معاذ رضي الله عنه قال : كنت ردف النبي صلى الله عليه و سلم على حمار يقال له عفير فقال (يا معاذ هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله) . قلت الله ورسوله أعلم قال (فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا

অর্থ: "মুআজ (রাঃ) থেকে বর্নিত তিনি বলেন- আমি 'উফাইর' নামক একটি গাধার পিঠে নাবী (সঃ) এর পেছনে বসেছিলাম। নাবী (সঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "তুমি কি জান বান্দার নিকট আল-াহর হক্ কি?" আমি বললাম, আল-াহ এবং তাঁর রাসুলই ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ "বান্দার নিকট আল-াহর হক্ হল বান্দা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর আল-াহর নিকট বান্দার হক হলো যে বান্দা তাঁর (আল-াহর) সাথে কাউকে শরীক করবে না আল-াহ তাকে শাস্তি প্রদান করবেন না।"[১৫২]

আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (آتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة) قلت وإن زنى وإن سرق ؟ قال (وإن زنى وإن سرق

[১৫২] বুখারী ২৬৪৬।

অর্থ: "আবু যর (রাঃ) নাবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নাবী (সঃ) বলেন- "জিব্রাঈল এসে আমাকে সুসংবাদ দিলেন, আল-াহর সাথে শরীক্ স্থাপন না করে যে ব্যক্তি মারা যায় সে জান্নাত লাভ করবে।" আবু যর বললেন, যদি সে চুরি করে এবং ব্যভিচার করে তবুও কি? নাবী (সঃ) বললেন, "হ্যাঁ যদি সে চুরি করে এবং ব্যভিচার করে তবুও"।[১৫৩] রাসূল (সা:) আরো ইরশাদ করেন:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُوجِبَتَانِ فَقَالَ « مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ

অর্থ: "জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- এক ব্যক্তি নাবী (সঃ) এর নিকটে এসে জিজ্ঞেস করল, জান্নাত এবং জাহান্নাম ওয়াজিব কারী বস্তু দু'টি কি কি? তিনি বলেনঃ "যে ব্যক্তি আল-াহর সাথে কাউকে অংশীদার না বানিয়ে মৃত্যুবরণ করল সে জান্নাতী। আর যে ব্যক্তি আল-াহর সাথে কাউকে শরীক বানিয়ে মারা গেল সে জাহান্নামী।"[১৫৪]

রাসূলুল-াহ (সা:) আরো ইরশাদ করেন:

عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قال الله تعالى : يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة

অর্থ: "আনাছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সঃ) বলেছেন যে- ''আল-াহ (সুব:) বলেছেন: হে আদম সন্তান তোমরা যদি আমার সাথে অংশীদার স্থাপন না করে দুনিয়া ভরা অপরাধ (গুনাহ) নিয়েও আমার সাথে স্বাক্ষাত কর, তবে আমি দুনিয়া ভরা ক্ষমা নিয়ে তোমাদের নিকট উপস্থিত হব।"[১৫৫]

মুশরিকের জন্য দু'আ করাও জায়েজ নাই।

পবিত্র কুরআনে আল-াহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ [التوبة/১১৩]

[১৫৩] বুখারী ৯৬৯৬, মুসলিম ১৮০।

[১৫৪] মুসলিম ১৭৭।

[১৫৫] তিরমিজী, মেশকাত- বা'বুল ইস্তেগফার।

অর্থ: "আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নাবী ও মু'মিনদের সংগত নয়, এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা জাহান্নামী।"[156] এ আয়াতটি নাজিল হয়েছিল যখন আবূ তালেবের মৃত্যুর পরেও রাসূলুল-াহ (সা:) তার জন্য দু'আ করছিলেন। এমনিভাবে পবিত্র কুরআনে মুশরিকদেরকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রানী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আয়াত:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ [البينة/৬]

"আহলে কিতাব ও মুশরিক কাফেররা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির অধম।"[১৫৭]

শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি ধংস ও বিপর্যায়ে পতিত হয়

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ [الحج/৩১]

অর্থ: "যে কেউ আল-াহর সাথে শরীক করে সে যেন আকাশ থেকে পড়ল, কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল।"[১৫৮]

শিরকে লিপ্ত ব্যক্তির দু'আও আল-াহ (সুব:) কবুল করেন না

إن الله يقبل توبة عبده أو يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب قالوا يا رسول الله وما الحجاب قال أن تموت النفس وهي مشركة

জাবির বিন আবদুল-াহ হতে বর্ণিত, নবী (সঃ) বলেছেন- "বান্দার জন্য সর্বদাই ক্ষমা রয়েছে যতক্ষন পর্যন্ত হিযাব বা পর্দা পতিত না হয়।" বলা হলো, "হে আল-াহর রাসুল! হিযাব বা পর্দা কি?" তিনি বললেন, "আল-াহর সাথে শরীক্ করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা।"[১৫৯]

শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ

আল-াহর রাসূল (সা:) থেকে ইরশাদ হয়েছে:

[১৫৬] সূরা, তাওবাহ ৯:১১৩।

[১৫৭] সূরা বাইয়্যেনাহ ৯৮:৬।

[১৫৮] সূরা, হাজ্জ ২২:৩১।

[১৫৯] মুসনাদে আহমদ, ইবনু কাছীর ১ম খন্ড ৬৭৮পৃঃ।

سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم أي الذنب عند الله أكبر ؟ قال (أن تجعل لله ندا وهو خلقك(صحيح البخاري)

ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্নিত, তিনি বলেন এক ব্যক্তি বলল, "হে আল-াহর রাসুল সবচেয়ে বড় গোনাহ কোনটি?" রাসুল (সঃ) বললেন, "আল-াহর সাথে শরীক করা, অথচ আল-াহই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।"[১৬০]

আমাদের সমাজে প্রচলিত কতিপয় শিরক

আমাদের সমাজে প্রচলিত শিরকগুলোকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। ক. রাষ্ট্রীয় শিরক। খ. ধর্মীয় শিরক।

ক. রাষ্ট্রীয় শিরক। যেমনঃ

১. 'সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ' বা 'সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ' বলে বিশ্বাস করা।[১৬১]

২. মন্ত্রি, এম.পিদেরকে আল-াহর আইন বাতিল করে বিকল্প আইন তৈরী করার ক্ষমতা প্রদান করা।

৩. বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে মূর্তি তৈরী করা। মূর্তিকে সংরক্ষণ করা। মূর্তির সম্মানার্থে তার সামনে নিরবে দাঁড়িয়ে থাকা। মূর্তিকে সম্মানার্থে নগ্নপায়ে হাঁটা। মূর্তিকে বা কোন মিনারে ফুল দিয়ে সম্মান করা।

৪. শিখা অনির্বান বা শিখা চিরন্তন ইত্যাদির নামে অগ্নিপূজা করা।

৫. মন্ত্রি, এম.পিদেরকে দেবতার আসনে বসিয়ে আল-াহর আনুগত্যের বিপরীতে তাদের আনুগত্য করা।

৬. ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকারঃ "কোন আদালত, ট্রাইবুনাল বা অন্যকোন কতৃপক্ষ কতৃক প্রদত্ত যে কোন দ ের মার্জণা, বিলম্ব ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে কোন দ মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে"[১৬২] একথা মেনে নেয়া।

৭. গনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরেপেক্ষতাবাদে বিশ্বাস করা।

খ. ধর্মীয় শিরক। যেমনঃ

---

[১৬০] সহীহ বুখারী, মুসলিম।

[১৬১] বাংলাদেশ সংবিধান ৭/১ নং ধারা।

[১৬২] বাংলাদেশ সংবিধান ৪৯ নং ধারা।

১. পীর-ওলী ও সাধু-সুজনদেরকে সকল ক্ষমতার মালিক বলে বিশ্বাস করা।

২. নাবী, ফেরেশতা, পীর, ওলী-আওলিয়া, সাধু-স্বজনকে ইলাহী ব্যবস্থাপনার মধ্যে যে কোন পরিবর্তণ ও সংযোজন করার অধিকারী বলে বিশ্বাস করা।

৩. ওলী-বুযুর্গরা আল-াহর সাথে স্বত্তাগতভাবে একাকার হয়ে যায় বলে বিশ্বাস করা।

৪. কাউকে আল-াহর সন্তান, আত্মীয়, আংশিদার বা শরীক বলে বিশ্বাস করা।

৫. কোন বস্তু বা প্রাণীর মধ্যে মিশ্রিয় বা অবিমিশ্রভাবে আল-াহর অস্তিত্ব বা অবতারত্ব স্বিকার করা। যেমনঃ হিন্দুরা রামকে ভগবানের অবতার বলে জ্ঞান করে।

৬. আল-াহ ছাড়া আর কাউকে সকল প্রয়োজন পূরণকারী, সকল ক্ষমতার অধিকারী এবং হেদায়াত দানকারী বলে বিশ্বাস করা।

৭. আল-াহ ছাড়া আর কাউকে ইবাদত-বন্দেগীর অধিকারী, বিপদে সাহায্যকারী, বিপদ হতে উদ্ধারকারী ও মুক্তিদাতা বলে বিশ্বাস করা।

৮. কোন পীর-বুযুর্গকে শরিয়তের পরিবর্তণ বা সংশোধনের অধিকারী বলে বিশ্বাস করা।

৯. পীর-বুযুর্গদেরকে আল-াহ ও বান্দার মাঝে নৈকট্য অর্জণের মাধ্যম বলে বিশ্বাস করা।

১০. কাউকে আল-াহর নিকট সুপারিশ করার অধিকারী বলে বিশ্বাস করা। (তবে পরকালে যার জন্য অনুমতি হবে যেমনঃ নাবী-রাসূল ও ইমানদার গণ তারাই শুধু সুপারিশ করতে পারবে)

১১. কোন মানুষকে আল-াহর মত বা তার চেয়েও বেশী প্রিয় জানা।

১২. নাবী-রাসূল, ওলী-আওলিয়া, পীর-বুযুর্গ, গনক-জ্যোতিষী বা অন্য কাউকে 'আলেমূল গায়েব' অর্থাৎ গায়েব জানে বলে বিশ্বাস করা।

১৩. পীর-বুযুর্গ, ওলী-আওলিয়াগণের 'কাশফ' খোলা থাকে। আসমান-জমিন, আরশ-কুরসি, লৌহ-কলম কোথায় কি হচ্ছে সবকিছু তাদের নখদর্পে, তারা সবকিছু দেখতে পায় বলে বিশ্বাস করা। (তবে 'কারামাতুল আওলিয়া' যা সম্পূর্ণ আল-াহর ইচ্ছাধীন নিজস্ব কোন ক্ষমতা নয় সেটা বিশ্বাস করা যাবে)

১৪. পীর সাহেব মুরিদের অন্তরের সবকিছু দেখেন ও জানেন, তিনি মুরিদের অন্তরের গোয়েন্দা, মুরিদের অন্তরে তিনি ঢোকেন, বের হন আবার ঢোকেন আবার বের হন, মুরিদ কিছুই টের পায় না এধরণের বিশ্বাস করা।

১৫. পীরের ধ্যান করা, পীরকে অন্তরে হাজির-নাজির বিশ্বাস করা, পীরের বাড়ি বা মাজারের দিকে ফিরে যিকির-আযকার, তাসবীহ-তাহলীল ও দু'আ-মুনাজাত করা।

১৬. পীর-বুযুর্গ, ওলী-আওলিয়াদেরকে গাওছুল আযম (সবচেয়ে বড় ত্রানকর্তা), কুতুব, গাউস, বান্দা নেওয়াজ, গরীব নেওয়াজ (গরীবের দাতা) বলে বিশ্বাস করা। এবং তারা পৃথিবী পরিচালনা করে বলে বিশ্বাস করা।

১৭. মৃত পীর-বুযুর্গ, ওলী-আওলিয়াদের কারো উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা। কারো মাজার ঠান্ডা, আবার কারো মাজার গরম বলে বিশ্বাস করা।

১৮. মাজারওয়ালা কাছে প্রার্থণা করা, মাজারের নামে মান্নত করা, পশু যবাই করা, মাজারে সিজদা করা, মাজারের দিকে ফিরে সালাত আদায় করা ইত্যাদি।

১৯. মাজারওয়ালার দৃষ্টিআকর্ষণের জন্য মাজারের পাশে ই'তিকাফ করা।

২০. 'তাসাব্বুরে শায়েখ', 'ফানা ফিশ শায়েখ' যেমনঃ 'কামেল পীরের আদেশ পাইলে নাপাক শরাব দ্বারাও জায়নামাজ রঙ্গিন করিয়া তাহতে সালাত পড়।'[১৬৩], 'ফানা ফির রাসূল', 'ফানা ফিল-াহ' ইত্যাদির নামে নিজেকে আল-াহ দাবী করে 'আনাল হক্ব' (আমিই আল-াহ) বলে যিকির করা। যেমনঃ 'মানসুর হাল-াজ' করেছিল।[১৬৪]

এ জাতিয় শিরকি আক্বিদাহ বর্জণ করার জন্যই তালবিয়ার মধ্যে স্পষ্টভাবে উলে-খ করা হলো لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ 'লা শারীকা লাকা লাব্বাইক'।

৪. إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ 'ইন্নাল হামদা ওয়ান নিঅ'মাতা লাকা ওয়াল মূলক' এর শিক্ষনীয় বষয়

প্রথম শিক্ষা

তালবিয়ার এ অংশে 'ইন্নাল হামদা' বলে আল-াহ (সুবঃ) এর প্রশংসা করা হলো। যে কোন গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতে শুরুতে আল-াহর প্রশংসা করতে হয়। আর আল-াহর প্রশংসা করার জন্য সবচেয়ে উত্তম শব্দ হচ্ছে 'আল হামদ'। হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ

[১৬৩] দেখুন 'আশেক মা'শুক' আল ইসহাক প্রকাশনী পৃষ্ঠা ৪১।

[১৬৪] দেখুন আশেক মা'শুক' আল ইসহাক প্রকাশনী পৃষ্ঠা ৪১, ৫০, ৫১।

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : الْحَمْدُ رَأْسُ الشُّكْرِ ، مَا شَكَرَ اللَّهَ عَبْدٌ لا يَحْمَدُهُ

অর্থঃ "আবদুল-াহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্নিত আল-াহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'আল হামদু' শব্দটি সকল কৃতজ্ঞতা প্রকাশের শব্দের মূল। যে আল-াহর 'হামদ' করলো না সে কোন শুকরিয়াই আদায় করলো না।"[১৬৫]

এজন্য সালাতের শুরুতেও সুরায়ে ফাতেহা পাঠ করা হয়। যার প্রথম আয়াতেই রয়েছে 'আল হামদু' শব্দটি। হজ্জের শুরুতেও 'তালবিয়ার' মাধ্যমে শুরুতেই আল-াহর হামদ করা হলো।

দ্বিতীয় শিক্ষা

তালবিয়ার শেষাংশের মাধ্যমে সমস্ত নেয়ামত আল-াহ প্রদত্ত বলে স্বীকার করা হয়। বান্দা আল-াহর অসংখ্য নেয়ামত ভোগ করে যা গণনা করে শেষ করা যাবে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

{وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ} [النحل: ১৮]

অর্থঃ "আর যদি তোমরা আল-াহর নিআ'মত গণনা কর, তবে তা আয়ত্ব করতে পারবে না। নিশ্চয় আল-াহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১৬৬]

তাই আল-াহর নিয়ামত সমূহের স্বীকৃতি দেওয়া ও তার কৃতজ্ঞতা আদায় করা প্রতিটি ইমানদারের দায়িত্ব ও কর্তব্য। আল-াহর (সুবঃ) নিয়ামতে শুকরিয়া আদায় করলে আল-াহ (সুবঃ) নেয়া'মত বৃদ্ধি করে দেন। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছেঃ

{ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ} [إبراهيم: ৭]

অর্থঃ " 'যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের বাড়িয়ে দেব, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, নিশ্চয় আমার আযাব বড় কঠিন'।"[১৬৭] তালবিয়ার এ অংশের মাধ্যমে সকল নেয়ামত আল-াহর (সুবঃ) দান বলে স্বীকৃতি দিয়ে তার শুকরিয়া আদায় করা হলো।

তৃতীয় শিক্ষা

[১৬৫] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক ১৯৫৭৪।

[১৬৬] সুরা নাহল ১৮।

[১৬৭] সুরা ইব্রাহিম ৬।

তালবিয়ার এ অংশের মাধ্যমে মূলত: আল-াহর সার্বভৌমত্ব ও আল-াহর কমান্ডকে মেনে নেয়ার ঘোষণা করা হয়। বহু মানুষ এমন আছে যারা দাবী করে যে তারা মুসলিম। অথচ সাংবিধানিকভাবে আল-াহকে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক বলে বিশ্বাস করে না। বরং জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস বা মালিক বলে বিশ্বাস করে। অথচ আল-াহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করছেন:

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অর্থ:- 'বলুন ইয়া আল-াহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচছা ক্ষমতা দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচছা ক্ষমতা ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর আর যাকে ইচছা অপমানে পতিত কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল।" (আল ইমরান, ৩ ঃ ২৬) এছাড়া এ বিষয়ে কুরআনে একটি সুরাও রয়েছে। যার শুরুতেই আল-াহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন:

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [الملك/١]

অর্থ:- বরকতময় তিনি যার হাতে সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব। আর তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।" (সুরা মূলক:১)

জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল-াহর সার্বভৌমত্ব ও আল-াহর বিধান মানার অঙ্গিকার করাই হচ্ছে তালবিয়ার এ অংশের মূল শিক্ষা। যতক্ষণ পর্যন্ত জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল-াহর বিধানকে মেনে নিতে না পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি পূর্ণ মু'মীন হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [النساء/٦٥]

"না, হে মুহাম্মদ, তোমার রবের কসম, তারা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারেনা, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক হিসেবে মেনে নিবে। অতঃপর তুমি যাই ফয়সালা করবে সে ব্যাপারে তারা নিজেদের মনে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করবে না বরং ফয়সালার সামনে নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পন করবে।" (আন-নিসাঃ ৬৫)

এমনকি আল-াহর নাজিলকৃত বিধান দিয়ে যারা বিচার-ফয়সালা করে না তাদের কাছে বিচার চাওয়াও নিষেধ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (৬০) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا} [النساء: ৬০، ৬১

অর্থ: " তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবী করে যে, নিশ্চয় তারা ঈমান এনেছে তার উপর, যা নাযিল করা হয়েছে তোমার প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে তোমার পূর্বে। তারা তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে অস্বীকার করতে। আর শয়তান চায় তাদেরকে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত করতে। আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা আস যা আল-াহ নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে', তখন মুনাফিকদেরকে দেখবে তোমার কাছ থেকে সম্পূর্ণরূপে ফিরে যাচ্ছে।[১৬৮]

এখানে 'তাগুত' বলতে মানব রচিত আইনে যারা বিচার-ফয়সালা করে তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে। এখানে 'তাগুত' অর্থ শয়তান নয়। কেননা শয়তানের তো এমন কোন 'এজলাস' নাই যেখানে মানুষেরা দলে দলে বিচার ফয়সালা চাওয়ার জন্য যায়। বরং এখানে ঐ সকল মানব জাতীয় তাগুতকে বুঝানো হয়েছে যারা আল-াহর চোরের হাত কাঁটার বিধানকে বাদ দিয়ে, বিবাহিত যিনা-ব্যাভিচারীকে পাথড় ছুড়ে হত্যা করার পরিবর্তে বিকল্প আইন জেল-জরিমানা তৈরি করেছে। যারা আল-াহর হারামকৃত মদ, সুদ ও যিনা-ব্যাভিচারকে লাইসেন্স দিয়ে হালাল (বৈধ) করে দিয়েছে। যারা ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করে ধর্মীয় জীবনে আল-াহর বিধানকে মেনে চলে আর রাষ্ট্রীয় জীবনে মানব রচিত বিধানকে মেনে চলে। এক কথায় যারা কুরআনের কিছু মানে আর কিছু মানে না তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে। একারণেই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

অর্থ: "হে ঈমানদার গন! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। নিশ্চিত রূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সুরা বাকারা, ২ ঃ ২০৮)

---

[১৬৮] সুরা নিসা ৬০-৬১।

আপনার বাড়িতে যেরকম কোন মেহমান এসে যদি অর্ধেকটা দরজার ভিতরে প্রবেশ আর বাকি অর্ধেক দরজার বাহিরে রাখে আপনি তা মেনে নিবেন না। আপনি হয়তো রেগে বলবেন, জনাব! হয়তো ভিতরে প্রবেশ কর‍ুন নতুবা বের হয়ে যান। ঠিক তেমনিভাবে ইসলামেও পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করতে হবে। জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান মেনে চলা আর কোন কোন ক্ষেত্রে না মানা কোন মুসলিমের কাজ নয়। একারণেই আল-াহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন:

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

অর্থ: "তবে কি তোমরা কুরআনের কিছু মানবে আর কিছু মানবে না? যারা এরূপ করে পার্থিব জীবনে দূগর্তি ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই। কিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে। আল-াহ্ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন। (বাকারা, ২ ঃ ৮৫)

আজকে মুসলিম জাতির চরম অধঃপতনের কারণ এটাই যে তারা কুরআনের কিছু মানে আর কিছু মানে না। এজাতীয় লোকদের সম্পর্কে আল-াহ (সুব:) আরও ইরশাদ করেন:া

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقا

অর্থঃ "যারা আল-াহ্ ও তার রাসূলের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী তদুপরি আল-াহ্ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাসে তারতম্য করতে চায় আর বলে যে, আমরা কিছু মানি আর কিছু মানি না। এবং এর মধ্যবর্তী কোন (তৃতীয়) রাস্তা তৈরি করতে চায়। মূলত: এরাই হক্ব কাফের (প্রকৃত কাফের)।" (নিসা : ১৫০-১৫১)

এ আয়াত অনুযায়ী আজকে মুসলিম সমাজে যারা মাঝে মধ্যে সালাত আদায় করে, রমজান মাসে সিয়াম পালন করে আবার হজ্জ-ওমরাহও করে থাকে। কিন্তু ব্যাংকে, আদালতে, ব্যাবসা-বানিজ্যে, সংসদে, বঙ্গভবনে, পরিবারে, সমাজে ইসলামের আইন-কানুন মানে না বরং ক্ষেত্র বিশেষে বিরোধিতাও করে তারা কি মুসলিম থাকে? এ প্রসঙ্গে কুরআনের আরও একটি আয়াত উলে-খ করা যেতে পারে:

{ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ} [البقرة: ৮]

অর্থ: "আর মানুষের মধ্যে কিছু মানুষ এমন আছে, যারা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি আল-াহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি', অথচ তারা মুমিন নয়।"[১৬৯] তাহলে এরা কারা? কি এদের পরিচয়? মূলত: এদের আসল পরিচয়টা তুলে ধরা হয়েছে এর পূর্বে উলে-খিত আয়াতে। অর্থাৎ এরা হক্ব কাফের।

তাই হাজী সাহেবদেরকে তালবিয়ার শেষ অংশের মাধ্যমে আল-াহর সার্বভৌমত্ব ও তাঁর কমা‍ে মেনে নেয়ার ঘোষণা করতে হয় "ইন্নাল হামদা ওয়ান নিঅ'মাতা লাকা ওয়াল মূলক, লা শারীকা লাকা" বলে।

তালবিয়া ও তাকবীর থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

সালাতের তাহরিমা শুর‍ু হয় তাকবীর দিয়ে। আর হজ্জের ইহরাম শুর‍ু হয় তালবিয়া দিয়ে। সালাতে যেমন এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় এবং এক র‍ুকন থেকে আরেক র‍ুকনে যাওয়া হয় তাকবীরের মাধ্যমে তেমনিভাবে হজ্জেও তালবিয়ার মাধ্যমে প্রথম কাজ শুর‍ু হয়। তারপর তাওয়াফ শুর‍ু করার পূর্বে বন্ধ করা হয়। আবার মিনায় যাওয়ার পথে তালবিয়া পড়া হয়। মিনায় অবস্থানকালে বন্ধ থাকে। আবার আরাফাতে যাওয়ার পথে শুর‍ু হয়। আরাফাতের ময়দানে অবস্থানকালে বন্ধ থাকে। আবার আরাফাতের ময়দান থেকে মুযদালাফা যাওয়ার পথে তালবিয়া পড়তে হয়। মুযদালাফার মাঠে অবস্থানকালে বন্ধ থাকে। এরপর মুযদালাফা থেকে মিনায় যাওয়ার পথে চলতে থাকে। মিনায় 'জামারাতুল আকাবায়' পাথর মারার মাধ্যমে শেষ হয়ে যায়।

তাওয়াফের শিক্ষা

বায়তুল-ায় পৌঁছার পরে প্রথম কাজ হচ্ছে তাওয়াফ করা। হাদীসে বর্ণির্ত হয়েছে:

عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ

অর্থ: "আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল-াহ (সা:) যখন মক্কায় আগমন করলেন তখন সর্বপ্রথম অ'জু করলেন এরপর কাবা তাওয়াফ করলেন।"[১৭০]

---

[১৬৯] সুরা বাকারা ৮।

[১৭০] সহীহ বুখারী ১৬১৪; সহীহ মুসলিম ৩০৬০।

সারা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন বর্ণের মানুষগুলো এক পোষাকে এক পদ্ধতিতে বায়তুল-াহর চতুর্দিকে তাওয়াফ করছে। সকলেই তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর পাঠ করছে। কেউ দু'আ করছে, কেউবা তেলাওয়াত করছে সকলেই হাজরে আসওয়াদ থেকে শুর করছে। এর মাধ্যমে তাওহীদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যে পৃথিবীর সকল মানুষ এক আল-াহর ইবাদত করবে, এক রাসূলের আনুগত্য করবে, এক কুরআনের হুকুম মেনে চলবে, এক বায়তুল-াহর তাওয়াফ করবে। এটা ছাড়া কোন কিছু বিশ্ব মঞ্জিল, বিশ্ব আশেক, বিশ্ব ওলী, বিশ্ব .... হতে পারে না। এজন্য কুরআনুল কারীমে 'আলামীন' শব্দটি প্রথমত: আল-াহ (সুব:) এর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

[الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: ২}

অর্থ: "সমস্ত প্রশংসা আল-াহর জন্য যিনি গোটা জগৎ সমূহের রব (বিশ্ব রব)।"[১৭১]

দ্বিতীয়ত: কুরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে:

[إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ} [التكوير: ২৭ }

অর্থ: "নিশ্চয় এটা বিশ্ববাসীর জন্য 'যিকর' (উপদেশ/স্মরনিকা) (বিশ্ব কুরআন)।

তৃতীয়ত: রাসূলুল-াহ (সা:) সম্পর্কে বলা হয়েছে:

[وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ } [الأنبياء: ১০৭}

অর্থ: "আপনাকে শুধুমাত্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছে। (বিশ্ব নাবী)"[১৭২]

চতুর্থথ: বাইতুল-াহ সম্পর্কে বলা হয়েছে:

[إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ } [آل عمران: ৯৬ }

অর্থ: " নিশ্চয় প্রথম ঘর, যা মানুষের জন্য স্থাপন করা হয়েছে, তা মক্কায়। যা বরকতময় ও হিদায়াত বিশ্ববাসীর জন্য। (বিশ্ব কাবা)।[১৭৩]

অর্থাৎ বিশ্ব রবের নির্দেশে বিশ্ব রাসূলের তরিকা অনুযায়ী বিশ্ব কুরআনে বর্ণিত পথে বিশ্ব কাবাকে কেন্দ্র করে বিশ্ব মুসলিমকে ঐক্য বদ্ধ হতে হবে। তাওয়াফের মাধ্যমে মূলত: সেই শিক্ষাই প্রকাশ করা হয়। অন্য কোন ঘর, মঞ্জিল, মাজার,

[১৭১] সুরা ফাতিহা।

[১৭২] সুরা আম্বিয়া ১০৭।

[১৭৩] সুরা আল ইমরান ৯৬।

ইত্যাদি তাওয়াফ করা যাবে না। কুরআনুল কারীমে শুধু বাইতুল-াহকেই তাওয়াফ করতে বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে:

[وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ২৯}

অর্থ: "অতপর তারা যেন সর্বাধিক প্রাচীন ঘরকে (বাইতুল-াহকে) তাওয়াফ করে।"[১৭৪] যেহেতু বিশ্ব মুসলিমরা এক কাবাকে কেন্দ্র করে ঐক্যবদ্ধ হবে তাই কাবাকে পৃথিবীর মধ্যখানে নির্মাণ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। পৃথিবীর প্রথম মানচিত্র আঁকেন একজন মুসলিম ভৌগলিক 'আলী আল দুরসী'। সময়টি ছিল ১১৫৪ সাল। তাঁর মানচিত্রে দক্ষিণ মের ছিল উপরে। সে অবস্থায়ও কাবা ছিল পৃথিবীর মাঝখানে। পরবর্তীতে পশ্চিমারা এটিকে উল্টিয়ে দিয়ে উত্তর মেরকে উপরে নিয়ে মানচিত্র আঁকে। সেক্ষেত্রেও কাবা শরিফ পৃথিবীর মাঝখানেই থাকে। সুতরাং هُدًى لِلْعَالَمِينَ অর্থাৎ কাবা ছাড়া অন্য কোন ঘরকে বা মঞ্জিলকে তাওয়াফ করা অথবা বিশ্ব মঞ্জিল ঘোষণা করা যাবে না। কোন কবর, কোন গাছ, কোন পাথর, কোন দরগা, কোন মাজার তাওয়াফ করা যাবে না। তাওয়াফ শুধু স্রষ্টার ঘরের জন্যই সংরক্ষিত। সৃষ্টির কোন ঘর, বাড়ি, মাজার, খানকাহ, দরগাহ স্রষ্টার ঘরের সঙ্গে তুলনা করা যাবে না। বাইতুল-াহর তাওয়াফ কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। একটি আয়াত পূর্বে উলে-খ করা হয়েছে। নিম্নে আরো দুইটি আয়াত পেশ করা হলো যার মধ্যে বাইতুল-াহর তাওয়াফের কথা উলে-খ রয়েছে। তাহলো:

{وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [البقرة: ১২৫]

অর্থ: " আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম যে, 'তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, 'ইতিকাফকারী ও রকূকারী-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র কর'।"[১৭৫]

{وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ } [الحج: ২৬]

অর্থ: "আর স্মরণ কর, যখন আমি ইবরাহীমকে সে ঘরের (বায়তুল-াহ্‌র) স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম, 'আমার সাথে কাউকে শরীক করবে

[১৭৪] সুরা হজ্জ ২৯।

[১৭৫] সুরা বাকারা ২/১২৫।

না এবং আমার ঘরকে পাক সাফ রাখবে তাওয়াফকারী, রুকূ-সিজদা ও দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর জন্য'।"[১৭৬]

হজরে আসওয়াদ চুমু দেওয়ার শিক্ষা

হজরে আসওয়াদ চুমা দেওয়া সহীহ হাদীর দ্বারা প্রমানিত। যেমন:

عَنْ عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنْ السَّبْعِ

অর্থ: "আবদুল-াহ ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল-াহ সা: যখন মক্কায় আগমন করেন তখন আমি তাকে দেখেছি যে তিনি হজরে আসওয়াদের কোণায় স্পর্শ করেছেন এবং সাত তাওয়াফের প্রথম তিনি তাওয়াফে 'রমল' করেছেন।"[১৭৭]

এ হাদীসে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করার কথা স্পষ্টভাবে উলে-খ করা হয়েছে। নিম্নের হাদীসটিতে চুমু খাওয়ার কথাও উলে-খ আছে। তবে সাথে সাথে রাসূলুল-াহ (সা:) এর ইউনিভার্সিটির ছাত্র ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা:) পাথর স্পর্শ করার ও চুমু দেওয়ার কারণও উলে-খ করে দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে রাসূল (সা:) এর আনুগত্য করা ও তার সুন্নাতের অনুসরণ করা। পাথরের কোন ক্ষমতা আছে, কারো উপকার করতে পারে, কারো ক্ষতি করতে পারে অথবা কাউকে কিছু দিতে পারে বা কোন কিছু থেকে বাঁধা দিতে পারে এ জাতিয় আক্বিদাহ পোষণ করা সম্পূর্ণ শিরক। এসব উদ্দেশ্যে পাথর স্পর্শ করা বা চুমু দেওয়া হারাম। তাই ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা:) বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। হাদীস:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ (صحيح البخاري)

অর্থ: "ওমর বিন খাত্তাব (রা:) 'হাজরে আসওয়াদ' এর কাছে এলেন। অতপর পাথরে চুমু খেলেন। তারপর বললেন: আমি জানি তুমি একটি পাথর ছাড়া কিছুই নও। তুমি কারো ক্ষতিও করতে পার না উপকারও করতে পার না। আমি যদি

[১৭৬] সুরা হজ্জ ২২/২৬।

[১৭৭] সহীহ বুখারী ১৬০৩; সহীহ মুসলিম ৩১০৯; সুনানে নাসায়ী ২৯৪২।

রাসূলুল-াহ (সা:) কে তোমাকে চুমু দিতে না দেখতাম তাহলে আমি তোমাকে চুমু দিতাম না।[১৭৮]

মুহতারাম হাজীসাহেব! জেনে রাখুন, যে পাথরে আল-াহর রাসূল (সা:) চুমু খেয়েছেন, স্পর্শ করেছেন, যে পাথর জান্নাত থেকে নাজিল করা হয়েছে, যে পাথর কাবার সাথে লেগে আছে সেই পাথরেরই যখন কোন উপকার-অপকারের ক্ষমতা নেই। তখন অন্যান্য পাথরের কি ক্ষমতা থাকতে পারে। সুতরাং যারা বিভিন্ন রকমের পাথরের ক্ষমতায় বিশ্বাসী হয়ে পাথর ব্যবহার করছেন তারা এই শিরকের থেকে বাঁচার ব্যাপারে সতর্ক হোন।

আরাফাতের ময়দানের দু'আ ও শিক্ষা

আরাফাতের ময়দানে বেশি বেশি 'লা ইলাহা ইল-াল-াহ' পাঠ করতে হয়। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلى : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

অর্থ : " রাসূলুল-াহ (সা:) ইরশাদ করেন, সবচেয়ে উত্তম দু'আ আরাফাতের ময়দানের দু'আ, এবং সবচেয়ে উত্তম কথা যা আমি বলেছি এবং আমার পূর্বের সকল নাবীগণ বলেছেন: তা হচ্ছে

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

উচ্চারণ: "লা ইলাহা ইল-াহু ওহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুলি- শাইইন কাদীর।"

অর্থ: "আল-াহ ব্যতিত আর কোন (হক্ব) ইলাহ নেই। তিনি এক ও একক তার কোন শরীক নেই। সকল ক্ষমতার মালি কেবল মাত্র তিনিই। সকল প্রশংসার মালিক তিনিই। তিনি সব কিছুর উপর শক্তিশালী।"[১৭৯]

এটিই আরাফাতের ময়দানের পড়ার জন্য সবচেয়ে উত্তম দু'আ।

আরাফাতের ময়দানের বিশ্ব মুসলিমের এই মহাসম্মেলনে এই দু'আ ইঙ্গীত করে যে, মুসলিমদের ঐক্য হতে পারে শুধুমাত্র তাওহীদের ভিত্তিতেই। অন্যকোন দল-

[১৭৮] সহীহ বুখারী ১৫৯৭; সহীহ মুসলিম৩১২৯; সুনানে তিরমিজি ৮৬১ ; আবূ দাউদ ১৮৭৫।

[১৭৯] সুনানে তিরমিজী ৩৬৫৫।

ফেরকা বা তরীকা ইত্যাদির মাধ্যমে নয়। এজন্যই পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران: ৬৪]

অর্থ: " বল, 'হে কিতাবীগণ, তোমরা এমন কথার দিকে আস, যেটি আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা একমাত্র আল-াহ ছাড়া কারো ইবাদাত না করি। আর তার সাথে কোন কিছুকে শরীক না করি এবং আমাদের কেউ কাউকে আল-াহ ছাড়া রব হিসাবে গ্রহণ না করি'। তারপর যদি তারা বিমুখ হয় তবে বল, 'তোমরা সাক্ষী থাক যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম।"[১৮০]

এ আয়াতে আল-াহ (সুব:) আমাদেরকে ঐক্যের সুত্র বাতলে দিলেন। আজকে অনেকেই ঐক্যের কথা বলেন। আর সেই ঐক্যের কারণে আরেকটি দলের সৃষ্টি হয়। যেমন: বাংলাদেশে ইসলামী ঐক্যজোট নামে ৫/৬টি দল রয়েছে। অথচ আল-াহ (সুব:) বলেছেন:

{وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} [آل عمران: ১০৩]

অর্থ: " আর তোমরা সকলে আল-াহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো না।"[১৮১]

একারণেই আরাফাতের ময়দানে 'তাওহিদে'র কালিমা বেশি বেশি পড়তে বলা হয়েছে। এখানে কোন দল নেই, কোন দলের পতাকা নেই, কোন তরিকার যিকির নেই, কোন পীরের ধ্যান করা নেই, কোন আঞ্চলিক পরিচয় নেই বরং সকল বর্ণ ও আঞ্চলিকতার উর্দ্ধে উঠে এক আল-াহ, এক রাসূল, এক কুরআন, এক কিবলা, এক কালিমা ও এক ইসলামের পরিচয়ে সকলেই মুসলিম হিসাবে পরিচিত। কারো স্বতন্ত্র কোন পরিচয় নেই। ইসলামের কারণেই সকলের পারস্পারিক ভালবাসা, বন্ধুত্ব ও সহযোগীতা। এখানেই তারা সারা বিশ্বের সকল ভাইদের সঙ্গে পরিচিত হন। একত্রে মাঠে-ময়দানে অবস্থান করেন। আরব-আজম, সাদা-কালো, ধণি-গরীব, আমীর-ফকীর, কারো কোন ভেদাভেদ নেই। সকলেই এক আল-াহর তাওহীদের কালিমা উচ্চারণ করছে। রাসূলুল-াহ (সা:) যথার্থই বলেছেন

---

[১৮০] সুরা আল ইমরান ৬৪।

[১৮১] সুরা আল ইমরান ১০৩।

عن أبي نضرة حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه و سلم في وسط أيام التشريق فقال يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد الا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى (مسند أحمد بن حنبل)

অর্থ: "রাসূলুল-াহ (সা:) 'আইয়্যামে তাশরিকে'র মাঝামাঝি সময়ে খুতবায় বলেছেন, হে লোকসকল নিশ্চই তোমাদের রব এক। তোমাদের পিতা এক (আদম)। সুতরাং আরবের কোন বিশেষ মর্যাদা নেই আজমের উপর। আজমের কোন বিশেষ মর্যাদ নেই আরবের উপর। লালের কোন মর্যাদা নেই কালোর উপর। কালোর কোন বিশেষ মর্যাদা নেই লালের উপর। মর্যাদার পার্থক্য শুধুমাত্র 'তাকওয়া'র ভিত্তিতে।"[১৮২]

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ

অর্থ: "আবূ মূসা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল-াহ (সা:) ইরশাদ করেন 'নিশ্চয় এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য বিল্ডিংয়ের মত। যার একটি (ইট) অপরটিকে শক্তিশালী করে এবং তিনি এক হাতের আঙ্গুল সমূহ আরেক হাতের আঙ্গুল সমূহের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দেখালেন।"১৮৩

এই দৃশ্য দেখেই আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ এবং তাদের আশে পাশের ফেরেশতাগণ আল-াহর কাছে দু'আ করতে থাকেন। যা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ} [৭] {رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (৮) وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [غافر: ৮، ৯]

---

[১৮২] মুসনাদে আহমদ ২৩৫৩৬।

[১৮৩] সহীহ বুখারী ৪৮১; সহীহ মুসলিম ৬৭৫০;

অর্থ: " যারা আরশকে ধারণ করে এবং যারা এর চারপাশে রয়েছে, তারা তাদের রবের প্রশংসা সহ তাসবীহ পাঠ করে এবং তাঁর প্রতি ঈমান রাখে। আর মুমিনদের জন্য ক্ষমা চেয়ে বলে যে, 'হে আমাদের রব, আপনি রহমত ও জ্ঞান দ্বারা সব কিছুকে পরিব্যপ্ত করে রয়েছেন। অতএব যারা তাওবা করে এবং আপনার পথ অনুসরণ করে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। আর জাহান্নামের আযাব থেকে আপনি তাদেরকে রক্ষা কর ন'। 'হে আমাদের রব, আর আপনি তাদেরকে স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করান, যার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন। আর তাদের পিতা–মাতা, পতি–পত্নি ও সন্ড়ন–সন্ড়তিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম সম্পাদন করেছে তাদেরকেও। নিশ্চয় আপনি মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়।' আর আপনি তাদের অপরাধের আযাব হতে রক্ষা কর ন এবং সেদিন আপনি যাকে অপরাধের আযাব থেকে রক্ষা করবেন, অবশ্যই তাকে অনুগ্রহ করবেন। আর এটিই মহাসাফল্য।" [১৮৪]

এই আয়াতের মাধ্যমে প্রতীয়মান হলো যে, শুধু মানুষের মধ্যেই নয় বরং মানুষ এবং ফেরেশতাদের মধ্যেও ঐক্যের সুত্র হচ্ছে তাওহীদ।

বিদায় হজ্জে রাসূলুল-াহ (সা:) এর ঐতিহাসিক ভাষণ ও তার শিক্ষা

রাসূলুল-াহ (সা:) তার জীবনে একবারই হজ্জ করেন। এসময় তিনি আরাফাত, মুযদালিফা ও মিনায় কয়েকটি স্থানে ভাষণ দেন। যা মুসলিম জাতির কাছে রাসূল (সা:) এর বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণ হিসাবে পরিচিত। এসময় তিনি সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন:

عن جَابِر يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– يَرْمِى عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ « لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّى لاَ أَدْرِى لَعَلِّى لاَ أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِى هَذِهِ

অর্থ: "জাবের (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রাসূলুল-াহ (সা:) কে দেখলাম যে, তিনি 'ইয়াওমে নাহার' (জিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে) তার বাহণের উপর বসে 'জামারা'য় কংকর নিক্ষেপ করছেন এবং বলছেন: 'তোমরা আমার থেকে হজ্জের কাজ সমূহ ভালভাবে শিখে নাও। কেননা আমি জানিনা এই হজ্জের পর আমি আর হজ্জ করতে পারব কিনা?।"[১৮৫]

এভাষণে তিনি অনেক বিষয় আলোচনা করেছেন। তারথেকে গুর ত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা হলো।

[১৮৪] সুরা গাফের/আল মু'মিন ৭-৯।

[১৮৫] সহীহ মুসলিম ৩১৯৭।

১. কুরআন, সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা, বিদআত বর্জণ করা।

রাসূলুল-াহ (সা:) তাঁর ভাষণে কুরআন-সুন্নাহকে শক্তভাবে ধারণ করা ও তার পরিপন্থী সকল কিছুকে বর্জণ করার প্রতি গুর ত্বারোপ করেন। কেননা কেয়ামতের পূর্বে বিভিন্ন ফেরকা, বিভিন্ন দল, বিভিন্ন তরীকা ও ব রকমের মতভেদ তৈরী হওয়ার আশংকাবোধ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন:

مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ».

অর্থ: "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার পর জীবিত থাকবে সে অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার তরীকা ও খোলাফায়ে রাশেদীনদের তরীকা শক্তভাবে ধারণ করবে। মাড়ির দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরবে। সাবধান! তোমরা নতুন নতুন আবিষ্কৃত ইবাদত থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা নব আবিষ্কৃত সকল ইবাদতই বিদআত। আর সকল বিদআতই গোমরাহী।"[১৮৬]

তাছাড়া আরেকটি হাদীসে আরও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন:

عن عبد الله بن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم خطا ثم قال : " هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه " ثم قرأ (إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه)

অর্থ: "আবদুল-াহ ইবনে মাসঈদ (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল-াহর রাসূল (সা:) আমাদের সামনে একটি দাগ টানলেন এবং বললেন এটি আল-াহর রাস্তা। এরপর এই দাগের ডানে ও বামে আরো অনেকগুলো রেখা টানলেন এবং বললেন এ হচ্ছে অনেকগুলো রাস্তা যার প্রতিটি রাস্তার মুখে মুখে একেকটি শয়তান বসে আছে, যারা ঐ রাস্তায় প্রবেশ করার জন্য আহবান করে। এর পরে তিনি প্রমাণ স্বরূপ কুরআনের এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন। আয়াত:

{ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [الأنعام: ১৫৩]

অর্থ: " আর এটি তো আমার সোজা পথ। সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে

[১৮৬] সুনানে আবূ দাউদ ৪৬০৯।

বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এগুলো তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।(সুরা আল আনআ'ম ৬/১৫৩।)"[১৮৭]
এই হাদীসে পরিষ্কার হয়ে গেল আল-াহর রাস্তা একটাই। শয়তানের রাস্তা অনেক। সরল রেখা একটাই হয়। বক্র রেখা অনেক হয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

{ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ} [النحل: ৯]

অর্থ: "আর সঠিক পথ বাতলে দেয়া আল-াহর দায়িত্ব, এবং **পথের মধ্যে কিছু আছে বক্র**। আর তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তবে তোমাদের সকলকে হিদায়াত করতেন।"[১৮৮] সুতরাং কোন বক্র পথের অনুসরন করা যাবে না।
আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে আরও সুন্দরভাবে বলা হয়েছে:

عن أنس بن مالك ،قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن بنى إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة . وإن أمتى ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة .كلها في النار ، إلا واحدة . وهى الجماعة "

অর্থ: "আনাস ইবনে মালেক (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল-াহ (সা:) বলেছেন, বনি ইসরাইল একত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল। আমার উম্মত বাহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। সকল দলই জাহান্নামে যাবে তবে একটি দল ব্যতিত। তারা হচ্ছে 'আল জামাআহ' ।[১৮৯] অন্য আরেকটি হাদীসে আরেকটু ভিন্নভাবে বলা হয়েছে।

عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِنْ كانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلاَنِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذلِكَ ، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

অর্থ: "আবদুল-াহ ইবনে আমর (রা:) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন রাসূলুল-াহ (সা:) বলেছেন, আমার উম্মতের উপর ঐসকল অবস্থা অতিক্রম করবে যা বনি ইসরাইলদের উপর আবর্তিত হয়েছিল। যেভাবে (উভয় পায়ের) একটি জুতা আরেকটি জুতার সঙ্গে বরাবর হয়। এমনকি তাদের মধ্যে যদি কেউ নিজের

[১৮৭] সুনানে দারেমী ২০২; মুসনাদে আহমদ ৪১৪২; সুনানে বাইহাকী ৬২৯৭।
[১৮৮] সুরা আন নাহাল ১৬/৯।
[১৮৯] সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৯৯৩।

মায়ের সঙ্গে প্রকাশ্যে যিনায় লিপ্ত হয়ে থাকে। তাহলে আমার উম্মতের মধ্যেও এমন লোক পাওয়া যাবে যে ঐ কাজ করবে। আর নিশ্চয়ই বনি ইসরাইল বাহত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মত তিহাত্তর ফিরকায় বিভক্ত হবে। তারা সকলেই জাহান্নামে যাবে শুধুমাত্র একটি মিল-াত (জামাআহ) ব্যতিত। আর তা হচ্ছে আমি এবং আমার সাহাবীগণ যার উপরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছি। এই পথে ও মতে যারা থাকবে কেবলমাত্র তারাই জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে।[১৯০]
এই হাদীসে আমাদের প্রতি পূর্ণ দিক নির্দেশনা রয়েছে। যে বিভিন্ন দল, বিভিন্ন ফেরকা, বিভিন্ন তরীকা যখন জন্ম হবে তখন এই সমস্ত সকল ফিরকাহ বর্জণ করে রাসূলুল-াহ (সা:) ও সাহাবায়ে কেরামদের তরীকার অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। বর্তমানে যারা বিভিন্ন তরীকা, বিভিন্ন ফেরকা ও বিভিন্ন দলের অনুসরণ করছেন তাদের এই তরীকা, ফেরকাহ ও দল সমূহ কি রাসূল (সা:) এর যুগে ছিল? এগুলো যাদের নামে তৈরী করা হয়েছে যেমন: চিশতী, কাদেরী, নকশাবন্দী, মুজাদ্দেদী ইত্যাদি তাদেরকি জন্ম হয়েছিল? না! অবশ্যই না। তাহলে এগুলো বর্জণ করতে হবে।

প্রশ্ন: আমরাতো রাসূল (সা:) কে দেখি নাই। রাসূল (সা:) এর সাহাবীদেরও দেখি নাই তাহলে আমরা কি করে জানবো যে রাসূলুল-াহ (সা:) ও সাহাবাদের পথ ও মত কোনটি ছিল? তাছাড়া প্রতিটি ফেরকা বা দলের লোকেরাইতো নিজেদেরকে রাসূল (সা:) এর প্রকৃত অনুসারী বলে দাবী করে। তাহলে কোনটি হক ও কোনটি বাতিল তা আমরা কি করে জানতে পারি?
উত্তর: হ্যা! এটি একটি খুব গুর"ত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যই মূলত: এই প্রসঙ্গটি তুলে ধরেছি। কেননা রাসূলুল-াহ (সা:) তার বিদায় হজ্জের ভাষণে এই প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ

অর্থ: "আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিষ রেখে যাচ্ছি যা শক্তভাবে ধারণ করলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হলো 'কিতাবুল-াহ' (আল-াহর কুরআন)।[১৯১] অপর হাদীসে উলে-খ করা হয়েছে:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللَّهِ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

[১৯০] মুসতাদরাকে হাকেম ৪৪৪; সুনানে তিরমিজি ২৬৪১।
[১৯১] সহীহ মুসলিম ৩০০৯।

অর্থ: "রাসূলুল-াহ (সা:) বলেন আমি তোমদের মাঝে এমন দুটো জিনিষ রেখে যাচ্ছি যেদুটো জিনিষকে তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত শক্তভাবে ধারণ করে রাখবে ততক্ষণ পর্যন্ত গোমরাহ হবে না। সেদুটো জিনিষ হচ্ছে 'আল-াহর কিতাব (কুরআন) ও রাসূলের সুন্নাহ (সহীহ হাদীস)।[১৯২] সুতরাং যদিও আমদের মাঝে রাসূল (সা:) বা সাহাবাদের কেউ নেই কিন্তু কিতাবুল-াহ ও সুন্নাতে রাসূল (সা:) আমাদের মাঝে ঠিকই আছে। আমরা বিরোধপূর্ণ বিষয়ে ঐ দুটো জিনিষ থেকেই ফায়সালা নিব। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا } [النساء: ৫৯]

অর্থ: " অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল-াহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও– যদি তোমরা আল-াহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।"[১৯৩]

এ আয়াতে আল-াহর কাছে প্রত্যার্পণ কর বলতে কুরআনুল কারীমকে বুঝানো হয়েছে। আর রাসূলের কাছে প্রত্যার্পণ কর বলতে সহীহ হাদীসকে বুঝানো হয়েছে। অতএব কুরআন ও সুন্নাহর সহিত যার কথা মিলবে তার কথা মানা যাবে। আর কুরআন-সুন্নাহের সাথে যার কথা মিলবে না তার কথা মানা যাবে না সে যতবড় ব্যক্তিই হোক না কেন। আমরা কুরআন-সুন্নাহ দিয়ে আলেম-বুযুর্গ, মুর-ব্বী, পীর-মাশায়েখ, ওলী-আওলীয়াদের পরিমাপ করবো। ওলী-বুযুর্গদের দিয়ে কুরআন-সুন্নাহকে নয়। আমরা যখনই কুরআন-সুন্নাহের দিকে মানুষকে আহবান করি তখন মানুষেরা কুরআন ও সুন্নাহকে বাদ দিয়ে পীর-বুযুর্গ বা মুর-ব্বীদেরকে অনুসরণ করে। আর বলে এত বড় বড় আলেমরা কি কম বুঝেছেন? তারা কি ভুল করেছেন? ইত্যাদি। না! আর এগুলো বলা যাবে না!! কুরআন-সুন্নাহর সহীহ দলীলের অনুসরণ করতে হবে। বিদায় হজ্জের ভাষণে সে কথাই বলা হয়েছে।

২. ইসলামের পরিপূর্ণতা লাভ ও তার শিক্ষা

বিদায় হজ্জের এক পর্যায়ে রাসূলুল-াহ (সা:) সাহাবায়ে কেরামদেরকে বললেন,

وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّى فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ .

[১৯২] মুআত্তায়ে মালেক ২৬৪০; মুসতাদরাকে হাকেম ৩১৯।
[১৯৩] সুরা নিসা ৪/৫৯।

অর্থ: "তোমাদেরকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (আমি আমার দায়িত্ব ঠিকমত আদায় করলাম কিনা?) তখন তোমরা কি উত্তর দিবে?[১৯৪]

কারন আমাকে আল-াহ (সুব:) আদেশ করেছেন

{ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} [المائدة: ৬৭]

অর্থ: "হে রাসূল, তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে, তা পৌঁছে দাও আর যদি তুমি না কর তবে তুমি তাঁর রিসালাত পৌঁছালে না।"[১৯৫]

আমি কি আমার সে দায়িত্ব ঠিকমত পৌঁছিয়েছি? এভাবে তিনি সাহাবায়ে কেরামদেরকে প্রশ্ন করলেন। সাহাবাগণ উত্তর দিলেন:

قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ. فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ « اللَّهُمَّ اشْهَدِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ». ثَلاَثَ مَرَّاتٍ

অর্থ: "হ্যাঁ! আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয়ই আপনি আল-াহর দেওয়া রেসালাত আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, আল-াহর দেয়া আমানত আপনি ঠিকমত আদায় করেছেন এবং উম্মতের জন্য কল্যাণ কামনা করেছেন। একথা শুনে তিনি শাহাদাৎ আঙ্গুলকে আসমানের দিকে উঠাচ্ছিলেন আবার লোকদের দিকে ইঙ্গীত করছিলেন আর বলছিলেন, হে আল-াহ তুমি সাক্ষ্য থাক! একথা তিনবার বললেন।"[১৯৬] এরপরই সুরায়ে মায়েদার ঐতিহাসিক আয়াতটি নাযিল হলো। আয়াত:

{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: ৩]

অর্থ: "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নেয়ামতকে সমাপ্ত করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে ইসলামকেই মনোনীত করলাম।"[১৯৭]

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

[১৯৪] সহীহ মুসলিম ৩০০৯।
[১৯৫] সুরা মায়েদা ৬৭।
[১৯৬] সহীহ মুসলিম ৩০০৯।
[১৯৭] সুরা মায়েদাহ ৫/৩।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا قَالَ أَيُّ آيَةٍ قَالَ{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا}قَالَ عُمَرُ قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ

অর্থ: "ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একজন ইয়াহুদী তাকে উদ্দেশ্য করে বললো, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনাদের কিতাবে একটি আয়াত রয়েছে যা আপনারা পাঠ করে থাকেন। ঐ আয়াতটি যদি আমাদের ইয়াহুদীদের উপর নাযিল হতো তাহলে আমরা সেই দিবসটিকে ঈদের দিন হিসাবে পালন করতাম। ওমর ইবনে খাত্তাব (রা:) জিজ্ঞেস করলেন সেটি কোন আয়াত? সে উপরের ঐ আয়াতটির কথা বললো। তখন ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা:) বললেন, ঐ আয়াতটি কোন দিন, কোথায়, কি অবস্থায় নাযিল হয়েছিল তা আমরা জানি। রাসূলুল-াহ (সা:) আরাফাতের ময়দানে জুমুআর দিনে দাঁড়িয়মান অবস্থায় আয়াতটি নাযিল হয়েছিল। (অর্থাৎ তোমরা ঐ দিবসটিকে ঈদের দিন বলে আখ্যায়িত করতে। আর আমরা ঐ দিবসটিকে দুই ঈদের দিন হিসাবে পালন করেছি। প্রথমত: জুমুআর দিন। দ্বিতীয়ত: আরাফাতের দিন।)[১৯৮]

আয়াতের প্রথমাংশের শিক্ষা

প্রশ্ন: এই আয়াতের মধ্যে এমন কি বিষয় রয়েছে যার কারণে আয়াতটি এতো গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তর: হ্যা! এই আয়াতের প্রতিটি অংশই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমাংশে বলা হয়েছে: "তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম" এর চেয়ে আর সুসংবাদ কি হতে পারে!! কেননা কোন জিনিষ পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরে তার ভিতরে আর কোন জিনিষ সংযোজন বা তার থেকে আর কিছু বিয়োজন করা যায় না। মনে করুন, একটি বিল্ডিংয়ের নির্মাণ কাজ পরিপূর্ণ হয়ে গেল। এখন যদি কোন ব্যক্তি একটি স্বর্ণের ইট অথবা হীরকের তৈরী ইট নিয়ে হাজির হয় আর বলে যে এটা এই বিল্ডিংয়ের কোন এক জায়গায় স্থাপন করুন। তখন আপনি বলবেন, না! এটি লাগানোর আর কোন সুযোগ নেই। কেননা আমার বিল্ডিংয়ের কাজ পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। এখন যদি এটিকে লাগাতে হয় তাহলে ঐ পরিমান

[১৯৮] সহীহ বুখারী ৪৪; সহীহ মুসলিম ৭৭১১।

জায়গা ভাঙ্গতে হবে। ঠিক তেমনিভাবে এ আয়াতের মাধ্যমে ইসলামের ইমারতকে পরিপূর্ণ করা হয়েছে। এরমধ্যে নতুন কোন ইবাদত, তরীকা ইত্যাদি প্রবেশ করানোর কোন সুযোগ নেই। যদি করাতে হয় তাহলে রাসূল (সা:) এর মাধ্যমে যে দ্বীন পরিপূর্ণতা লাভ করেছে তাকে ভাঙ্গতে হবে। এজন্যই রাসূলুল-াহ (সা:) ইরশাদ করেছেন:

وعن حسان قال : " ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة . " رواه الدارمي"

অর্থ: "যখন কোন জাতি তাদের দ্বীনের মধ্যে বিদআত প্রবেশ করায় তখন আল-াহ (সুব:) তাদের দ্বীন থেকে ঐ পরিমান সুন্নত তুলে নেন যা কিয়ামত পর্যন্ত আর কখনো ফিরে আসে না।[১৯৯]

একারনেই ইমাম মালেক (র:) বলেছেন,

والعلماء منهم الإمام مالك – رحمه الله – حيث قال : (من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا – صلى الله عليه وسلم – خان الرسالة لأن الله يقول : { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا)

অর্থ: "যে ব্যক্তি ইসলামের ভিতরে কোন বিদআত প্রবেশ করালো আবার সেটিকে বেদআতে হাসানা বলে আখ্যায়িত করলো সে যেন দাবী করলো যে মুহাম্মদ (সা:) রেসালাতের দায়িত্ব আদায় করার ক্ষেত্রে খিয়ানত করেছেন। কেননা আল-াহ (স:) বলছেন, "আজকে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম"। আর বিদআতী বিদআত তৈরী করার মাধ্যমে জানিয়ে দিল যে ইসলাম পরিপূর্ণ হয় নাই। বরং অসম্পূর্ণ রয়েছে। তাই সে বিদআত তৈরী করে পরিপূর্ণ করছে। জেনে রেখ, আল-াহ (সুব:) যখন দ্বীনকে পরিপূর্ণ বলে ঘোষণা করেছেন তখন যা কিছু দ্বীনের অংশ হিসাবে অন্তর্ভূক্ত ছিল না তা এখনও দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত বলে গন্য হবে না। কেননা আল-াহ (স:) বলছেন, "আজকে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম"।"[২০০] সুতরাং কোন বিদআতী আমল ইসলামে তৈরী করা যাবে না।

প্রশ্ন: যদি সকল বিদআত খারাপ হয় তাহলে রাসূলের যুগে মাইক ছিল না, মোবাইল ছিল না, উড়োজাহাজ ছিল না তাহলে এগুলো কি বিদআত নয়?

[১৯৯] মিশাকতুল মাসাবীহ ১৮৮।

[২০০] মুহাব্বাতুর রাসূল বাইনাল ইত্তিবায়ি ওয়াল ইবতিদায়ী' ১/২৮৪।

উত্তর: এ প্রশ্নের ভিত্তি মূলত: বিদআতের অর্থ না জানার উপর। কেননা, বিদআত বলা হয় **الاحداث في الدين ما لا اصل له** অর্থ: "দ্বীন ইসলামের ভিতরে সওয়াবের উদ্দেশ্যে ইবাদত আকারে কুরআন-সুন্নাহর দলীল-প্রমাণ ছাড়া কোন কিছু নতুনভাবে তৈরী করা" অথবা কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে প্রমানিত কোন ইবাদতের সঙ্গে মনগড়া কোন পদ্ধতি অথবা শর্ত জুড়ে দেওয়া। বিদআতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিভিন্ন আলেমদের বক্তব্য তুলে ধরা হলো:

ইমাম ইবনে তাইমিয়া

বিদআতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র:) বলেন:

إن البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله ، وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب

অর্থ: "নিশ্চয়ই দ্বীন ইসলামের ভিতরে বিদআত হচ্ছে ঐ সকল বিষয় যা আল-াহ (সুব:) এবং আল-াহর রাসূল (সা:) শরীয়া'হ আকারে নির্ধারণ করেন নাই। এবং ফরজ বা মুস্তাহাব কোন আকারেই নির্দেশ দেন নাই।"[২০১]

ইমাম ইবনে রজব

ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী (র:) বলেন:

والمراد بالبدعة : ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه ، وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا ، وإن كان بدعة لغة

অর্থ: "বিদআত বলতে এমনসব ইবাদতকে বুঝায় যা প্রমাণ করার জন্য শরীয়তে কোন ভিত্তি নাই। আর যেগুলোর ভিত্তি আছে সেগুলোকে কোন কোন ক্ষেত্রে শাব্দিক অর্থে বিদআত বললেও শরীয়তের পরিভাষায় বিদআত নয়।"[২০২]

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী

প্রসিদ্ধ হাদীস বিশারদ, সহীহ আল বুখারীর ভাষ্যকর ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (র:) 'সকল বিদআত গোমরাহী' এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন:

والمراد بقوله : كل بدعة ضلالة : ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام

অর্থ: " 'সকল বিদআত গোমরাহী' বলতে ঐ সকল ইবাদতকে বুঝানো হয়েছে যা কোন প্রকার আম অথবা খাস দলীল-প্রমাণ ছাড়া দ্বীন ইসলামের ভিতরে প্রবেশ করানো হয়েছে।"[২০৩]

[২০১] মাজমূউল ফাতওয়া ৪/১০৭।

[২০২] জামেউল উলূম ওয়াল হুকুম ২৮/২৪।

ইমাম শাতিবী

বিদআতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সবচেয়ে উত্তম ব্যাখ্যা দিয়েছেন ইমাম শাতেবী (র:)। তিনি বিদআতের দুইটি সংজ্ঞা দিয়েছেন। প্রথমটি হলো:

ان البدعة: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى

অর্থ: "বিদআত হলো দ্বীনে ইসলামের ভিতরে এমন কোন নতুন তরীকা উদ্ভাবন করা যা শরীয়তের নির্ধারিত ইবাদতে সঙ্গে মিল রাখে। আল-াহ (সুব:) ইবাদতের মধ্যে অতিরঞ্জর ও বাড়াবাড়ি করাই এই আমলগুলোর মূল উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি হলো

ان البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية

অর্থ: "বিদআত হলো দ্বীনের মধ্যে এমন কোন নতুন তরীকা উদ্ভাবন করা যা শরীয়ত কতৃক নির্ধারিত ইবাদত সাদৃশ্য হয়। শরীয়ত কতৃক নির্ধারিত তরীকায় চলার দ্বারা যে উদ্দেশ্য হয় সেই একই উদ্দেশ্যে এই নতুন উদ্ভাবিত আমল সমূহ করা হয়।" এখানে **في الدين** 'ফিদদ্বীন' অর্থাৎ দ্বীনে মধ্যে শব্দ দ্বারা জাগতিক বিষয়বস্তু ও কাজকর্ম বিদআতের সংজ্ঞা থেকে বাদ পড়ে গেছে। সুতরাং মোবাইল, মাইক, ফ্যান, উড়োজাহাজ, ঘড়ি, দালান-কোঠা, বিভিন্ন যান-বাহন, মেশিনারী, কল-কারখানা ইত্যাদি এগুলোকে বিদআত বলা যাবে না। কারণ এগুলো দ্বীন-ইসলামের অংশ হিসেবে ইসলামের ভিতরে প্রবেশ করানো হয় নাই। সুতরাং বিদআতকে হাসানা ও সাইয়িআ দুই ভাগে ভাগ করে তার পরে বিদআতে হাসানা প্রমান করার জন্য উপরোক্ত জিনিষগুলোকে উপস্থাপন করা নিজেদের অজ্ঞতা ও মূর্খতাকেই প্রমান করে।

এরপর **مخترعة** 'মুখতারাআতুন' অর্থাৎ 'শরীয়তে যার কোন ভিত্তি নাই' একথার মাধ্যমে যেসকল আমলের শরীয়তে ভিত্তি আছে সেগুলোকে বিদআত থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। যেমন: বিভিন্ন ইসলামী বিষয়ে কিতাব লেখা, ইলমে নাহু, ইলমে ছরফ, ইলমে বালাগাত, ইলমে ফাসাহাত, মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি। এগুলোকে বিদআত বলে 'বিদআতে হাসানা'র সপক্ষে দলীল পেশ করা যাবে না। কেননা এসব কিছুর মূল ভিত্তি ইসলামে রয়েছে। মক্কার 'দারে আরকামে'

[২০৩] ফাতহুল বারী ১৩/২৫৪।

সর্বপ্রথম মাদরাসা চালু হয়। সেখানে রাসূলুল-াহ (সা:) গোপনে সাহাবীদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতেন। ওমর বিন খাত্তাব (রা:) সেখানে গিয়েই ইসলাম গ্রহণ করেন। মদিনার 'আসহাবে সুফফাহ' মসজিদে নববীর' বারান্দায় থাকতেন। তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও সেখান থেকেই হতো। তাছাড়া আরবী ভাষার নিয়ম-কানুন চর্চা রাসূল (সা:) এর যুগ থেকেই ছিল। বদরের যুদ্ধে বন্দি কাফেরদের মধ্যে যারা মুক্তিপন আদায় করতে অক্ষম ছিল তারা একেক জন দশজন সাহাবীকে আরবী ভাষা শিখিয়ে মুক্তি লাভ করেছিল। সুতরাং বিদআতকে বৈধ করার জন্য বিদআতে হাসানার সপক্ষে এ সকল বিষয়গুলোকে দলীল হিসাবে পেশ করা চরম গোমরাহী, ভ্রান্ত আক্বিদাহ ও বক্র মনের বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই না।

تضاهي الشرعية 'তুদাহিশ শরইয়্যাহ' অর্থাৎ শরীয়তের সঙ্গে সাদৃশ্যতা পূর্ণ। একথার মাধ্যমে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, বিদআতি কাজগুলো যদিও বাহ্যিকভাবে ইবাদতের মত মনে হয় বাস্তবে সেগুলো ইবাদত নয়। যেমনঃ মৃত ব্যক্তির নামে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কুরআন খতম পড়ানো, দু'আ-অজিফা পড়ানো, কেউ মারা গেলে তিন দিন পরে মিলাদ দেওয়া, চলি-শা করা, মৃত্যু বার্ষিকী, জন্ম বার্ষিকী, বিয়ে বার্ষিকী (ম্যারেজ ডে), খতমে খাজেগান, দূরুদে নারিয়া, দূরুদে হাজারি, দূরুদে তাজ ইত্যাদি তৈরী করা। কবরে চাঁদর দেওয়া, আগরবাতি-মোমবাতি দেওয়া, কবরের নামে টাকা-পয়সা, গরু-ছাগল, মুরগী ইত্যাদি মান্নত করা। কবরের চতুর্দিকে তাওয়াফ করা। পীর-মুরিদী প্রথা চালু করা। ইসলামে বিভিন্ন তরীকা তৈরী করা, চিশতিয়া, কাদেরিয়া, নকশাবন্দিয়া, মুজাদ্দেদিয়া ইত্যাদি। পীরদের খিলাফত দেওয়া, বিভিন্ন তরীকার নামে বাইআত গ্রহণ করা। পীরের জন্মদিনে নওরোজ অনুষ্ঠান করা, পীরকে গোসল করানো পানি পান করা, পীরের ফায়েজ-বরকত পেটের ভিতরে ঢুকানোর জন্য পীরের পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী চুষতে থাকা ইত্যাদি। এগুলো হচ্ছে প্রথম প্রকারের বিদআত যা সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরী করা হয়েছে। নতুবা রাসূলুল-াহ (সা:) এর জীবদ্দশায় তার ছোট মেয়ে ফাতেমা (রা:) ছাড়া সকল সন্তানগণ মারা যান। কিন্তু তাদের কারো জন্য এ জাতীয় তিন দিনা, চলি-শা, মৃত্যু বার্ষিকী ইত্যাদি পালন করেন নাই। এমন কি স্বয়ং রাসূল (সা:) এর মৃত্যুর পরও তার প্রিয় সাহাবীগণ এসব কিছুই করেন নাই। অথচ বর্তমানে মানুষেরা এগুলোকে সওয়াবের কাজ মনে করে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে অত্যান্ত শ্রদ্ধার সাথে এগুলো করে থাকে। কেউ না করলে তাকে সমাজে তিরষ্কার করা হয়। আর দ্বিতীয় প্রকারের বিদআত হলো: যে সকল ইবাদত মৌলিকভাবে কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমানিত। কিন্তু এজন্য

বিশেষ কোন শর্ত বা পদ্ধতি শরীয়ত নির্ধারণ করেন নাই। সেখানে কোন বিষেশ নিয়ম পদ্ধতি জুড়ে দেওয়া। যেমন: জিকির আযকার, তাসবীহ-তাহলীল কুরআন -সুন্নাহ দ্বারা প্রমানিত। এজন্য শরীয়তে কোন নিয়ম-পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয় নাই। কিন্তু পীর সাহেবরা এজন্য বিভিন্ন তরীকা নিয়ম-পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। কেউ সুরে সুর মিলিয়ে, তালে তাল মিলিয়ে , ঘাড়ে ঘাড় মিলিয়ে এক আওয়াজে জোড়ে জোড়ে চিৎকার মেরে জিকির করে। আবার কেউ নেচে-গেঁয়ে, হেলে-দুলে, আবার কেউ বাজনার তালে তালে এমনিভাবে কেউ শুধু 'ইল-াল-ার' জিকির, কেউ আবার মুখে কোন শব্দ উচ্চারণ না করে নাক দিয়ে ফোঁস ফোঁস করে 'ফাঁস আনফাঁস' এর জিকির করে। কেউ আবার নফল সিয়ামের ক্ষেত্রে শর্ত আরোপ করে যে, সিয়াম অবস্থায় দাড়িয়ে থাকবে কখনো বসবে না। রোদ্রে থাকবে কখনো ছায়া গ্রহণ করবে না। খাওয়া -দাওয়ার ক্ষেত্রে কখানো ভাল খাবার খাবে না। দূরূদের মধ্যে পীর বাবার নাম সংযুক্ত করা ইত্যাদি।

উভয় প্রকার বিদআতই বর্জনীয়। কেননা হাদীসে এসেছে:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

অর্থ: "আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল-াহ (সা:) ইরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনি কাজের মধ্যে এমন কিছু নতুনভাবে তৈরী করলো যা ইসলামে নাই তা প্রত্যাখ্যাত।"[২০৪]

তিনি আরও ইরশাদ করেন:

وإياكم والامور المحدثات . فإن كل بدعة ضلالة

অর্থ: "তোমরা নতুন নতুন আবিষ্কৃত ইবাদত থেকে বেঁচে থাক। কেননা সকল বিদআতই গোমরাহী।[২০৫]

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

قال عبد الله اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم

অর্থ: "আবদুল-াহ ইবনে মাসউদ (রা:) বলেন তোমরা কুরাআন-সুন্নাহের অনুসরণ কর এবং বিদআত তৈরী করো না। যা কিছু তৈরী করার প্রয়োজন ছিল

---

[২০৪] সহীহ বুখারী ২৬৯৭; সহীহ মুসলিম ৪৫৮৯।

[২০৫] সুনানে ইবনে মাজাহ ৪২।

তা আল-াহ (সুব:) তার রাসূলের মাধ্যমে তোমাদের পক্ষে যথার্থ করে দিয়েছেন।"[২০৬]

তাই সকল প্রকার বিদআতকে বর্জণ করে সঠিকভাবে কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ করাই মুমিনদের কাজ। এটাই রাসূলুল-াহ (সা:) এর অসিয়ত।

আয়াতের দ্বিতীয় অংশের শিক্ষা

وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي 'আমি তোমাদের উপর আমার নেয়ামতকে সমাপ্ত করে দিলাম' এখানে নেয়ামত বলতে ওহীর নেয়ামতকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং কেয়ামত পর্যন্ত আর কারো উপরে ওহী নাযিল হবে না। রাসূল (সা:) এর প্রতি যে ওহী নাযিল হয়েছে কেবলমাত্র তারই অনুসরণ করতে হবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

[وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ} [يونس: ১০৯}

অর্থ: " আর তোমার নিকট যে ওহী পাঠানো হচ্ছে, তুমি তার অনুসরণ কর এবং সবর কর, যতক্ষণ না আল-াহ ফয়সালা করেন। আর তিনিই উত্তম ফয়সালাকারী।"[২০৭]

নিজের পক্ষ থেকে তৈরী করে দ্বীন সম্পর্কে কোন কথা বলা যাবে না। রাসূলল-াহ (সা:) ইরশাদ করেছেন:

عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ

অর্থ: "আলী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল-াহ (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে নির্ধারণ করে নেয়।" অর্থাৎ রাসূলুল-াহ (সা:) যে কথা বলেন নাই , এবং সহীহ হাদীসে কোথাও উলে-খ নেই এমন কথা রাসূল (সা:) এর হাদীস বলে বর্ণনা করা মারাত্মক অন্যায়। রাসূল (সা:) নিজেও দ্বীন সম্পর্কে কোন কথা নিজের পক্ষ থেকে তৈরী করে বলতেন না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

[وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (৩) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى } [النجم: ৩، 8}

অর্থ: "তিনি নিজের মনের থেকে কোন কথা বলেন না। কেবলমাত্র তার প্রতি যা ওহী করা হয় তাই বলেন।"[২০৮]

---

[২০৬] সুনানে দারমী ২০৫।

[২০৭] সুরা ইউনুস ১০/১০৯।

অন্য আয়াতে আরও কঠিনভাবে বলা হয়েছে:

}وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (88) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (8৫) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ { [الحاقة: 88 – 8৬]

অর্থ: "যদি সে (মুহাম্মদ সা:) আমার নামে কোন মিথ্যা রচনা করত, তবে আমি তার ডান হাত পাকড়াও করতাম। তারপর অবশ্যই আমি তার হৃদপিে র শিরা কেটে ফেলতাম।"[২০৯]

আয়াতের তৃতীয় অংশের শিক্ষা

وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا "এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে ইসলামকেই মনোনীত করলাম"

ইসলাম ছাড়া অন্য সকল ধর্ম বা মতবাদ বাতিল

বর্তমানে কিছু আধুনিক শিক্ষিত এবং তথাকথিত পীরদেরকে বলতে শুনা যায় যে, "পরকালে মুক্তির জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা জর ুরী নয়" যেমন 'আল-াহ কোন পথে?' নামক বইয়ের ৩য় সংস্করণ, ডিসেম্বর, ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে, পৃঃ ১১৩-১১৪ ও ১২৫-১২৬ এবং 'মাইজভা ারীর জীবনী ও কেরামত' নামক বইয়ের পঞ্চদশ প্রকাশ ঃ জুলাই -২০০২, পৃষ্ঠা ঃ ১৫১-১৫২ তে বলা হয়েছে পরকালে মুক্তির জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার আবশ্যকতা আছে বলে মনে করি না। বরং হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান যে কোন ধর্মের লোক নিজ নিজ ধর্মে থেকে সাধনা করে মুক্তি পেতে পারে। তাদের এই কথিত 'তাওহীদে আদইয়ান বা সকল ধর্মের ঐক্য' এর স্বপক্ষে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করে থাকে ঃ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ.

অর্থ: "যারা মু'মিন, যারা ইয়াহুদী, এবং খৃষ্টান ও সাবিঈন- (এদের মধ্যে) যারাই আল-াহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।" (সূরা বাকারা, ২ ঃ ৬২)

অথচ এ আয়াতে যে কোন ধর্মের লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা ঈমান আনলে এবং নেক আমল করলে পরকালে মুক্তি পাবে। আর একথা স্পষ্ট যে,

---

[২০৮] সুরা নজম ৩-৪।

[২০৯] সুরা আল হাক্কা ৪৪-৪৬।

ইসলাম ধর্ম আগমনের পর রাসূল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম কে আখেরী নবী না মানলে তার ঈমান পূর্ণ হবে না। আর রাসূল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম কে আখেরী নবী মানতে হলে অন্যান্য সব ধর্মের বিধানকে মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে বলে মানতে হবে। তাহলে অন্য কোন ধর্মে থাকা অবস্থায় মুক্তির লাভের অবকাশ রইল কোথায়? বরং কুরআনে আল-াহ তা'আলা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে বা মতে মুক্তি লাভের আশা করা যাবে না। ইরশাদ হচ্ছে:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থ: "যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কষ্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ড়। (আল ইমরান : ৮৫)
পবিত্র কুরআনের আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে:

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ.

অর্থ: "তারা কি আল-াহ্র দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন তালাশ করছে? আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে স্বেচছায় হোক বা অনিচছায় হোক, তাঁরই অনুগত হবে এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাবে। (আল ইমরান : ৮৩)

অমুসলিমদের নেক আমল

অনেক সময় অমুসলিমরাও অনেক ভাল কাজ করে। দান-খয়রাত, পরোপোকার, রাস্তা-ঘাট করে দেয়া, হাসপাতাল করে দেয়া ইত্যাদি। এগুলো দেখে অনেক সময় দ্বীনি শিক্ষা থেকে বিমুখ, ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মহীন লোকদেরকে বলতে শুনা যায় যে, ওরাও তো অনেক ভাল কাজ করে। তাই ওরাও পরকালে পার পেয়ে যাবে। অথচ তাদের এই বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী। ইসলাম গ্রহণ না করে যত ভাল কাজই কর"ক না কেন, পরকালে তারা মুক্তি পাবে না। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآَنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ.

অর্থঃ "যারা কাফের, তাদের আমল সমূহ মর"ভূমির মরীচিকা সমতুল্য, যাকে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে। কিন্তু সে যখন তার কাছে যায়, তখন কিছুই পায় না এবং পায় সেখানে আল-াহকে, অত:পর আল-াহ তার হিসাব চুকিয়ে দেন। আল-াহ দ্র"ত হিসাব গ্রহণকারী। অথবা (তাদের আমলসমূহ) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উপরে ঘন কালো মেঘ আছে। একের উপর এক অন্ধকার। যখন সে তার হাত বের করে, তখন তাকে একেবারেই দেখতে পায় না। আল-াহ যাকে জ্যোতি দেন না, তার কোন জ্যোতি নেই।" (সূরা আন-নূর, ২৪ ঃ ৩৯-৪০)
এ আয়াতে স্পষ্টভাবে অমুসলিমদের নেক আমলগুলোকে মরীচিকার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সুতরাং এর পরেও যারা নিজেদেরকে মডারেট মুসলিম, প্রগতিশীল মুসলিম প্রমান করার জন্য এবং ইয়াহুদী-খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, নাস্তিক, মুরতাদ সহ সকল বাতিল পন্থিদের কাছে জনপ্রিয় হওয়ার জন্য উপরোক্ত আক্বিদাহ পোষণ করছেন তারা সরাসরি কুরআনের আয়াতের বির"দ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া যত নেক আমলই কর"ক না কেন পরকারে মুক্তি পাওয়া যাবে না তার জ্বলন্ড় প্রমাণ আবু তালেব। আল-াহর রাসূল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম- এর আপন চাচা। হযরত আলী (রাঃ) এর আব্বাজান। যিনি সারা জীবন রাসূল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম কে ভাতিজা হিসাবে দেখা-শুনা করেছেন, সাহায্য-সহযোগীতা করেছেন। যিনি দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেনঃ

والله لن يصلوا إليك بجمعهم	حتى أوسد فى التراب دفينا
فاصدع بأمرك ماعليك غضاضة	وابشر وقرّ بذالك منك عيوناً
ودعوتنى، وعرفت أنك ناصحى	ولقد صدقت، وكنت ثم أمينا
وعرضت دينا قد عرفت بأنه	من خير أديان البرية ديناً
لولا الملامة أو حذار مسبة	لو جدتى سمحاً بذاك مبيناً

অর্থ: "আল-াহর কসম! তারা সকলে মিলেও তোমার কাছে পৌঁছতে পারবে না (তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।) যতক্ষণ পর্যন্ড় না আমাকে (মৃত্যুর পর) মাটিতে দাফন করা হয়।
সুতরাং তুমি নির্ভয়ে তোমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে থাকো এবং তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং এর দ্বারা প্রশান্ড়ি লাভ করো।

তুমি আমাকে আহ্বান করেছো এবং আমি জানি যে তুমি আমার কল্যাণকামী, হিতাকাঙ্খী। তুমি সত্যই বলেছো, তুমি আগেও বিশ্বস্ড় ছিলে এখনও বিশ্বস্ড়। তুমি আমার সামনে একটি নতুন দীন (জীবন ব্যবস্থা পেশ করেছো) আমি জানি এটি হলো পৃথিবীর বুকে সকল জীবন ব্যবস্থার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন ব্যবস্থা। যদি তিরস্কার এবং গালির ভয় না থাকতো তাহলে তুমি অবশ্যই আমাকে এর প্রতি প্রকাশ্য সুহৃদয়বান পেতে।"

এমনকি তিন বৎসর পর্যন্ড় অবরব্দ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ না করে মৃত্যুবরণ করেন। আল-াহর রাসূল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম মৃত্যুর পরেও তার জন্য দোয়া করতে থাকলেন, ফলে আল-াহ তা'আলা আয়াত নাযিল করে দিলেন:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ.

অর্থঃ "কোন নবীর জন্য ও কোন মুমিনের জন্য উচিত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য মাগফেরাত কামনা করবে, যদিও তারা অত্যন্ত নিকটাত্মীয় হোক না কেন। যখন একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, তারা জাহান্নামী। (তাওবা, ৯ ঃ ১১৩) এআয়াতে বুঝা গেল আবু তালেব রাসূলুল-াহ (সা:) এর যতই নিকটাত্মীয় হোক না কেন এবং যতই উপকার সহযোগীতা করে থাকুক না কেন। সে পরকালে মুক্তি পাবে না। বরং সে এ আয়াত প্রমানীত সুস্পষ্ট জাহান্নামী। শুধু তাই না, তার জন্য ইসতিগফার করতেও নিষেধ করে দেওয়া হলো। তারপরে আরও জানিয়ে দেওয়া হলো যে, আপনি ইচ্ছে করলেও তাকে হেদায়াত দিতে পারবেন না। বরং আল-াহ (সুব:) যাকে হেদায়াত দান করবেন কেবলমাত্র সেই হেদায়াত পেতে পারে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

অর্থঃ "আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে হেদায়াত দিতে পারবেন না, তবে আল-াহ্ তা'আলাই যাকে ইচছা হেদায়াত দান করেন। কে হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে সে সম্পর্কে তিনিই ভাল জানেন। (কাসাস, ২৮ ঃ ৫৬)

ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া যে পরকালে মুক্তি পাওয়া যাবে না। এ বিষয়টি হাদীস শরীফে আরো স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

عن جابر رضى الله عنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم حين اتاه عمر فقال : انا نسمع احاديث من يهود تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال : ((أمتهوكون أنتم كما تهوّكت

اليهود والنصارى؟! لقد جئتكم بها بيضاء نقيّة، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعى))
رواه أحمد، والبيهقى فى كتاب (شعب الإيمان)

অর্থঃ "হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত উমর (রাঃ) একবার মহানবী (সা:) এর কাছে এসে বললেনঃ (ইয়া রাসূলাল-াহ) আমরা ইহুদীদের নিকট থেকে এমন কিছু কথা-বার্তা শুনতে পাই, যা আমাদের নিকট ভাল লাগে, আমরা তাদের (তাওরাতের) কিছু কথা লিখে রাখবো কি? রাসূলুল-াহ (সা:) বললেনঃ তোমরা কি বিভ্রান্ড়ির মধ্যে আছো?! যেমনিভাবে বিভ্রান্ড়িতে আছে ইয়াহুদী এবং খৃষ্টানরা। নিশ্চয় আমি তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছি স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার (একটি দ্বীন)। জেনে রাখ!! যদি মুসা (আঃ) (যার উপর তাওরাত নাজিল হয়েছিল) তিনিও আজ জীবিত থাকতেন (এবং আমার নবুওয়াত কাল পেতেন) তাহলে আমার অনুসরণ করা ব্যতিত তারও কোন মুক্তির উপায় ছিল না।"

অন্য আরেকটি হাদীসে বিষয়টি আরো সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে:

عن جابر، ان عمر بن الخطاب رضى الله عنهما، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخة من التوراة، فقال : يا رسول الله! هذه نسخة من التوراة، فسكت فجعل يقرأ و وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير . فقال أبو بكر : ثكلتك الثواكل! ما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! فنظر عمر إلى وجه رسول صلى الله عليه وسلم فقال : أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، رضينا بالله ربّا، وبالاسلام دينا، وبمحمد نبيا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((والذى نفسى محمد بيده، لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتمونى لضللتم عن سواء السبيل، ولو كان حيّا وأدرك نبوتى لاتبعنى)). رواه الدارمى.

হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ "উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর নিকট তাওরাতের একটি খন্ড নিয়ে আসলেন। অতঃপর বললেনঃ ইয়া রাসূলুল-াহ! এটা তাওরাতের একটি খন্ড। রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম চুপ থাকলেন কোন উত্তর দিলেন না। ওমর (রাঃ) তা পড়তে আরম্ভ করলেন, রাসূলূল-াহ এর চেহারা মোবারক তখন রাগে, ক্ষোভে লাল হয়ে গেল। আবু বকর (রাঃ) বিষয়টি উপলব্ধি করে বলতে লাগলেন, হে ওমর! তুমি যদি মরে যেতে? তুমি কি

রাসুলুল-াহ সাল-াল-াম এর চেহারার অবস্থা দেখতে পাচ্ছনা? অতপরঃ উমার (রাঃ) রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর চেহারার দিকে তাকালেন এবং বললেনঃ আমি আল-াহর কাছে আল-াহ ও তাঁর রাসূলের অসন্তুষ্টি থেকে পানাহ চাচ্ছি। তিনি আরো বললেনঃ আমরা আল-াহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে ও মুহাম্মাদ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম কে নবী হিসেবে গ্রহণ করলাম। অতপরঃ রাসূল সাল-াল-াহু বললেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদ (সা:) এর জীবন! যদি তোমরা মুসা (আঃ) কে পেতে এবং আমাকে ত্যাগ করে তাকে অনুসরণ করতে, তাহলে তোমরা সঠিক পথ বা দ্বীন থেকে দুরে চলে যেতে (পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে)। যেনে রাখ! যদি মুসা (আঃ) আজ জীবিত থাকতেন এবং আমার নবুওয়াত কাল পেতেন তাহলে তিনি অবশ্যই আমার অনুসরণ করতেন (দারেমী, মেশকাত বা: এ'তেছাম)

মুযদালাফার ময়দানে রাত্রি যাপন ও তার শিক্ষা

প্রথম শিক্ষা: আল-াহর নির্দেশে আরাম-আয়েশ, বাড়ি-গাড়ি, স্ত্রী-সন্তান ত্যাগ করে পাহাড়ে-জঙ্গলে, মাঠে-ময়দানে অবস্থান করার মানসিকতা তৈরী করা।

দ্বিতীয় শিক্ষা: নিজের আমিত্বকে বিসর্জণ দেওয়া। কারণ একই ময়দানে আমীর-গরীব, ধনী-ফকীর, রাজা-প্রজা রাত্রিযাপন করছে অথচ কারো কোন আলাদা বৈশিষ্ট নেই, সকলে একই পোষাকে, একই পদ্ধতিতে, একই রবের নির্দেশ পালনার্থে, একই রাসূলের সুন্নাহর অনুসরণ করতে খোলা আকাশের নিচে অবস্থান করছে। যেখানে কারো জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা নেই সেখানে নাম-ধামের কোন বিষয়ও থাকে না। একারণেই বলা হয়েছে:

[ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } [البقرة: ১৯৯ }

অর্থ: " অতঃপর তোমরা প্রত্যাবর্তন কর, যেখান থেকে মানুষেরা প্রত্যাবর্তন করে এবং আল-াহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল-াহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[২১০]

তৃতীয় শিক্ষা: নিরাপত্তা। একই মাঠে লক্ষ-লক্ষ নারী-পুর ষ রাত্রি যাপন করছে, প্রত্যেকের সাথে টাকা-পয়সা রয়েছে অথচ আজ পর্যন্ত কোনদিন শুনা যায়নি যে, মুযদালাফার ময়দান থেকে কোন নারী ছিনতাই হয়েছে অথবা ধর্ষিতা হয়েছে। অথবা কারো অর্থ সম্পদ ছিনতাই হয়েছে। এর কারণ একটাই। আর তাহলো প্রত্যেকে আল-াহকে ভয় করে। প্রতিটি মানুষের বিশ্বাস যে, আল-াহ (সুব:) সবকিছু দেখেন। এভাবে যদি মানুষের কলিজার ভিতরে আল-াহর ভয় ঢুকানো

[২১০] সুরা বাকারা ১৯৯।

যেত তাহলে গোট পৃথিবীটাই মুযদালাফার মাঠের মত নিরাপত্তায় পরিপূর্ণ হয়ে যেত। রাসূলুল-াহ (সা:) সত্যিই বলেছেন। হাদীস:

عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ قَالَ شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ قُلْنَا لَهُ أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ أَوْ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ

অর্থ: "খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল-াহ (সা:) এর নিকট (আমাদের দুঃখ কষ্টের) কিছু অভিযোগ পেশ করলাম । তখন তিনি কাবার ছায়ায় নিজের চাঁদর মাথার নিচে দিয়ে আরাম করছিলাম। আমরা বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য আল-াহর কাছে সাহায্য কামনা করবেন না? আপনি কি আমাদের জন্য দু'আ করবেন না? (আমরাতো কাফেরদের যুলুম-অত্যাচারে শেষ হয়ে যাচ্ছি) তখন রাসূলুল-াহ (সা:) বললেন, তোমাদের পূর্বে যারা অতিবাহিত হয়ে গেছে তাদের একেক জনকে গর্ত খুড়ে তার মধ্যে দাঁড় করিয়ে দেয়া হতো। অতঃপর করাত দিয়ে তাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত চিড়ে দ্বিখ িত করে ফেলা হতো। তা সত্বেও তারা তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে বিন্দুমাত্র হটাতে পারতো না। এমনিভাবে লোহাড় চির নি দিয়ে আঁচড়িয়ে আঁচড়িয়ে হাড্ডি এবং রগের থেকে আলাদা করে ফেলা হতো। তা সত্বেও তারা তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে বিন্দুমাত্র হটাতে পারতো না। জেনে রাখ! আল-াহর কসম!! নিশ্চয়ই আল-াহ (সুব:) এই দ্বীনকে পরিপূর্ণ করবেন। এমনকি একজন পথিক আরোহী 'সানা' থেকে 'হাজরে মাওত' পর্যন্ত এককী ভ্রমন করবে তা সত্বেও আল-াহ ছাড়া কাউকে ভয় করবে না। অথবা বকরীর পালের উপর নেকড়ে বাঘের ভয় ছাড়া অন্য কোন ভয় থাকবে না। কিন্তু তোমরা বড় তাড়া-হুড়া করছো।[২১১]

রাসূলুল-াহ (সা:) যখন উপরোক্ত কথাগুলো বলছিলেন তখন রাসূল (সা:) নিজে ও তাঁর মুষ্টিমেয় সাহাবীগণ চরম নিরাপত্তাহীনতার এবং জুলুম-অত্যাচার, নির্যাতন-নিপিড়নের শিকার ছিলেন। কিন্তু তখন যে নিরাপত্তার কথা ভবিষ্যৎ বানী

[২১১] সহীহ বুখারী ৩৬১২;

করেছিলেন তা আজ অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবে প্রমানিত হয়েছে। এতে একদিকে যেমন রাসূলুল-াহ (সা:) এর নবুওয়াতের সত্যতা প্রমানিত হচ্ছে অপরদিকে তেমনিভাবে আরাফাত, মুযদালাফা ও মিনার ময়দানগুলো সেই নিরাপত্তার সাক্ষ্য বহণ করছে।

মিনায় জামরাতে পাথর মারা ও তার শিক্ষা

জামারাতে পাথর মারা প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যখন ইবরাহীম (আ:) মিনাতে উপনীত হলেন তখন 'জামরাতুল আকাবার' স্থানে শয়তান তার সামনে উপস্থিত হল। তিনি শয়তানকে সাতটি পাথর মারলেন। অতঃপর দ্বিতীয় জামারার সামনে দ্বিতীয়বার উপস্থিত হলে সেখানেও সাতটি পাথর মারলেন। এভাবে তৃতীয় জামারাতে যখন শয়তান উপস্থিত হলো আবার সাতটি পাথর মারলেন। একারণে আবদুল-াহ ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন:

قال بن عباس الشيطان ترجمون وملة أبيكم تنعون

অর্থ: "তোমরা শয়তানকে পাথর মার আর তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আ:) এর মিল-াতের অনুসরণ কর।"[২১২]

প্রশ্ন: অনেকে বলে থাকে যে, ইবরাহীম (আ:) এর সামনে শয়তান আত্মপ্রকাশ করেছিল তাই তিনি পাথর মেরেছিলেন। আমাদের সামনে তো আর শয়তান আত্মপ্রকাশ করে না তাই আমরা কেন পাথর মারব?

উত্তর: প্রথম কারণ:

এটাও শয়তানের ধোঁকা। সুতরাং এই শয়তানকেও পাথর মার। কারণ এখানে এখন শয়তান আছে কি নাই সেটি মুখ্য বিষয় নয়। বরং কুরআন এবং সুন্নাহর আনুগত্য করাই হচ্ছে মূল বিষয়। যেহেতু রাসূলুল-াহ (সা:) নিজেও পাথর মেরেছেন যেমন হাদীসে বলা হয়েছে:

عن جَابِرً يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– يَرْمِى عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ « لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّى لاَ أَدْرِى لَعَلِّى لاَ أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِى هَذِهِ ».

অর্থ: "জাবের (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূলুল-াহ (সা:) কে 'ইয়াওমে নহর' (জিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে) তার বাহনে বসা অবস্থায়

[২১২] মুসতাদরাকে হাকেম ১৭১৩।

জামারাতে পাথর মারতে দেখেছি। এবং বলছিলেন 'তোমরা আমার থেকে হজ্জের কাজগুলো শিখে নাও। হয়ত আমি এরপরে আর হজ্জ করতে পারবো না।"[২১৩]

আরেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عن حرملة بن عمرو قال .... يقول : ارموا الجمار بمثل حصى الخذف

অর্থ: "রাসূলুল-াহ (সা:) বলেছেন, তোমরা জামারাতে পাথর নিক্ষেপ করো ছোলা বুট অথবা খেজুরের বিচির ন্যায়।"[২১৪]

অতএব এখানে যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে পাথর মারা হচ্ছে জামারাতে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই পাথর মারা হচ্ছে শয়তানকে। কেননা আল-াহর হুকুম পালন করলেই শয়তান লাঞ্চিত হয়।

দ্বিতীয় কারণ:

এখানে আরও একটি বড় কারণ হচ্ছে, শয়তানকে পাথর মারার মাধ্যমে আল-াহর দুশমনদেরকে ঘৃণা করা এবং তাদের সাথে 'বারাআহ' বা সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেয়া হয়। মূলত: 'আল অলা ওয়াল বারাআহ' ইসলামের একটি গুর"ত্বপূর্ণ অধ্যায়। 'আল অলা ওয়াল বারাআহ' ব্যতিত কোন ব্যক্তির ইসলাম পূর্ন হতে পারে না। এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বহু দলীল-প্রমাণ রয়েছে।

প্রশ্ন: 'আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ' বলতে কি বুঝায়? ইসলামে এর গুর"ত্ব কতটুকু?

উত্তর: 'আল ওয়ালা' অর্থ হলো 'কারো সাথে বন্ধুত্ব করা' আর 'আল বারাআহ' অর্থ হচ্ছে 'কারো সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা'। মূলত: ইসলামের মূল ভিত্তি 'তাওহীদ' এর দুই র"কনের প্রথম র"কটিই হচ্ছে 'আল-াহ ছাড়া সকল গাইর"ল-াহ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা।' 'লা ইলাহা' বলে প্রথমে সকল ইলাহকে বর্জণ করা হয়। তারপরে 'ইল-াল-াহ' শুধুমাত্র আল-াহকে গ্রহণ করা হয়। প্রথমে বর্জণ তারপরে গ্রহণ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

অর্থ: "আমি সকল জাতির কাছে রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে আদেশ প্রদান করার জন্য যে, তোমরা এক আল-াহর ইবাদত করবে এবং 'তাগুত' থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকবে।" (সুরা নাহল ১৬ঃ ৩৬)

[২১৩] সহীহ মুসলিম ৩১৯৭।

[২১৪] তাবরানী কাবীর ৩৪৭৩।

তাগুতের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা পরকালে মুক্তি পাওয়ার জন্য শর্ত। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

}فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا{ [البقرة:]২৫৬

অর্থ: "যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করলো এবং আল-াহর প্রতি ঈমান আনলো, সে তো মজবুত ও শক্ত হাতল ধারণ করলো যা কখনো ছিড়ে যাবার নয়।" (সূরা বাক্বারাহ, আয়াত: ২৫৬)

মূলত: কাফির-মুশরিক, ইয়াহুদী-নাসারা, হিন্দু-বৌদ্ধ ও আল-াহর আইন পরিবর্তনকারী জালিম শাসকদের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে মুসলিম দাবী করা আল-াহর সাথে প্রতারণা করার শামিল। এটা মুনাফিকদের চরিত্র। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ

'আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি। আমরা তো (মুসলিমদের সাথে) উপহাস করি মাত্র। (বাকারা, ২ঃ ১৪)

কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী মুমিনরা মুমিনদের বন্ধু আর আল-াহর দুশমনরা পরস্পরে একে অপরের বন্ধু।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

'আরা যারা কাফের তারা পারস্পরিক সহযোগী, বন্ধু। তোমরা যদি এমন ব্যবস্থা না কর, তবে পৃথিবীতে ফেতনা বিস্তার লাভ করবে এবং দেশময় বড়ই ফাসাদ ছড়িয়ে পরবে। (আনফাল, ৮ঃ ৭৩)

উলামায়ে কেরাম বলেছেনঃ فتنة فى الارض অর্থ হচ্ছে শিরক, আর فساد كبير অর্থ হচ্ছে মুসলিম এবং কাফের এক সাথে মিশে যাওয়া, আল-াহর অনুগত বান্দাদের সাথে অবাধ্যরা মিশে যাওয়া। আর যখন এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে তখন ইসলামী নেজাম বিধ্বস্ত হয়ে যাবে, তাওহীদের হাকিকত নড়বড়ে হয়ে যাবে, জিহাদের ঝান্ডা অবনত হয়ে যাবে। এ অবস্থা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ **الحب فى الله والبغض فى الله** আল হুব্বু ফিল-াহি ওয়াল বুগদু ফিল-াহি অর্থাৎ আল-াহর জন্য ভালবাসা এবং আল-াহর জন্য ঘৃণা করা। এ ব্যাপারে হাদীসে এসেছে:

عن براء بن عازب، رضى الله عنه، مرفوعاً (أوثق عرى الإيمان: الحب فى الله، والبغض فيه)

অর্থ: "বারা ইবনে আজিব (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন 'ঈমানের শক্ত হাতল হচ্ছেঃ الحب فى الله والبغض فى الله আল-াহর জন্য ভালবাসা এবং আল-াহর জন্য ঘৃণা করা। এ প্রসঙ্গে অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

وعن أبى ذر رضى الله عنه، أفضل الإيمان: الحب فى الله والبغض فى الله؛

অর্থ: "আবু যর (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন 'সর্বোত্তম ঈমান হলো, আল-াহর জন্য ভালবাসা এবং আল-াহর জন্য ঘৃণা করা'।" আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল-াহ (সা:) আল-াহর দুশমনদের বন্ধুত্ব, অনুগ্রহ, সাহায্য-সহানুভূতি থেকে বাঁচার জন্য আল-াহ (সুব:) এর কাছে দু'আ করতেন। হাদীস:

وفى حديث مرفوع (اللهم لا تجعل لفاجر عندى يداً، ولا نعمة فيوده قلبى، فإنى وجدت فيما أوحيته إلى . لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

অর্থ: রাসূলুল-াহ (সা:) দুআ করতেন, হে আল-াহ! তুমি আমার উপর কোন পাপিষ্ঠ, ফাসেক-ফাজেরের কোন প্রকার অনুগ্রহ ও সহযোগীতা ধার্য করো না। যাতে আমার অন্তর তাদেরকে তাদের অনুগ্রহ ও সহযোগীতার কারণে ভালবেসে না ফেলে। কেননা আপনি আমার প্রতি যা নাযিল করেছেন তার মধ্যে আমি পেয়েছি যে:

"যারা আল-াহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল-াহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল-াহ্ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল-াহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল-াহ্র প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল-াহ্র দল। জেনে রাখ, আল-াহ্র দলই সফলকাম হবে। (মুজাদালা, ৫৮ঃ ২২) বুখারী, মুসলিমসহ হাদীসের প্রায় কিতাবে রয়েছে যে,

عن ابن مسعود، رضى الله عنه مرفوعاً (المرء مع من أحب)

অর্থ: "ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা:) বলেছেন, "প্রত্যেক ব্যক্তি সেই ব্যক্তির সাথে (হাশরের ময়দানে অবস্থান করবে) যাকে সে ভালোবাসে।"

অন্য হাদীসে আরও ইরশাদ হয়েছে:

وقال صلى الله عليه وسلم: (المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل)

অর্থ: "রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম বলেছেন: "প্রত্যেক ব্যক্তি তার বন্ধুর দীন গ্রহণ করে থাকে। সুতরাং তোমরা (বন্ধু গ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্ক হও এবং) লক্ষ্য করো তোমরা কাকে বন্ধু বানাচ্ছো।" আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

وعن ابن مسعود البدرى، رضى الله عنه مرفوعاً: (لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقى)

অর্থ: "ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত মহানবী (সা:) বলেছেন, "তোমরা মু'মিন ব্যতীত কাউকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না এবং তোমাদের খাবার যেন মুত্তাকী ব্যতিত অন্য কেউ না খায়।" আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

وعن على رضى الله عنه (لا يحب رجل قوماً إلا حشر معهم)

অর্থ: "আলী (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি যাকে ভালোবাসে, কিয়ামতের দিন সে তার সাথেই হাশরে পুনর্থিত হবে।" অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

وقال صلى الله عليه وسلم (تقربوا إلى الله ببغض أهل المعاصى، والقوهم بوجوه مكفهرّة، والتمسوا رضا الله بسخطهم، وتقربوا إلى الله بالتباعد منهم)

অর্থ: "রাসূলুল-াহ (সা:) ইরশাদ করেন, "তোমরা পাপিষ্ঠদের সাথে শত্রুতা পোষণ করার দ্বারা, এবং তাদের সাথে কঠিন চেহারা প্রদর্শণ কর। তাদেরকে অপছন্দ করার দ্বারা আল-াহর নৈকট্য তালাশ করা। তাদের ব্যাপারে ঘৃণা পোষণের মাধ্যমে মহান আল-াহর সন্তুষ্টি অর্জন করো এবং তাদের থেকে দূরত্ব অবলম্বন করে আল-াহর নিকটবর্তী হও।" অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে:

وعن إبن عباس رضى الله عنهما قال: من أحب فى الله، وأبغض فى الله، ووالى فى الله، وعادى فى الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان، ولو كثرت صلاته

وصومه، حتى يكون كذلك، يعنى حتى تكون محبته وموالاته لله، وبغضه معاداته لله، قال رضى الله عنه: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس، على أمر الدنيا، وذلك لا يجدى على أهله شيئا.

অর্থ: "ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন, যেই ব্যক্তি আল-াহর জন্য ভালোবাসে, আল-াহর জন্য কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করে, আল-াহর সন্তুষ্টির জন্য বন্ধু ও অভিভাবক গ্রহণ করে, আল-াহর জন্য শত্রুতা পোষন করে, সে এর মাধ্যমে আল-াহর ওলী হতে পারে। আর কোন ব্যক্তি যত সালাত আর সাওম করুক না কেন সে ততক্ষণ পর্যন্ড় ঈমানের স্বাদ পাবে না, যতক্ষণ না সে এমনটি করবে। অর্থাৎ তার ভালোবাসা এবং শত্রুতা আল-াহর সন্তুষ্টির জন্য হবে। বর্তমানে বেশিরভাগ বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি হয় পার্থিব সম্পর্কের উপর। অথচ এটা তাদের (পরকালে) কোন উপকারে আসবে না।"

روى الإمام أحمد عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: (قلت لعمر رضى الله عنه: لى كاتب نصرانى، قال ما لك قاتلك الله أما سمعت الله يقول: (يايها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض) (المائدة: ٥١)؟ ألا أتخذت حنيفاً؟ قال: قال يا أمير المؤمنين، لى كتابه وله دينه! قال لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أُعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم وقد أقصاهم الله

অর্থ: "আবূ মুসা আশআরী (রা:) থেকে বণির্ত, তিনি বলেন আমি একবার উমর (রা:) এর কাছে কথা প্রসঙ্গে বললাম আমার একজন খৃষ্টান কেরানী আছে। তিনি তখন আমাকে বললেন, তোমার ধ্বংস হোক! তুমি কি জাননা যে, মহান আল-াহ পবিত্র কুরআনে তাদের ব্যাপারে কি বলেছেন? এই বলে তিনি কুরআনের সূরায়ে মায়েদার ৫১ নং আয়াত তিলাওয়াত করলেন,

"হে মুমিনগণ, তোমরা ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল-াহ যালিম কওমকে হিদায়াত দেন না।"

এরপর তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি কোন সঠিক মুসলিমকে কেন নিয়োগ দাওনি?

তখন আমি বললাম, 'হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি শুধু তার থেকে লেখার কাজ নিবো, আর সে তার ধর্ম পালন করবে।'

প্রতি উত্তরে উমর (রা:) বললেন, 'না, আমি তাদেরকে সম্মান দিবনা, যখন আল-াহ তাদেরকে অপমান করেছেন, আমি তাদেরকে ইজ্জত দিবো না, যখন আল-াহ তাদেরকে, বেইজ্জত করেছেন। আমি তাদেরকে কাছে আনবো না, যখন আল-াহ তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন।'

তাফসীরে কুরতুবীতে নিম্নে আয়াতটির তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে ঃ আল-াহ (সুব:) ইরশাদ করেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ রূপে গ্রহণ করো না, তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ক্রুটি করে না-তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতা প্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখে ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে তা আরো বেশী জঘন্য। তোমাদের জন্যে নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সামর্থ হও। (আল ইমরান, ৩ ঃ ১১৮)

ইমাম কুরতুবীর (রহ:) তাফরীর

نهى الله عباده المؤمنين، أن يتخذوا من الكفار واليهود، وأهل الأهواء والبدع، أصحاباً وأصدقاء، يفاوضونهم فى الرأى، ويسندون إليهم أمورهم؛.

অর্থ: "আল-াহ তা'আলা মুমিন বান্দাদেরকে কাফের-মুশরিক, ইয়াহুদী-নাসারা ও প্রবৃত্তির অনুসারী এবং বেদআতীদের কে বন্ধু/সাথি হিসাবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। তাদের থেকে পরামর্শ নেয়া, তাদের প্রতি কোন কাজের দায়িত্ব আর্পণ করা যাবে না। ইমাম রাবী' বলেন:

وعن الربيع (لا تتخذوا بطانة) لا تستدخلوا المنافقين، ولا تتولوهم من دون المؤمنين؛ ويقال: كل من كان على خلاف مذهبك، لا ينبغى لك أن تخادنه، وتعاشره وتركن إليه

অর্থ: "তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ রূপে গ্রহণ করো না" এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা মুনাফিকদেরকে তোমাদের আভ্যন্তরীন কাজে প্রবেশ করাইও না। এবং মুমিনদের পরিবর্তে তাদেরকে বন্ধু বানাবে না। জেনে রাখ! যে কেহ তোমার দ্বীনি আর্দশের পরিপন্থী হবে তাকে তোমার গোপন বন্ধু বানানো, তার সাথে উঠ-বসা করা, তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া তোমার জন্য উচি নয়।

সাহাবাদের অবস্থা

موقف الصحابة مع واقعهم 'আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ' এর ক্ষেত্রে সাহাবীদের দৃঢ় অবস্থান

'আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ' এর বাস্তব নমুনা দেখা যায় সাহাবয়ে কেরামদের জীবনে। যারা ইসলাম গ্রহণ করার পরে তাদের জীবনের চলা-ফেরা, উঠ-বসা, আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব সব কিছু পাল্টে যায়। একদিকে বাপ মুসলিম ছেলে কাফের, আবার অপরদিকে ছেলে মুসলিম বাপ কাফের। স্বামী মুসলিম স্ত্রী কাফের, স্ত্রী মুসলিম স্বামী কাফের। এমন এক কঠিন অবস্থায় তারা ইসলামের জন্য পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান, বাড়ি-ঘর সবকিছু ত্যাগ করে আল-াহ এবং আল-াহর রাসূল (সা:) কে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। কেননা কুরআনে নির্দেশ করা হয়েছে:

{قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ } [التوبة: ২৪]

অর্থ: " বল, 'তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছ এবং সে বাসস্থান, যা তোমরা পছন্দ করছ, যদি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল-াহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল-াহ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত'। আর আল-াহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।"[২১৫]

তাছাড়া হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

অর্থ: "আনাস (রা:) থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, রাসূলুল-াহ (সা:) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারে না, যতক্ষন পর্যন্ত

[২১৫] সুরা তাওবা ৯/২৪।

আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তান ও সমস্ত মানুসের চেয়ে বেশী প্রিয় না হবো।"[২১৬]

মূলত: কোন মু'মিন যখন আল-াহ এবং আল-াহর রাসূল (সা:) কে ভালবাসে তখন সে আল-াহ এবং আল-াহর রাসূল (সা:) এর দুশমনদের ভালবাসতে পারে না। আপনি আমাকে ভালবাসবেন আবার আমার দুশমনকেও ভালবাসবেন এটা হতে পারে না। কুরআনুল কারীমে নিম্নের আয়াতে সে বিষয়টিই পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

অর্থ: "যারা আল-াহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল-াহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল-াহ্ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নদী সমূহ। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল-াহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল-াহ্র প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল-াহ্র দল। জেনে রাখ, আল-াহ্র দলই সফলকাম হবে। (মুজাদালা, ৫৮ঃ ২২)

قال الشيخ الاسلام : أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يوجد مؤمن يوادّ كافرا، فمن وادّه فليس مؤمن، قال والمشابهة مظنة الموادة فتكون محرمة.

অর্থ: "শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেছেন, এই আয়াতে মহান আল-াহ সুব: বলছেন যে, কোন মুমিনকে এমন পাওয়া যাবে না যে কাফিরকে ভালোবাসে। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন কাফিরের সাথে বন্ধুত্ব করে সে মুমিন নয়।

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে কাসীর (র:) বলেন:

قال العماد بن كثير فى تفسيره: قيل نزلت فى أبى عبيده حين قتل أباه يوم بدر، (أو أبنائهم)، فى الصديق يومئذ هم بقتل ابنه عبد الرحمن، (أو إخوانهم)، فى مصعب بن

[২১৬] সহীহ বুখারী ১৫।

عمير قتل أخاه عبيد بن عمير، (أو عشيرتهم) فى عمر قتل قريبا له يومئذ أيضا، وحمزة وعلى وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ.

অর্থ: উপরোক্ত আয়াতে " **وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ** (যদিও তারা তাদের পিতা হোক না কেন) কথাটি বলা হয়েছে আবূ উবায়দা (রা:) এর ব্যাপারে, যখন তিনি বদরের যুদ্ধে তার পিতাকে হত্যা করেছিলেন।

أَوْ أَبْنَاءَهُمْ (অথবা তাদের সন্তান হোক না কেন) কথাটি বলা হয়েছে আবূ বকর (রা:) এর ব্যাপারে। বদরের ময়দানে যিনি আপন ছেলেকে পেলে তাকেও হত্যা করার কথা ঘোষণা করেছিলেন।

أَوْ إِخْوَانَهُمْ (অথবা তাদের ভাই হোক না কেন) কথাটি বলা হয়েছে মুসআব ইবনে উমায়ের (রা:) সম্পর্কে। যিনি বদরের যুদ্ধে আপন ভাই উবায়েদ বিন উমায়েরকে হত্যা করেছিলেন।[২১৭]

أَوْ عَشِيرَتَهُمْ (অথবা তাদের নিকটাত্মীয় হোক না কেন) কথাটি বলা হয়েছে উমর (রা:), হামযা (রা:), আলী (রা:) ও উবায়দ (রা:) প্রমূখ সাহাবীদের ব্যাপারে, যারা সেদিন উতবা, শায়বা, ওয়ালীদ ইবনে উতবাসহ নিকটাত্মীয়দেরকে হত্যা করেছিলেন।

সাআ'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস ও তার মায়ের ঘটনা

সাআ'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা:) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তার মা খানা-পিনা বন্ধ করে দিয়েছিলো যাতে করে সাআ'দ (রা:) ইসলাম ত্যাগ করেন। তিনি তার মাকে অনেক বুঝালেন। কিন্তু তার মা অনড় থাকলেন। শেষ পর্যন্ত সাআ'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা:) তার মাকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলেন যে, তোমার মতো হাজারো মা যদি ধুকে ধুকে মরে যায়, তবুও আমি বিন্দু পরিমাণও ইসলাম থেকে সরে আসবো না।

উম্মূল মু'মিনীন উম্মে হাবীবা (রা:) এবং তার পিতা আবূ সুফিয়ানের ঘটনা

উম্মে হাবীবা (রা:) এর সেই প্রসিদ্ধ ঘটনা। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর যখন আবূ সুফিয়ান (তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নি) মদীনায় আসলেন। এমতাবস্থায় তিনি নিজ কন্যা উম্মে হাবীবা (রা:) (যিনি মহানবী (সা:) এর স্ত্রী ছিলেন) তার

[২১৭] তাফসিরে ইবনে কাসির ৮/৫৪।

ঘরে এলেন। তখন উম্মে হাবীবা (রা:) তাকে দেখে বিছানা গুটিয়ে ফেলতে লাগলেন। এই দৃশ্য দেখে আবূ সুফিয়ান বললেন, কি হলো তোমার! তুমি কেন বিছানা গুটিয়ে ফেলছ? আমি কি এই বিছানার উপযুক্ত নই? নাকি এই বিছানাটি আমার উপযুক্ত নয়? কোনটি?

তখন উম্মে হাবীবা (রা:) বললেন, হে পিতা! আপনি মুশরিক। আর মুশরিকরা অপবিত্র। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: ২৮]

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয় মুশরিকরা নাপাক।"[২১৮] কোন নাপাক মানুষ নাবীর (সা:) এর বিছানায় বসার যোগ্যতা রাখে না। তাই আমি এই বিছানা গুটিয়ে ফেলেছি। কারণ আপনি এর যোগ্য নন। তখন আবূ সুফিয়ান বললো, আল-াহর কসম! আমার কাছ থেকে আসার পর তুমি বদলে গেছো। [২১৯]

সাআ'দ ইবনে মুআ'জ (রা:) ও বনূ কুরাইজা এর ঘটনা

সাআ'দ ইবনে মুআ'জ (রা:) এর সেই ঐতিহাসিক ঘটনার কথাও স্মরণ করুন। বনু কুরাইজা বিশ্বাস ঘাতকতা করার পর মহানবী (সা:) যখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। তাদের দূর্গ ঘেরাও করলেন। শেষ পর্যন্ত বনু কুরাইজা হযরত সাআ'দ ইবনে মুআ'জ (রা:) এর ফায়সালা মেনে নেয়ার কথা বললে মহানবী (সা:) হযরত সাআ'দ (রা:) কে ডেকে তাদের ব্যাপারে ফায়সালা করার নির্দেশ দিলেন। হযরত সাআ'দ (রা:) ছিলেন বনু কুরাইজার মিত্র। তাই বনু কুরাইজা ভেবে ছিলো হযরত সাআ'দ (রা:) তাদের পক্ষেই ফায়সালা দিবেন।

সাআ'দ (রা:) যখন মহানবী (সা:) এর সামনে উপস্থিত হলেন তখন রাসূল (সা:) বললেন, হে সাআ'দ! ওরা তোমার ফায়সালা মেনে নিতে রাজি হয়েছে। সাআ'দ (রা:) বললেন, আমার ফায়সালা তাদের উপর প্রযোজ্য হবে কি? সবাই বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, মুসলিমদের জন্যও কি প্রযোজ্য হবে? তারা বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন যিনি এখানে উপস্থিত রয়েছেন তার উপরও কি প্রযোজ্য হবে? রাসূল (সা:) এর প্রতি ইঙ্গিত করেই তিনি একথা বলেছিলেন। রাসূল (সা:) বললেন, হ্যাঁ। আমার উপরও প্রযোজ্য হবে। হযরত সাআ'দ (রা:) বললেন, তবে বলছি ওদের ব্যাপারে আমার ফায়সালা হচ্ছে এই যে, বনু কুরাইজার সকল

[২১৮] সুরা তাওবা ৯/২৮।

[২১৯] আর রাহীকুল মাখতু, পৃষ্ঠা ৪১১।

যুদ্ধ করতে সক্ষম পুরুষদেরকে হত্যা করা হবে, মহিলাদেরকে বন্দী করা হবে এবং তাদের ধন-সম্পদগুলোকে গণীমতের মাল হিসেবে বন্টন করে দেয়া হবে।

রাসূলুল-াহ (সা:) তখন বললেন যে, তুমি তাদের ব্যাপারে সেই ফায়সালাই দিয়েছো যা আল-াহ (সুব:) তাদের ব্যাপারে সাত আসমানের উপর করে রেখেছেন।"[২২০]

মূলত: মিনায় জামারাতে পাথর নিক্ষেপ করার মাধ্যমে এই সবকটিই দেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, হাজী সাহেবগণ হজ্জ করতে গিয়ে ঠিকই মিনায় পাথর মারেন। কিন্তু তারা জানেন না, এখানে কাকে পাথর মারা হলো? আর কেনই বা মারা হলো? হজ্জ করে দেশে ফেরার পরে আগের মতই বেনামাজী, সুদখোর, ঘুষখোর, মদখোর, জুয়াচোর, মূর্তিপূজক, তাগুত সকলের সাথেই বন্ধুত্ব ঠিক রাখে। তাদের জন্য আতর, তাসবীহ, রুমাল, সুরমা আর খুরমা সহ নানা রকম হাদিয়া তোহফা নিয়ে আসে। এমনকি শয়তানকে পাথর মারার পরেই কুরবানী করে মাথা মুণ্ডানোর সময় দাড়িও মুণ্ডিয়ে ফেলে। কিছুক্ষণ আগে যেই শয়তানকে পাথর মারলো একটু পরেই সেই শয়তানের তাবেদারী করলো। অথচ রাসূলুল-াহ (সা:) এর কঠোর নির্দেশ হচ্ছে: দাড়ি ছেড়ে দাও!

আল-াহর দুশমনদের থেকে 'বারাআহ' সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে 'সুরাতুল বারাআহ' নামে একটি সুরাও রয়েছে। যা 'সুরা তাওবা' নামে প্রসিদ্ধ। এর শুরুতেই রয়েছে:

{بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: ১]

অর্থ: " আল-াহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা মুশরিকদের মধ্য থেকে সে সব লোকের প্রতি, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে।"[২২১]

মক্কা বিজয়ের পর আবূ বকর (রা:) কে আমীরুল হজ্জ বানিয়ে পাঠানোর পরে আলী (রা:) কে এ আয়াতের ঘোষণা দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং হজ্জের মাধ্যমে আল-াহর দুশমনদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার শিক্ষা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত।

ইবরাহীম (আ:) ও তার সাথিগণের 'বারাআহ'

হজ্জের মাধ্যমে ইবরাহীম (আ:) এর বিভিন্ন কাজের অনুসরণ করা হয়ে থাকে। তিনিও স্পষ্টভাবে আল-াহর দুশমনদের থেকে সম্পর্কছিন্ন করার ঘোষণা

[২২০] আর রাহীকুল মাখতু, পৃষ্ঠা ৩২১।

[২২১] সুরা তাওবা ৯/১।

দিয়েছিলেন। এমনকি তার পিতা, তার জাতি সকলকে উদ্দেশ্য করে দীপ্ত কণ্ঠে 'আল বারাআর' ঘোষণা করেছিলেন। আর এ কারণেই আল-াহ (সুব:) তাকে ও তাঁর অনুসারীদেরকে গোটা মানবজাতির জন্য আদর্শ হিসাবে ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

অর্থঃ "আর অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ ইবরাহীম ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ আমাদের কোন সম্পর্ক নেই তোমাদের সাথে এবং আল-াহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদত কর তাদের সাথেও। আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করি। আর তোমরা এক আল-াহর প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ড় আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরতরে শত্র ুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে রইল।"[২২২]

এ আয়াতে আল-াহ্ (সুব:) ইবরাহীম (আ:) ও তাঁর সঙ্গীদেরকে আদর্শ হিসাবে পেশ করেছেন যে, তাঁরা কাফেরদের থেকে এবং তাদের জাতির থেকে বারাআহ (সম্পর্ক ছিন্ন) করেছেন।

'আসহাবে কাহাফের' বারাআহ

আসহাবে কাহাফগণও তাদের জাতি, আপনজন থেকে 'বারাআহ' করেছিলেন আর সে কারণেই আল-াহ (সুব:) তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে পবিত্র কুরআনুল কারীমে তাদের নামে একটি সুরা নাজিল করেছেন। আর সেটি হচ্ছে 'সুরাতুল কাহাফ'। এ সুরারই একটি আয়াতে বলা হয়েছে:

{وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ } [الكهف: ١٦]

অর্থ: "আর যখন তোমরা তাদের থেকে আলাদা হয়েছ এবং আল-াহ ছাড়া যাদের তারা উপাসনা করে তাদের থেকেও।"[২২৩]

এসকল আয়াতে একটি গুর ুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় বিষয় হলো এই যে, আল-াহর পরিবর্তে যেসকল দেব-দেবী ও মূর্তি-প্রতিমার পূজা করা হয়। তাদেরকে বর্জণ করার পূর্বে যারা এগুলো তৈরী করে, সংরক্ষণ করে, পূজা করে তাদেরকে বর্জণ

---

[২২২] সূরা মুমতাহিনা ৬০: ৪।
[২২৩] সুরা কাহাফ ১৬।

করার কথা বলা হয়েছে। বুঝা গেল মূর্তির চেয়েও মূর্তিপূজকরা বেশি ভয়ানক। ওদেরকে বর্জণ করতে হবে।

একটি সুক্ষ্ম রহস্য

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা দেখতে পেলাম যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা:) ও অন্যান্য মু'মিনগণ যখন আল-াহর (সুব:) নির্দেশ ও ইচ্ছা অনুসারে তাদের কাফির আত্মীয়-স্বজনদের সাথে শত্র ুতা ও কঠোরতা অবলম্বন করলেন তখন আল-াহ (সুব:) তাদেরকে এর বিনিময়ে নিজ সন্তুষ্টি ও চিরস্থায়ী নিয়ামত, মহান সাফল্য ও ব্যাপক অনুগ্রহ প্রদান করলেন। ফলে তারাও আল-াহ প্রদত্ত এই সকল নিয়ামত পেয়ে মহান আল-াহর প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। মহান আল-াহ (সুব:) তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে শয়তানের দলের বিপক্ষে বিজয়, সফলতা ও সাহায্যের সুসংবাদ দিলেন।

কাফের-মুশরিকদের থেকে 'বারাআহ' করা ব্যতিত ইসলাম পরিপূর্ণ হয় না

প্রতিটি মু'মিনের জন্য অপরিহার্য হলো কাফির মুশরিক, ইয়াহুদী, খৃস্টান ও আল-াহর আইন পরিবর্তনকারী জালিম শাসকদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা। তাদের সাথে কোন প্রকার বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা, বিয়ে-শাদী ইত্যাদি করা যাবে না। এ সম্পর্কে কোরআনের দলিল সমূহঃ-

প্রথম দলিল ইবরাহীম আ. এর বারাআহ।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيا.

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلا جَعَلْنَا نَبِيا.

অর্থ:- 'আমি (ইবরাহীম (আ:) পরিত্যাগ করছি তোমাদেরকে এবং তোমরা আল-াহ্ ব্যতীত যাদের এবাদত কর তাদেরকে; আমি আমার রবের ইবাদত করব। আশা করি, আমার রবের ইবাদত করে আমি বঞ্চিত হব না। অত:পর তিনি যখন তাদেরকে এবং তারা আল-াহ্ ব্যতীত যাদের ইবাদত করতো, তাদের সবাইকে পরিত্যাগ করলেন, তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং প্রত্যেককে নবী করলাম।"[২২৪]

---

[২২৪] মারইয়াম, ৪৮-৪৯।

এ আয়াত থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল, যে আল-াহর দুশমনদের থেকে 'বারাআহ' করলে আল-াহর সাহায্য পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় দলিল 'বারাআহ' করতে আল-াহর নির্দেশ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

অর্থ:-"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রূদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করো না, অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তা তারা অস্বীকার করেছে এবং রাসূলকে ও তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে এজন্য যে, তোমরা তোমাদের রব আল-াহর প্রতি ঈমান এনেছ। তোমরা যদি আমার পথে সংগ্রামে ও আমার সন্তুষ্টির সন্ধানে বের হও (তবে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।) তোমরা গোপনে তাদের সাথে বন্ধুত্ব প্রকাশ কর অথচ তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর তা আমি জানি। তোমাদের মধ্যে যে এমন করবে সে সরল পথ হতে বিচ্যুত হবে।"[২২৫]

তৃতীয় দলীল: নূহ আ. এর প্রতি 'বারাআহ'র নির্দেশ

নূহ (আ:) যখন তার কাফের ছেলেকে নিজ পরিবারের সদস্য হিসাবে মনে করে আল-াহর (সুব:) কাছে দু'আ করেছিলেন যা কুরআনুল কারীমের নিম্নের আয়াতে বলা হয়েছে:

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ

অর্থঃ আর নূহ (আ:) তাঁর রবকে ডেকে বললেন। হে আমার রব! আমার পুত্র তো আমার পরিজনদের অন্তর্ভুক্ত; আর আপনার ওয়াদাও নি:সন্দেহে সত্য আর আপনিই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ফয়সালাকারী। (সূরা হুদ- ১১ ঃ ৪৫)

প্রতি উত্তরে আল-াহ (সুব:) বললেন:

قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ

[২২৫] সুরা আল মুমতাহিনা:১।

অর্থঃ "আল-াহ্ (সুব:) বললেন, হে নূহ! নিশ্চয় সে আপনার পরিবারভুক্ত নহে। নিশ্চই সে দুরাচার! সুতরাং আমার কাছে এমন দরখাস্ড় করবেন না, যার খবর আপনি জানেন না। আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, আপনি অজ্ঞদের দলভুক্ত হবেন না। (সূরা হুদ-১১ঃ ৪৬)

এ আয়াতে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, রক্তের সম্পর্কে যতই আপন হউক না কেন, ঈমান না থাকলে তাকে বর্জন করতে হবে ও তার সাথে 'বারাআহ' করতে হবে। নিম্নে আয়াতটি এ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট দলীল। ইরশাদ হচ্ছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

অর্থঃ "হে যারা ঈমান এনেছ ! তোমরা অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না তোমাদের পিতা ও তোমাদের ভ্রাতাদেরকে, যদি তারা কুফরীকে প্রিয় মনে করে ঈমানের তুলনায়; তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, তারাই জালিম।" (সূরা তাওবা- ৯ ঃ ২৩)

আপনি আল-াহর দুশমনদের থেকে কিভাবে 'বারাআহ' করবেন

১. লেবাসে-পোষাকে, কথা-বার্তায়, চাল-চলনে কাফের, মুশরিক, ইয়াহুদী, নাসারা, হিন্দু, বৌদ্ধ, নাস্তিক, মুরতাদ, ফাসেক, ফুজ্জারদের সাথে কোনভাবে মিল রাখবেন না। যেমন: দাড়ি মুন্ডাবেন না, ছোট করবেন না, গোঁফ লম্বা রাখবেন না, প্রয়োজন ছাড়া তাদের ভাষায় কথা বলবেন না। তাদের স্টাইল গ্রহণ করবেন না।

২. তাদের এলাকায় অবস্থান করবেন না। আনন্দ-ফুর্তি ও বিনোদনের জন্য তাদের দেশে যাবেন না। তবে ব্যবসা-বানিজ্য, শিক্ষা-চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী যাওয়া যাবে। প্রয়োজন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসবেন। মুসলিমদের বিরূদ্ধে তাদেরকে সাহায্য-সহযোগীতা করবেন না। তাদের প্রশংসা করবেন না। তাদের দোষ-ত্রূটি ও সমালোচনাগুলোর ব্যাপারে তাদের পক্ষ হয়ে জবাব দিবেন না।

৩. তাদের সাহায্য-সহানুভূতি চাবেন না। এবং তাদের উপর নির্ভরশীল হবেন না। গুরূত্বপূর্ণ কোন কাজে তাদের পরামর্শ নিবেন না। তাদেরকে কোন গুরূত্বপূর্ণ পদে বসাবেন না। অফিসের বা দোকানের এম.ডি, ম্যানেজার ও হিসাবরক্ষক বানাবেন না।

৪. তাদের তারিখে দিন তারিখ হিসাব করবেন না। বিশেষ করে যে সকল দিন-তারিখ তাদের ধর্ম ও সাংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত। যেমন: ইংরেজি তারিখ যিশুখৃষ্টের

জন্মের সাথে সম্পৃক্ত এটা বর্জণ করতে হবে। সেজন্য সাহাবায়ে কিরাম হিজরী সনের সূচনা করেন।

৫. তাদের বিয়ে-শাদী, আনন্দ-উৎসবে অংশগ্রহণ করবেন না। চাঁদা দিবেন না।

৬. তাদের কোন প্রশংসা করবেন না। তাদের চরিত্র-পান্ডিত্য, অর্থ-সম্পদ, ব্যবসা-বানিজ্য ইত্যাদি সহ কোনটারই প্রশংসা করা যাবে না।

৭. তাদের নামে নামকরণ করবেন না। নিজের ছেলেদের মেয়েদের অন্যান্যদের নাম রাখতে গিয়ে মন্টু, ঝন্টু, পিন্টু, মিন্টু, লালু, ফালু, দুলু, ভুলু, অপু, তপু, দীপু, শীপু, রুমু, ঝুমু ইত্যাদি বর্জণ করা।

৮. তাদের পণ্য বর্জণ করুন। পেপসী, সেভেন আপ, কোকাকোলা, মেরিন্ডা এবং তাদের কোম্পানিতে তৈরী তেল, সাবান, পাউডার, স্নো, ক্রীম, জুতা, সেন্ডেল, কাপড়, চোপড় বর্জণ করুন।

৯. তাদের জন্য দয়া-মায়া করা যাবে না। মারা গেলে তাদের মাগফিরাত কামনা করা যাবে না।

১০. তাদের কাছে বিচার-ফয়সালা চাওয়া যাবে না।

'আল অলা ওয়াল বারাআহ' এর ব্যাপারে একটি মূলনীতি

প্রশ্ন: দুনিয়ায় চলতে গেলে অনেক সময় সবরকম মানুষের সাথে মিশতে হয়। ব্যবসা-বানিজ্য, চাকরি-নোকরি, হাট-বাজার সকল ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার মানুষের সাথে কাজ করতে হয়। সেক্ষেত্রে কিভাবে 'বারাআহ' করবো?

উত্তর: এক্ষেত্রে আমরা মানুষকে চারটি ভাগে ভাগ করতে পারি। **এক:** খাদ্য সমতুল্য। **দুই:** ঔষধ সমতুল্য। **তিন:** সংক্রামক ব্যধি সমতুল্য। **চার:** বিষ সমতুল্য।

প্রথম প্রকার: ঐ সকল আলেম-ওলামা, দ্বীনি ভাই-বোন যাদের সাথে যোগাযোগ রাখা একান্ত জরুরী। খাদ্য যেমন সবসময় প্রয়োজন। নাখেলে অসুস্থ হয়ে পরে। মারা যায়। ঠিক তেমনিভাবে কুরআন-সুন্নাহের সঠিক অনুসারী দ্বীনের দায়ী'দের সাথে যোগাযোগ রাখা সবসময় জরুরী। নতুবা ঈমান হারা হয়ে মৃত্যুবরণ করার আশংকা আছে।

দ্বিতীয় প্রকার: সমাজের সাধারণ মানুষ। ব্যবসা-বানিজ্য, চাকরি-নোকরি, হাট-বাজার করতে গেলে যাদের সাথে ওঠা-বসা, লেনদেনের প্রয়োজন হয়। তাদের

সঙ্গে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু মেলামেশা করা যাবে। প্রয়োজন শেষ হলে কেটে পরতে হবে। যেভাবে ঔষধ মানুষেরা প্রয়োজন হলে খায়। এবং যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই খায়। বেশী খায় না। অথবা এই শ্রেণীর লোকদেরকে বাথরুমের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। যখন পায়খানার বেগ হয় তখনই কেবল ওখানে যায়। প্রয়োজন শেষ হলে কালবিলম্ব না করে বের হয়ে চলে আসে। ঠিক তেমনিভাবে সমাজের সাধারণ মানুষের সাথে যখন যতটুকু প্রয়োজন হবে তখন ততটুকু দেখা-সাক্ষাত, কথা-বার্তা বলা যাবে।

তৃতীয় প্রকার: সমাজে আরেক প্রকার মানুষ আছে যারা সংক্রামক ব্যধি বা ছোয়াচে রোগের মত। সংক্রামক ব্যধিগ্রস্ত লোকদের সাথে মিশলে যেমন নিজেও আক্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকে ঠিক তেমনিভাবে সমাজের এই শ্রেণীর লোকদের সাথে মিশলে নিজেও ঈমানী রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা আছে। এরা হলো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী এবং পীরদের মুরিদ। যাদের খপ্পরে পরলে আপনাকেও বিভ্রান্ত করতে পারে। তাই সংক্রামক ব্যধিগ্রস্ত লোকদের থেকে লোকেরা যেভাবে দূরে থাকে সেভাবে আপনিও ওদের থেকে দূরে থাকবেন।

চতুর্থ প্রকার: সমাজের আরেক প্রকার লোক আছে যারা বিষ সমতুল্য। বিষ খেলে যেমন মানুষ মারা যায় ঠিক ওদের খপ্পরে পরলেও আপনি ঈমানহারা হয়ে কাফের-মুশরিক ও বেইমান হয়ে যাবেন। ওরা আপনাকে বিভিন্ন রকমের যুক্তি-তর্ক ও কিচ্ছা-কাহিনী শুনিয়ে বিভ্রান্তির বেড়া-জালে আটকে ফেলবে। এরা হলো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লিডার (নেতা-নেত্রী) এবং বিভিন্ন তরীকার পীর-মাশায়েখগণ। রাজনৈতিক লিডারগণ বিভিন্ন যুক্তি-তর্ক দিয়ে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র, জাতিয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে আপনাকে আটকে ফেলবে। কোনভাবে না পারলে শেষ পর্যন্ত বলবে যে, এটা পশ্চিমা গণতন্ত্র নয়, এটা ইসলামী গণতন্ত্র। আপনি সাবধান! ইসলামে কোন গণতন্ত্র নাই। বরং পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে গণতন্ত্রের বিরূদ্ধে বক্তব্য রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

{وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ } [الأنعام: ১১৬]

অর্থ: " আর যদি তুমি যারা যমীনে আছে তাদের অধিকাংশের (মতের) আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাকে আল-াহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা শুধু ধারণারই অনুসরণ করে এবং তারা শুধু অনুমানই করে।"[২২৬]

[২২৬] সুরা আনআম ১১৬।

অপরদিকে বিভিন্ন তরিকার পীর-মাশায়েখগণ কুরআন ও সুন্নাহর বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসকে বিকৃত করে বলবে পীরের মাধ্যম ছাড়া আল-াহকে পাওয়া যাবে না। পীর সাহেবরা মুরিদের অন্তরের সবকিছু দেখতে পান। এমনকি আসমান-যমিন, লৌহ-কলম কোথায় কি হচ্ছে সবকিছু তাদের নখদর্পে। এজন্য তারা বিভিন্ন কিচ্ছা-কাহিনী মনগড়া কারামতি-বুযুর্গী পেশ করবে। এরাও আপনাকে তাদের তরীকার পীর-মাশায়েখ ও লক্ষ-লক্ষ মুরিদদেরকে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করবে। এরা কুরআন-সুন্নাহের সঠিক অনুসরণ থেকে আপনাকে দূরে সরিয়ে ফেলবে। শয়তানের সর্ব শেষ চাল এটাই যে, যখন কাউকে শত চেষ্টা করেও বিভ্রান্ত করতে পারে না তখন সে বুঝায় যে, তুমি পাপী মানুষ, তুমি আল-াহর কাছে সরাসরি দুআ' করলে আল-াহ (সুবঃ) শুনবেন না। তুমি একজন পীর ধর। পীর তোমার জন্য দুআ' করলেই তুমি আল-াহকে পেতে পার। তখন ঐলোকটি একজন পীরের কাছে গিয়ে মুরিদ হয়ে যায়। এরপরে শয়তানের বাকী মিশন পীর সাহেবই আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। তাই এ জাতিয় লোকজন থেকে একেবারে দুরে থাকতে হবে।

কুরবানীর শিক্ষা

প্রথম শিক্ষাঃ ১০ই জিলহজ্জ 'জামারাতুল আকাবায়' পাথর মারার পর দ্বিতীয় কাজ হলো কুরবানী করা। তামাত্তু, কিরান হজ্জকারীদের জন্য একটি দম বা কুরবানী দেওয়া ওয়াজিব। ইফরাদ হজ্জকারীদের জন ওয়াজিব না। এখানে এটাও মনে রাখতে হবে যে এই কুরবানী সাধারণভাবে আপনি দেশে বসে যেই কুরবানী করেন সেই কুরবানী নয়। প্রথমতঃ আল-াহর (সুবঃ) সন্তুষ্টি অর্জণ করাই কুরবানী করার মূল উদ্দেশ্য। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছেঃ

{وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (৩৪) الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (৩৫) وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (৩৬) لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ} [الحج: ৩৪ – ৩৭]

অর্থঃ "প্রত্যেক জাতির জন্য আমি কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি; যাতে তারা আল-াহর নাম স্মরণ করতে পারে, যে সমস্ত জন্তু তিনি রিয্ক হিসেবে দিয়েছেন তার উপর। তোমাদের ইলাহতো এক ইলাহ; অতএব তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ কর; আর অনুগতদেরকে সুসংবাদ দাও, যাদের কাছে আল-াহর কথা উলে-খ করা হলে তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে, যারা তাদের বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করে, যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। আর কুরবানীর উটকে আমি তোমাদের জন্য আল-াহর অন্যতম নিদর্শন বানিয়েছি; তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে কল্যাণ। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় সেগুলির উপর আল-াহর নাম উচ্চারণ কর যখন সেগুলি কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তা থেকে খাও। যে অভাবী, মানুষের কাছে হাত পাতে না এবং যে অভাবী চেয়ে বেড়ায়-তাদেরকে খেতে দাও। এভাবেই আমি ওগুলিকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছি; যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আল-াহর কাছে পৌঁছে না এগুলোর গোশ্ত ও রক্ত; বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া। এভাবেই তিনি সেসবকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আল-াহর তাকবীর পাঠ করতে পার, এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন; সুতরাং তুমি সৎকর্মশীলদেরকে সুসংবাদ দাও।"[২২৭]

এখানে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আল-াহর কাছে কুরবানীর পশুর রক্ত-মাংস পৌঁছে না। আল-াহ (সুবঃ) তোমাদের কুরবানীর পশুর গোশত মাংস খান না। আল-াহ (সুবঃ) এর থেকে উর্দ্ধে। আল-াহ তায়াল শুধু তোমাদের সৎ নিয়ত দেখেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

{ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } [الأنعام: ১৬২]

অর্থঃ "হে নাবী! আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ সব কিছু আল-াহ (সুবঃ) এর জন্য যিনি গোটা জগৎসমূহের রব।"[২২৮]

জাহেলী যুগের কাফেররা গাইরুল-াহর ইবাদত করতো এবং গাইরুল-াহর নামে পশু কুরবানী করতো।

সে সব আকিদা ও আমলের বিরোধিতা করার জন্য আল-াহ (সুবঃ) মু'মিনদের কে নির্দেশ দিয়েছেনঃ

{ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: ২]

অর্থঃ "আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং পশু যবেহ করুন।"[২২৯]

---

[২২৭] সুরা হজ্জ ৩৪-৩৭।

[২২৮] সুরা আনআম ১৬২।

দ্বিতীয় শিক্ষা: পশু যবেহ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আল-াহ (সুব:) এর নৈকট্য লাভের জন্য যে সকল ইবাদত রয়েছে কুরবানী তার মধ্যে অন্যতম। হজ্জের সময় 'হাদী' কুরবানী করে ঈদুল আযহায়, আকীকায়, মান্নত করে ইত্যাদি উপায়ে পশু যবেহ করার মাধ্যমে মানুষেরা আল-াহর নৈকট্য অর্জণ করে থাকে। সুতরাং কোন গাইরুল-াহর নামে কোন পশু যবেহ করা যাবে না। কারণ আল-াহর নামে পশু যবেহ করলে যদি আল-াহর ইবাদহ হয় তাহলে গাইরুল-াহর নামে যবেহ করলে কার ইবাদত হবে? নিশ্চয়ই গাইরুল-াহর ইবাদত হবে। আর আল-াহর জন্য যেই ইবাদতগুলো খাস, সেগুলো গাইরুল-াহর জন্য করা হারাম। এ সম্পর্কে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَنِي النَّبِيُّ –صلى الله عليه وسلم بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ قَالَ « لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ.

অর্থ: "আলী ইবনে আবী তালেব (রা:) বলেন, আল-াহর নাবী (সা:) আমাকে চারটি বাক্য বর্ণনা করেছেন। প্রথম: আল-াহ (সুব:) ঐ ব্যক্তির উপর লানত করেন যে তার পিতাকে লানত করে। দ্বিতীয়: আল-াহ (সুব:) ঐ ব্যক্তির উপর লানত করেন যে গাইরুল-াহর নামে পশু যবেহ করে। তৃতীয়: আল-াহ (সুব:) ঐ ব্যক্তির উপর লানত করেন যে কোন বেদআতী আশ্রয় দিবে। চতুর্থ: আল-াহ (সুব:) ঐ ব্যক্তির উপর লানত করেন যে জমিজামার সিমানার পিলার পরিবর্তণ করে।"[২৩০]

এ হাদীসে গাইরুল-াহর নামে যবেহকারীকে আল-াহর পক্ষ থেকে অভিশপ্ত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মূলত: গাইরুল-াহর নামে যবেহ করা শিরক। যা যতই তুচ্ছ প্রাণি হোক না কেন। ইমাম আহমদ 'আল যুহ্দ' নামক কিতাবে এবং আবূ নুআ'ঈম 'আল হিলইয়া' নামক কিতাবে সালমান ফারসী (রা:) থেকে সহীহ সনদে মাওকূফ হাদীসে বর্ণনা করেছেন:

حدثنا عبد الله ، أخبرنا أبي ، حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش ، عن سليمان بن ميسرة ، عن طارق بن شهاب ، عن سليمان دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ فِي ذُبَابٍ وَدَخَلَ رَجُلٌ النَّارَ فِي ذُبَابٍ , مَرَّ رَجُلاَنِ عَلَى قَوْمٍ قَدْ عَكَفُوا عَلَى صَنَمٍ لَهُمْ وَقَالُوا : لاَ يَمُرُّ عَلَيْنَا الْيَوْمَ أَحَدٌ إِلاَّ

[২২৯] সুরা কাউছার ২।
[২৩০] সহীহ মুসলিম ৫২৩৯।

قَدَّمَ شَيْئًا , فَقَالُوا لأَحَدِهِمَا : قَدِّمْ شَيْئًا , فَأَبَى فَقُتِلَ , وَقَالُوا : لِلآخَرِ : قَدِّمْ شَيْئًا , فَقَالُوا : قَدِّمْ وَلَوْ ذُبَابًا ، فَقَالَ : وَأَيْشٍ ذُبَابٌ , فَقَدَّمَ ذُبَابًا فَدَخَلَ النَّارَ ، فَقَالَ سَلْمَانُ : فَهَذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ فِي ذُبَابٍ , وَدَخَلَ هَذَا النَّارَ فِي ذُبَابٍ

অর্থ: রাসুলুল-াহ (সা:) বলেছেনঃ একটি মাছির কারণে এক ব্যক্তি জান্নাতে গিয়েছে এবং একটি মাছির কারণে এক ব্যক্তি জাহান্নামে গিয়েছে। সাহাবাগণ বললেন, হে আল-াহর রাসুল! এটা কিভাবে? রাসুলুল-াহ (স) বললেনঃ দু'ব্যক্তি এক গোত্রের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল, আর তাদের একটি মূর্তি ছিল, সে মূর্তিকে কিছু না দিয়ে কেউ অতিক্রম করতে পারত না। অতঃপর তারা (মূতি পুজক-রা) দু'জনের একজনকে বলল ,কিছু দিয়ে যাও। সে বলল, আমার নিকট কিছুই নেই যা আমি পেশ করব। তারা তাকে বললঃ একটি মাছি হলেও দিয়ে যাও। অতঃপর সে একটি মাছি দান করল; আর তারা তার রাস্তা ছেড়ে দিল, অতঃপর সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। (মুর্তির খাদেমরা) দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বললঃ তুমি কিছু দিয়ে যাও। লোকটি বলল, আমি মহান আল-াহ ব্যতীত কারো নামে কিছু উৎসর্গ করি না। তারা লোকটিকে হত্যা করল। অতঃপর লোকটি জান্নাতে প্রবেশ করল।"[২৩১]

গাইরুল-াহর নামে একটি মাছি উৎসর্গ করলে যদি শিরক হয় এবং তার পরিণতি জাহান্নাম হয় তাহলে যারা গাইরুল-াহর নামে যথা পীরের নামে, দরগার নামে, মাজারের নামে, মাজারের পাশের পুকুরের কচ্ছপের জন্য, কুমিরের জন্য, গজার মাছের জন্য উট, মহিষ, গরু, দুম্বা, ছাগল, ভেড়া, বকরি, মুরগী উৎসর্গ করে থাকে তাদের পরিনতি কি হবে?

তৃতীয় শিক্ষা: মানুষের মধ্যে দুইটি বিপরীতমুখি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একটি ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্য আর তা হচ্ছে আল-াহর ইবাদাত করা। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে পশুর বৈশিষ্ট্য আর তা হচ্ছে খানা-পিনা করা, স্ত্রী ব্যবহার করা, সন্তান জন্ম দেয়া, ঘুম যাওয়া ইত্যাদি। কিন্তু এই দুইটি বৈশিষ্টের মধ্যে একমাত্র প্রথমটিই হচ্ছে মানবসৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রয়োজন। কুরবানীর মাধ্যমে মানুষ পশুর বৈশিষ্ট্যকে ত্যাগ করে ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে যে, আমরা পশু যবেহ করার সাথে সাথে নিজের ভিতরের পশুত্বকেও ত্যাগ করলাম।

হলকের (মাথা মুন্ডানো/চুল ছাঁটার) শিক্ষা

[২৩১] আয যুহ্দ (আহমদ ইবনে হাম্বল) ৮৫; আল হুলইয়্যা (আবু নুআইম) ১/১০৮।

১০ই জিলহজ্জের চারটি কাজের তৃতীয় কাজ হচ্ছে হলক (মাথা মুন্ডানো) অথবা কসর (মাথার চুল ছাঁটা)। এটি হজ্জ ও ওমরাহর ওয়াজিব কাজগুলোর একটি। না করলে একটি 'দম' দিতে হবে। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে:

{ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ

অর্থ: "তোমরা ইনশাআল-াহ নিরাপদে তোমাদের মাথা মুন্ডন করে এবং চুল ছেঁটে নির্ভয়ে মাসজিদুল হারামে অবশ্যই প্রবেশ করবে।"[২৩২]

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَحِلُّوا وَيَحْلِقُوا أَوْ يُقَصِّرُوا

অর্থ: "ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণির্ত, তিনি বলেন রাসূলুল-াহ (সা:) যখন মক্কায় আগমন করেন তখন তিনি তার সাহাবীদেরকে বাইতুল-াহ এবং সাফা-মারওয়া তাওয়াফ করতে বললেন। এবং তারপর মাথা মুন্ডিয়ে অথবা চুল ছেঁটে হালাল হওয়ার জন্য আদেশ করলেন।"[২৩৩]

প্রথম শিক্ষা: আল-াহর (সুব:) নির্দেশ ও রাসূলের (সা:) এর আনুগত্যের উদ্দেশ্যে নিজের মস্তক অবনত করে দেয়া।

দ্বিতীয় শিক্ষা: বাহ্যিক ময়লা-আবর্জণা কেঁটে-ছেঁটে ফেলে দেওয়ার মাধ্যমে অন্তরের ময়লা-আবর্জণাও দূর করে ফেলা। মূলত: বাহ্যিক ময়লার থেকে অন্তরের ময়লা ক্ষতিকর বেশী। তাই মাথা মুন্ডানোর সাথে সাথে অন্তর থেকেও শিরক-বিদআত সহ সকল পাপ-পঙ্কিলতার ময়লা ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে ফেলা।

ষষ্ঠ অধ্যায়: যিয়ারতে মদীনা

মদীনা শরীফে যাওয়া হজ্জের কোন অংশ নয়। তবে রাসূলুল-াহ (সা:) মদীনার ফজিলত সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا

[২৩২] সুরা ফাতাহ ২৭।

[২৩৩] সহীহ বুখারী ১৭৩১।

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল-াহ (সা:) বলেছেন, নিশ্চয় ঈমান মদীনায় এসে মিশে যাবে (আশ্রয় নিবে) যেমনিভাবে সাপ তার গর্তের সাথে মিশে যায় (আশ্রয় নেয়)।[২৩৪]

عَنْ أَبِى حُمَيْدٍ قَالَ ....فَخَرَجْنَا حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ « هَذِهِ طَابَةُ وَهَذَا أُحُدٌ وَهُوَ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ».

অর্থ: "আবূ হুমাইদ (রা:) বলেন, আমরা রাসূলুল-াহ (সা:) এর সাথে (তাবুকের যুদ্ধে) বের হলাম তারপর আমরা ফিরে আসলাম অতপর যখন মদীনার নিকটে এসে পৌঁছলাম, তখন রাসূলুল-াহ (সা:) বললেন: এটা হচ্ছে 'ত্বাবাহ' (মদীনার নাম) । আর এটা হচ্ছে 'ওহুদ' পাহাড়। এটা এমন এক পাহাড় যে আমাদেরকে ভালবাসে আর আমরাও তাকে ভালবাসি।"[২৩৫]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ ...أَلاَ إِنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكِيرِ تُخْرِجُ الْخَبِيثَ. لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِىَ الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল-াহ (সা:) বলেছেন, জেনে রাখ! নিশ্চয় মদীন হলো (লোহা পোড়ানোর) হাপরের মত, যে মন্দ অংশকে (পুড়িয়ে) বের করে দেয়। কেয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত মদীনা তার (ভিতর থেকে) মন্দলোকদেরকে বের করে না দেয়, যেভাবে হাপর লোহার মন্দ অংশকে দূর করে দেয়।"[২৩৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى

অর্থ: "আবূ হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল-াহ (সা:) বলেছেন, তিনটি মসজিদ ব্যতিত অন্যকোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না। তাহলো: ১.মসজিদুল হারাম ২. মসজিদ আন নববী ৩. মসজিদুল আকসা।[২৩৭]

অপর হাদীসে বলা হয়েছে:

[২৩৪] সহীহ বুখারী ১৮৭৬।

[২৩৫] সহীহ বুখারী ৩৪৩৭।

[২৩৬] সহীহ মুসলিম ৩৪১৮।

[২৩৭] সহীহ বুখারী ১১৮৯; সহীহ মুসলিম ৩৪৫০।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلَ قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَرْبَعُونَ

অর্থ: "আবু যর গিফারী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল-াহ (সা:) কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, ইয়া রাসূলুল-াহ! পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে? তিনি বললেন, মসজিদুল হারাম। আমি বললাম তারপর কোনটি? তিনি বললেন, মসজিদুল আকসা। আমি বললাম, এদুয়ের মাঝে কত সময় অতিবাহিত হয়েছে? তিনি বললেন, চলি-শ বছর।"[২৩৮]

এই তিন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর জায়েজ হওয়ার কারণ হলো, এই তিনটি মসজিদের আলাদা বৈশিষ্ট্য এবং ফজিলত রয়েছে। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল-াহ (সা:) বলেছেন, আমার এই মসজিদে একটি সালাত আদায় করা অন্যান্য মসজিদে এক হাজার সালাত আদায় করার চেয়েও উত্তম। তবে মাসজিদুল হারাম ব্যতিত।"[২৩৯]

মাসজিদুল হারামের ফজিলত সম্পর্কে হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة

অর্থ: "জাবের (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রাসূলুল-াহ (সা:) বলেছেন, আমার এই মসজিদে একটি সালাত অন্যান্য মসজিদে এক হাজার সালাতের চেয়েও উত্তম। তবে মাসজিদুল হারাম ব্যতিত। মাসজিদুল হারামে একটি সালাত আদায় করা অন্যান্য মসজিদে এক লক্ষ সালাত আদায় করার চেয়েও উত্তম।"[২৪০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي

[২৩৮] সহীহ বুখারী ৩৪২৫; সহীহ মুসলিম ১১৮৯।

[২৩৯] সহীহ বুখারী ১১৯০; সহীহ মুসলিম ৩৪৪০।

[২৪০] মুসনাদে আহমদ ১৪৭৩৫।

অর্থ: "আবূ হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল-াহ (সা:) বলেছেন আমার ঘর এবং আমার মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থানটি জান্নাতের বাগান সমূহ হতে একটি বাগান। আর আমার মিম্বার আমার হাউজের উপর।"[২৪১]

উপরোক্ত হাদীস গুলো থেকে মদীনার ফজিলত, মাসজিদে নববীর ফজিলত, ও—দ পাহাড়ের ফজিলত এবং রিয়াদুল জান্নাতের ফজিলত জানা গেল। বর্তমানে রিয়াজুল জান্নাতের অংশটি মাসজিদে নববীর অন্যান্য অংশ থেকে আলাদা করে চেনার জন্য সাদা কার্পেট বিছানো থাকে।

মসজিদে নববীতে প্রবেশ ও যিয়ারতের আদব

মসজিদে নববী, মসজিদে হারাম ও মসজিদে আকসা এই তিনটি মসজিদের যে মর্যাদা এবং এগুলোতে সালাত আদায় করার যে ফজিলত সেগুলো আল-াহ (সুব:) কতৃক প্রদত্ত। সুতরাং যে কেহ, মাদীনাতে আগমন করবে তাকে উপরোক্ত হাদীস গুলো স্মরণ করে সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল-াহ (সা:) এর আহবানে সাড়া দেওয়ার মানসিকতা নিয়ে আসা উচিৎ। এছাড়া এসব মসজিদে প্রবেশ করার জন্য আলাদা কোন নিয়ম-পদ্ধতি বা বিশেষ আদবের কোন উলে-খ সহীহ হাদীসে নেই। বরং অন্যান্য মসজিদে যে আদাব ও নিয়ম-পদ্ধতি রয়েছে এখানেও সেভাবেই প্রবেশ করবে। মসজিদে প্রবেশ করার কিছু আদাব এখানে উলে-খ করা হলো।

১. প্রথমে ডান পা দিয়ে নিম্নের দুআটি পড়তে পড়তে প্রবেশ করা।

২. তারপর নিম্নের দুআ'টি পাঠ করা।

بِسْمِ الله والصلاة وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ الله : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي ، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ أَعُوذُ بِالله الْعَظِيمِ ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

উচ্চারণ: "আউযুবিল-াহিল আজিম ওয়া বিওজহিহিল কারীম ওয়া সুলতানিহিল কাদীম মিনাশ শাইতানির রাজিম"।

অর্থ: "আমি মহান আল-াহ (সুব:), তার সম্মানিত সত্তা এবং তার আদি কাল থেকে স্থায়ী তার রাজত্বের নিকটে বিতারিত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থণা করছি।"[২৪২]

৩. মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে সম্ভব হলে রাওজা শরিফে (রিয়াজুল জান্নাতে) নতুবা মাসজিদে নববীর যেকোন স্থানে "দুরাকাআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ' সালাত আদায় করবে।

[২৪১] সহীহ বুখারী ১১৯৬; সহীহ মুসলিম ৩৪৩৬।

[২৪২] আবু দাউদ ৪৬৬।

৪. কবরের দিকে ফিরে সালাত আদায় করবে না। এবং কবরের দিকে ফিরে কোন প্রার্থণাও করবে না।

৫. সালাত শেষ করার পরে রাসূলুল-াহ (সা:) এর কবরের দিকে অগ্রসর হবে। কবরকে সামনে রেখে কিবলাকে পিছনে রেখে রাসূলুল-াহ (সা:) এর কবর বরাবর দাড়িয়ে রাসূলুল-াহ (সা:) এর প্রতি সালাম পেশ করবে, যেভাবে রাসূলুল-াহ (সা:) কবরস্থানে সালাম পেশ করতেন। আর তা হলো

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلاَحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.

উচ্চারণ: "আসসালামু আলাইকুম! আহলাদ দিয়ারি, মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীন, ওয়া ইন্না ইনশাআল-াহু লালাহিকুন, আসআলুল-াহা লানা ওয়া লাকুমল আ'ফিয়া।"

অর্থ: " হে মুসলিম এবং মু'মিন কবরবাসীগণ! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, নিশ্চয় আমরা শিঘ্রই তোমাদের সাথে মিলিত হব। আল-াহর নিকটে আমি আমাদের এবং তোমদের জন্য সুস্থ ও সুন্দর জীবন কামনা করি।"[২৪৩]

এরপরে কুরআন সুন্নাহতে বর্ণিত সহীহ কোন দু'আ করতে পারেন। কিন্তু যিয়ারতের সময় বুকে হাত বাধাঁ, মাথা ঝুকানো, সিজদাহ করা এবং আল-াহর রাসূলের কাছে কোন কিছু প্রার্থণা করার থেকে বিরত থাকবে।

তারপর একহাত পরিমান ডানে অগ্রসর হবে সেখানে আবু বকর সিদ্দীক (রা:) এর কবরে সালাম দিবে। তারপরে আরও একহাত পরিমান ডানে অগ্রসর হয়ে ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা:) কে সালাম পেশ করবে। যদি কেউ রাসূলুল-াহ (সা:) এর প্রতি সালাম পেশ করার জন্য অসিয়ত করে তাহলে তাদের পক্ষ হতেও সালাম পেশ করবে।

৬. এরপরে কিবলামুখী হয়ে নিজের জন্য, পিতা-মাতার জন্য, ভাই-বোনদের জন্য, দোস্ত-আহবাবদের জন্য দুআ' করবে।

৭. যিয়ারতের সময় আওয়াজ বুলন্দ করবে না। বরং নিজের কানে যাতে নিজে শুনতে পায় এ পরিমান আওয়াজ করতে পারবে।

৮. যিয়ারতের সময় কবরের দেয়াল স্পর্শ করা বা চুমু দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। এমনিভাবে বারবার যিয়ারত করার জন্য যাবে না। কেননা রাসূলুল-াহ (সা:) বলেছেন :

[২৪৩] সহীহ মুসলিম ২৩০২।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَلاَ تَجْعَلُوا قَبْرِى عِيدًا وَصَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِى حَيْثُ كُنْتُمْ ».

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল-াহ (সা:) বলেছেন, তোমরা তোমদের ঘর গুলোকে কবরস্থানে পরিণত করোনা। এবং আমার কবরকে বিনোদন স্থল বানাইয়ো না। এবং আমার প্রতি সালাত পাঠ কর। কেননা তোমাদের সালাত আমার কাছে পৌঁছানো হয় তোমরা যেখানেই থাক না কেন।"[২৪৪]

৯. মসজিদে নববী থেকে বের হওয়ার সময় পিছপা দিয়ে বের হবে না।

১০. বের হওয়ার সময় বাম পা দিয়ে নিম্নের দুআ'টি পড়তে পড়তে বের হবে:

بِسْمِ الله والصلاة وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ الله : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ أَعُوذُ بِالله الْعَظِيمِ ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

উচ্চারণ: বিসমিল-াহি ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল-াহি, আল-াহুম্মাগ ফির লী যুনুবি, আল-াহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন মাদলিকা, আউযুবিল-াহিল আজীম, ওয়া বি আজহিহিল কারিম, ওয়া সুলতানিহিল কাদীম মিনাশ শাাইতানির রাজিম।"

অর্থ: "আল-াহর নাম নিয়ে শুর" করছি, সালাত এবং সালাম পেশ হোক রাসূলুল-াহ (সা:) এর উপর। হে আল-াহ! আপনি আমার গুনাহ সমূহ ক্ষমা কর"ন। হে আল-াহ! আমি আপনা অনুগ্রহ কামনা করছি। এবং আমি মহান আল-াহ (সুব:), তার সম্মানিত সত্ত্বা এবং আদি কাল থেকে স্থায়ী তার রাজত্বের নিকটে বিতারিত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থণা করছি।"

মসজিদে নববীতে চলি-শ ওয়াক্ত সালাত

এ সম্পর্কে একটি হাদীস রয়েছে। হাদীসটি হলো:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِي أَرْبَعِينَ صَلَاةً لَا يَفُوتُهُ صَلَاةٌ كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ وَنَجَاةٌ مِنْ الْعَذَابِ وَبَرِئَ مِنْ النِّفَاقِ

অর্থ: "আনাস ইবনে মালেক (রা:) বলেন, রাসূলুল-াহ (সা:) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার মসজিদে (মসজিদে নববীতে) চলি-শ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে যার মাঝে কোন সালাত ছুটে যাবে না। তার জন্য দুটো মুক্তির সনদ লিখে

[২৪৪] সুনানে আবু দাউদ ২০৪৪।

দেয়া হয়। একটি হলো , জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির সনদ। আর দ্বিতীয়টি হলো; নেফাক থেকে মুক্তির সনদ।”[২৪৫]

হাদীসটি ইমাম আহমদ তার প্রসিদ্ধ কিতাব মুসনাদে আহমদে এবং তাবরানী শরীফেও উলে-খ করা হয়েছে। অনেকে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। কিন্তু প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ইমাম নাসির“দ্দীন আলবানী (র:) হাদীসটিকে দূর্বল বলেছেন। এবং ‘লোকমুখে প্রসিদ্ধ অথচ সহী নয়’ বলে যে সব হাদীস প্রচলিত রয়েছে তার অন্তর্ভূক্ত মনে করেন।[২৪৬] কেননা এ হাদীসটি নুবাইত্ব ইবনে উমার থেকে বর্ণিত তিনি একজন বিতর্কিত রাবী। যারা হাদীসটিকে সহীহ বলেছে তারা মূলত: অন্য একটা হাদীসের সাথে তালগোল পাকিয়ে বিভ্রান্তির মাঝে পড়েছে। সে হাদীসটি হলো:

عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان : براءة من النار وبراءة من النفاق

অর্থ: “আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল-াহ (সা:) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি চলি-শ দিন তাকবীরে উলার সাথে জামাআ'তে সালাত আদায় করবে, তার জন্য দুইটি মুক্তির সনদ লিখে দেওয়া হয়। একটি হলে: জাহান্নাম থেকে মুক্তির সনদ। দ্বিতীয়টি হলো: নিফাকের থেকে মুক্তির সনদ।”[২৪৭]

এ হাদীসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হওয়ার কারণে ‘হাসান’ পর্যায়ের হাদীস হিসাবে মুহাদ্দিসীন কেরাম গ্রহণ করেছেন। সুতরাং চলি-শ দিনের হাদীসকে চলি-শ ওয়াক্তের সাথে তালগোল পাকিয়ে মদীনায় আট দিন থাকতে হবে এবং চলি-শ ওয়াক্ত সালাত মসজিদে নববীতে আদায় করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে মদীনায় যে কয়দিনই থাকুক না কেন জামাআতের সাথে, প্রথম কাতারে, তাকবীরে উলার সাথে আদায় করা চেষ্টা করবে।

[২৪৫] মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল ১২৬০৫।
[২৪৬] সিলসিলাতুল আহাদীস আদ-দায়ী’ফাহ ১/৪৪১ হাদীস নং ৩৬৪।
[২৪৭] সুনানে তিরমিজি ২৪১।